রাষ্ট্রতত্ত্ব

[ত্রৈবার্ষিক স্নাতক সংস্করণ]

দ্বিতীয় খণ্ড

শাসনপদ্ধতি—ভারত

(কলিকাতা, বর্ধমান ও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সংকলিত
ত্রৈবার্ষিক স্নাতক পরীক্ষার রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পাঠ্যসূচী
অনুসারে লিখিত)

শ্রীশিবনাথ চক্রবর্তী, এম. এ.
অধ্যক্ষ, শ্যামাপ্রসাদ কলেজ, কলিকাতা,

'An Introduction to Politics', 'রাষ্ট্রতত্ত্ব' (ত্রৈবার্ষিক স্নাতক সংস্করণ
১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড), 'অর্থতত্ত্ব', 'ধনবিজ্ঞান ও পৌরবিজ্ঞান',
'প্রাগ্-বিশ্ববিদ্যালয় শ্রেণীর ধনবিজ্ঞান ও পৌরবিজ্ঞান',
'বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান'
প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা

মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড
পুস্তকবিক্রেতা ও প্রকাশক
১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

প্রকাশক :—শ্রীদীনেশচন্দ্র বসু
মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট্‌, কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ—নভেম্বর, ১৯৬০

মূল্য—পাঁচ টাকা মাত্র

আসাম এজেণ্টস্‌ :
বি. বি. ব্রাদার্স এণ্ড কোং
কলেজ হোষ্টেল রোড,
গৌহাটী-১

মুদ্রাকর : দেবেশ দত্ত
অরুণিমা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
৮১, সিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

পঞ্চম সংস্করণের ভূমিকা

ভারত শাসনপদ্ধতির পঠন-পাঠনের ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া এই সংস্করণে ভারত শাসন-ব্যবস্থার বিভিন্ন বিভাগ, উপ-বিভাগ ও নানা তথ্যের বিশদ আলোচনা করা হইল। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চল সম্পর্কে যাহাতে শিক্ষার্থীগণের নির্ভুল ধারণা জন্মে সেই উদ্দেশ্যে ভারতের বিভিন্ন অংশ-যুক্ত একটি পূর্ণাঙ্গ মানচিত্র এই সংস্করণে সংযোজিত হইল। কেন্দ্রীয়, রাজ্য ও স্থানীয় শাসন সংস্থাগুলি এবং বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কিত সংস্থাগুলি সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীগণ যাহাতে অবহিত থাকেন, সেজন্য এই সংস্থাগুলির কাঠামো যথাযথ স্থানে সংযোজিত হইল। ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাব সহিত অপরাপর যুক্তবাষ্ট্রীয ব্যবস্থার তুলনামূলক বিচারও স্থানে স্থানে করা হইয়াছে। প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে সংক্ষিপ্তসার ও প্রশ্নাবলী দেওয়া হইল। পুস্তকের শেষে প্রয়োজনীয় প্রশ্নসমূহের উত্তরের ইংগিত দেওয়া হইল। আশা করি, পুস্তক পাঠে ছাত্র-ছাত্রীগণ বিশেষভাবে উপকৃত হইবেন।

বিভিন্ন কলেজের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকগণ পুস্তকখানিকে যেরূপ সমাদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদেব নিকট আন্তবিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কবিতেছি। প্রকাশক ও প্রেসকে ধন্যবাদ জানাই।

শ্যামাপ্রসাদ কলেজ
কলিকাতা-২৬

শ্রীশিবনাথ চক্রবর্তী

Three-Year Degree Course

Syllabus in Political Science (Pass Course)

Government of India

India—Chief features of the Constitution—The Preamble, the Fundamental Rights, the Directive Principles of State Policy.

Division of powers—Relation between the Union and the States (Administrative and Legislative).

Union Government—Position and powers of the President—Functions of the Council of Ministers—its relation to Parliament—Composition and Functions of Parliament—Legislative Procedure—Financial Control.

State Governments—Position and powers of the Governor—Position and Functions of the Council of Ministers—Composition and Functions of the Legislative Council and Legislative Assembly in a State—Legislative Procedure—Finance Control.

Constitution and Functions of the Supreme Court—a brief description of the organisation of the State Judiciary.

Party System in India.

The Electorate—Civil Services

An outline of the system of Local Government in West Bengal.

———

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

দশম অধ্যায়

একাদশ অধ্যায়

দ্বাদশ অধ্যায়

রাষ্ট্রতত্ত্ব

দ্বিতীয় খণ্ড

শাসনপদ্ধতি—ভারত

প্রথম অধ্যায়

শাসনতন্ত্রের ক্রমবিকাশ

(Evolution of the Present Constitution)

ভারত যে আজ শুধু স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র বলিয়া জগৎসভায় একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে তাহা নয়, ভারতীয় রাষ্ট্রপরিচালনার নৈতিক আদর্শ আজ সর্বদেশ কর্তৃক স্বীকৃত হইতে চলিয়াছে। শিশুরাষ্ট্র হইলেও অতি অল্পকালের মধ্যে আন্তর্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে ভারত যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহা একদিকে তাহাকে যেরূপ তাহার অতীত গৌরবের সার্থক উত্তরাধিকারী বলিয়া প্রমাণিত করিয়াছে, অপরদিকে সেইরূপ তাহার ভবিষ্যৎ গৌরবপূর্ণ ভূমিকা সূচিত করে। বহুদিন পর্যন্ত ভারত পরাধীন ছিল। মুসলমান শাসকগণ বহু শতাব্দী ধরিয়া ভারত শাসন করিয়াছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁহারা ভারতের অধিবাসী হইয়া নিজেদের ভারতীয় বলিয়া পরিচয় দিতেন। কয়েকজন ব্যতীত অন্যান্য মুসলমান নৃপতিগণের শাসনকালে সকল সম্প্রদায়ের লোকই সমান সুখ-দুঃখের অধিকারী ছিল; ব্যবসায়-বাণিজ্যক্ষেত্রেও সকলের সমান অধিকার ছিল। ভারতের ধনরত্ন ভারতেই থাকিত, সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া তাহা বিদেশে চলিয়া যাইত না।

ভারতের অফুরন্ত ধনরত্নের লোভে আকৃষ্ট হইয়া পোর্তুগীজ, স্প্যানীয়, ওলন্দাজ, দিনেমার, ফরাসী ও সর্বশেষে ইংরাজ জাতি এদেশে মুখ্যতঃ বাণিজ্যব্যপদেশে আগমন করে। বণিকের ছদ্মবেশের অন্তরালে প্রত্যেকটি জাতির উদ্দেশ্য ছিল মুসলমান শাসকগণের দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া এদেশে রাজ্যস্থাপন করা এবং ভারতবাসীকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করা। ভারত ও

প্রতীচ্যের অন্যান্য দেশগুলির সহিত বাণিজ্য করিবার উদ্দেশ্যে ষোল শত খৃষ্টাব্দে রাণী এলিজাবেথ-প্রদত্ত সনদবলে যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠিত হয়, শেষ পর্যন্ত সেই কোম্পানীর সুদক্ষ ও সুচতুর কর্মচারী রবার্ট ক্লাইভ ছলে-বলে-কৌশলে পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজদ্দৌলাকে পরাজিত করিয়া এদেশে বৃটিশ শাসনের গোড়াপত্তন করেন। পাশ্চাত্ত্য অন্যান্য জাতিগুলি ধীরে ধীরে স্বেচ্ছায় বা প্রতিযোগিতার অসামর্থ্যে এদেশে বৃটিশ কর্তৃত্ব স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হয়। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের কয়েক বৎসর পরে ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে কোম্পানী বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করিয়া কার্যতঃ এদেশ শাসন করিতে আরম্ভ করিল। বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে পরিণত হইল। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এদেশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনাধীন ছিল। শাসনকার্য সুপরিচালিত করিবার উদ্দেশ্যে এই সময়ে বৃটিশ পার্লামেণ্ট সভা কয়েকটি আইন বিধিবদ্ধ করিয়া কোম্পানীর শাসনকার্য নিয়ন্ত্রণ করে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী এক বিদ্রোহ অনুষ্ঠিত হয়। শাসকগোষ্ঠী এই অভ্যুত্থানকে 'সিপাহী বিদ্রোহ' নামে অভিহিত করিলেও ভারতবাসিগণ এই বিদ্রোহকে তাঁহাদের জাতীয়তা-বোধের স্বতঃস্ফূর্ত প্রথম সংঘবদ্ধ অভিব্যক্তি বলিয়া মনে করেন। বিদেশী শাসনের অবসান ঘটাইয়া স্বরাজ লাভ করিবার এই স্বাধীনতা সংগ্রাম শাসকগণ নিষ্ঠুরহস্তে দমন করিতে সমর্থ হইলেও ইংলণ্ডের রাষ্ট্র-ধুরন্ধরেরা ভারতবাসীর স্বাধীনতা স্পৃহার সম্যক্ পরিচয় পাইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত রবার্ট ক্লাইভ, ওয়ারেন হেষ্টিংস প্রমুখ কোম্পানীর শাসকগণ কর্তৃক অনুষ্ঠিত অন্যায়, অবিচার ও অত্যাচারের কাহিনী বিদিত হইয়া ইংলণ্ডের জনমতও এদেশে কোম্পানীর অনুসৃত শাসননীতির প্রতি বিরূপ মনোভাবাপন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। ফলে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালে একটি নূতন ভারতশাসন আইন রচিত হয়। এই আইনের সহিত মহারাণী স্বয়ং তাঁহার ভারতীয় প্রজাবৃন্দের উদ্দেশ্যে একটি ঘোষণা প্রচার করিয়া ভারতীয় জনমতকে খুশী করিবার চেষ্টা করেন। এই আইনের দ্বারা ভারতে কোম্পানীর শাসনের অবসান ঘটে। এই সময় হইতে ভারতশাসনের ভার প্রত্যক্ষভাবে স্বয়ং ইংলণ্ডেশ্বরী গ্রহণ করেন।

স্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্র বহুল পরিমাণে বৃটিশ সরকার কর্তৃক রচিত ভারতশাসন আইনের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে। সুতরাং বর্তমান শাসনতন্ত্রের

সহিত সম্যক্ পরিচয় লাভ করিবার জন্ম পূর্বতন বৃটিশ সরকার-প্রণীত ভারত-শাসন আইনগুলি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা অত্যাবশ্যক বলিয়া মনে হয়।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ভারতশাসন আইনের প্রবর্তন করিবার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল শাসনব্যবস্থাকে কেন্দ্রীভূত করিয়া সুনিয়ন্ত্রিত করা। এইজন্য একজন ভারতসচিব (Secretary of State for India) নিযুক্ত হইলেন। ভারত-সচিব ইংলণ্ডের কেবিনেট সভার একজন সদস্য ও ভারতশাসন ব্যাপারের জন্য পার্লামেণ্ট সভার নিকট দায়ী ছিলেন। ইহার পর ১৮৬১, ১৮৯২ ও ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে যথাক্রমে তিনটি ভারতশাসন আইন রচিত হয়। কোম্পানীর শাসন-কালে ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের চার্টার আইনে বারজন সরকারী সদস্য লইয়া কেন্দ্রীয় সরকারের প্রথম আইনসভা গঠিত হইয়াছিল।* শেষোক্ত তিনটি আইনের দ্বারা প্রাদেশিক শাসনক্ষেত্রেও পরোক্ষ নির্বাচন-পদ্ধতিতে প্রাদেশিক আইনসভার সৃষ্টি হয় এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভাকে আলাপ-আলোচনা করিবার কিছু ক্ষমতা প্রদান করা হয়। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের মর্লে-মিণ্টো আইন দ্বারা মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক্ নির্বাচন নীতি স্বীকৃত হয়।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতের শাসনব্যবস্থা নীতিগতভাবে ও কার্যতঃ এককেন্দ্রীয় ছিল। সর্বভারতীয় কংগ্রেস সভার অনুপ্রেরণায় এই সময় হইতে জনসাধারণের মধ্যে স্বাধীনতালাভের আকাঙ্ক্ষা তীব্ররূপে দেখা যায়। ১৯১৪-১৮ খৃষ্টাব্দে জার্মানীর সহিত প্রথম মহাসমরে বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া ভারতের সাহায্য ও সহযোগিতালাভের উদ্দেশ্যে ভারতসচিব স্বয়ং ভারতে পদার্পণ করিয়া ভারতীয় জনগণকে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন দিবার প্রতিশ্রুতি দান করেন। ফলে, ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড সংস্কার আইন পাস হয়। এই আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল বিকেন্দ্রীকরণ নীতির প্রথম প্রবর্তন। এই আইনের দ্বারা প্রাদেশিক সরকারগুলির শাসন-সংক্রান্ত বিষয়সমূহকে কেন্দ্রীয় সরকারের বিষয়সমূহ হইতে পৃথক্ করিয়া অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বসম্পন্ন প্রাদেশিক বিষয়-সমূহের শাসনব্যবস্থায় স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তিত হয়। সুতরাং ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের শাসনসংস্কার আইনের দ্বারা ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার ভিত্তিতে দায়িত্বশীল সরকারের সূচনা করা হয়। এই ব্যবস্থার দ্বারা প্রাদেশিক শাসনের বিষয়গুলিকে সংরক্ষিত (Reserved) এবং হস্তান্তরিত (Transferred) এই দুই ভাগে ভাগ করিয়া, প্রথমোক্ত বিষয়গুলি গভর্ণর স্বয়ং আইনসভা-নিরপেক্ষ উপদেষ্টৃমণ্ডলীর সাহায্যে শাসন করিতেন এবং হস্তান্তরিত বিষয়গুলি প্রাদেশিক-

আইনসভার সদস্যগণের মধ্য হইতে নিযুক্ত মন্ত্রিমণ্ডলীর সাহায্যে পরিচালিত হইত। হস্তান্তরিত বিষয়গুলির শাসন-পরিচালনার জন্য মন্ত্রিমণ্ডলী আইন-সভার নিকট দায়ী ছিলেন, কিন্তু সংরক্ষিত বিষয়গুলির শাসন-পরিচালনার জন্য নিযুক্ত উপদেষ্টৃমণ্ডলীর আইনসভার নিকট কোন দায়িত্ব ছিল না। প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থার এই অদ্ভুত বিভাগ দ্বৈতশাসন (Dyarchy) নামে পরিচিত হয়। দ্বৈতশাসনব্যবস্থা ভারতে কোনদিনই জনপ্রিয় হইতে পারে নাই। ভারতীয় জনগণ জাতীয় কংগ্রেস মহাসভার নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হইয়া মহাত্মা গান্ধী-প্রবর্তিত অহিংস সংগ্রামের দ্বারা পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের জন্য বদ্ধপরিকর হয়। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের সংস্কার আইন ভারতে কতদূর কার্যকরী হইয়াছিল তাহা অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত বৃটিশ পার্লামেণ্ট কর্তৃক সাইমন্ কমিশন্ এদেশে প্রেরিত হয়। এই কমিশনের বিবরণীর ভিত্তিতে ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে আর একটি ভারতশাসন আইন বিধিবদ্ধ হয়। নূতন আইনের বিশেষত্ব ছিল যে, বৃটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্য-সমূহকে লইয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় ভিত্তিতে বৃহত্তর ভারত গঠনের প্রস্তাব। নূতন আইনের দ্বারা প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা হইতে দ্বৈতশাসনব্যবস্থার বিলোপসাধন করিয়া কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থায় দ্বৈতশাসনের প্রবর্তন করা হইল। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের আইনানুসারে কেন্দ্রীয় শাসনের বিষয়গুলিকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা, বৈদেশিক ব্যাপার, উপজাতীয় সম্পর্কিত এবং খৃষ্টধর্ম সংক্রান্ত ব্যাপারগুলির শাসনভার গভর্ণর-জেনারেলের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল। এই চারিটি সংরক্ষিত বিষয়ে শাসনপরিচালনার ভার গভর্ণর-জেনারেল কর্তৃক নিযুক্ত তিনজন উপদেষ্টার উপর প্রদত্ত হয় ও অন্যান্য বিষয়গুলির শাসনকার্য গভর্ণর-জেনারেল কর্তৃক মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ অনুসারে পরিচালিত হইত। প্রাদেশিক শাসনক্ষেত্রে প্রাদেশিক গভর্ণরগণ মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ অনুসারেই শাসনকার্য পরিচালিত করিতেন। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৪ই আগষ্ট পর্যন্ত এই শাসনব্যবস্থা ভারতে প্রবর্তিত ছিল। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ভারতশাসন আইনও ভারতীয় জনগণ কর্তৃক গৃহীত হয় নাই। এই আইনের দ্বারা ভারতে যে যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনা করা হইয়াছিল তাহা কোনদিনই কার্যকরী হয় নাই। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক—উভয় শাসনক্ষেত্রে এই আইন গভর্ণর-জেনারেল ও প্রাদেশিক গভর্ণরগণকে এত বিশেষ ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছিল যে, এই আইন দ্বারা প্রবর্তিত শাসনব্যবস্থাকে কোন মতেই দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা বলা চলে না।

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ভারতীয় স্বাধীনতা আইনের (Indian Independence Act, 1947) দ্বারা ভারতীয়গণের হস্তে বৃটিশ সরকার ক্ষমতা হস্তান্তরিত করেন। স্বাধীনতা আইন পাস হওয়ার ফলে ভারতবর্ষ বিভক্ত হইয়া ভারত ও পাকিস্তান, এই দুইটি ডোমিনিয়নের সৃষ্টি হয় এবং এই দুইটি ডোমিনিয়নের গণপরিষদ্ (Constituent Assembly) স্বাধীনভাবে তাহাদের শাসনতন্ত্র গঠন করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়। তদনুসারে ভারতীয় গণপরিষদ্ ভারতের জন্য নূতন সংবিধান রচনা করিয়া ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের ২৬শে নভেম্বর ভারতীয় জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে ঐ সংবিধান গ্রহণ করে। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী আনুষ্ঠানিকভাবে নূতন সংবিধান অনুযায়ী শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়।

ভারতের নূতন শাসনতন্ত্র (New Constitution of India)

প্রায় তিন বৎসর কঠোর পরিশ্রম করিয়া ভারতীয় গণপরিষদ্ যে শাসনতন্ত্র রচনা করেন, ১৯৭৯ খৃষ্টাব্দের ২৬শে নভেম্বর বেলা ১১টা ১০ মিনিটের সময় ভারতীয় গণপরিষদের সভাপতি ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ উহাতে স্বাক্ষর প্রদান করেন। ভারতীয় সংবিধান বোধ হয় পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম সংবিধান। ২৫১ পৃষ্ঠা সম্বলিত এই সংবিধানে ১৮ পৃষ্ঠা সূচীপত্রসহ ৩৯৫টি সূত্র, ৮টি তপশীল এবং ২২টি অধ্যায় দৃষ্ট হয়। নূতন শাসনতন্ত্রকে 'ভারতীয় সংবিধান' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। ইংরেজী ভাষায় রচিত হইলেও হিন্দী ও ভারতীয় অন্যান্য প্রধান ভাষাসমূহে ইহার অনুবাদ করা যাইতে পারে। ভারতের শাসনতন্ত্র যে শুধু বৃহত্তম তাহা নহে, জটিলতার দিক দিয়াও এই শাসনতন্ত্রের প্রতিযোগী বিরল। সাধারণ লোকের পক্ষে ইহার বিভিন্ন সূত্র, ধারা ও উপধারার তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করা একরূপ অসাধ্য ব্যাপার।

সংক্ষিপ্তসার

শাসনতন্ত্রের ক্রমবিকাশ

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ইংরাজ সেনাপতি ক্লাইভ ভারতে বৃটিশ শাসনের গোড়াপত্তন করেন। ১৭৬৫ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করিয়া কার্যতঃ এদেশ শাসন করিতে

আরম্ভ করিল। ১৭৬৫ হইতে ১৮৫৮ পর্যন্ত ভারত কোম্পানীর শাসনাধীন ছিল। ঐ সালে ভারতের শাসন কর্তৃত্ব কোম্পানীর হাত হইতে ইংলণ্ডেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়া স্বয়ং গ্রহণ করেন। ১৮৬১, ১৮৯২ ও ১৯০৯ সালে যথাক্রমে তিনটি ভারত শাসন আইন রচিত হয়। এই আইনগুলি দ্বারা কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভাগুলির সৃষ্টি হয় এবং এই আইনসভাগুলিকে আলাপ-আলোচনা করিবার ক্ষমতা দেওয়া হয়। ১৯০৯ সালের মর্লে-মিণ্টো আইন দ্বারা মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচন নীতি স্বীকৃত হয়। ১৯১৯ সালে মণ্টেগু-চেম্‌সফোর্ড সংস্কার আইন পাস হয় ও প্রাদেশিক শাসন ব্যাপারে আংশিকভাবে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৩৫ সালে আর একটি ভারতশাসন আইন পাস হয়। এই আইনের দ্বারা বৃটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যসমূহকে লইয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় ভিত্তিতে একটি বৃহত্তর ভারত গঠনের প্রস্তাব ছিল। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বাধীনে জাতীয় কংগ্রেস এই প্রস্তাব গ্রহণে অসম্মত হয়। ১৯৪৭ সালে ভারতীয় স্বাধীনতা আইনের দ্বারা ভারতীয়গণের হস্তে বৃটিশ সরকার ক্ষমতা হস্তান্তরিত করেন। ১৯৪৯ সালের ২৬শে এপ্রিল ভারতীয় গণপরিষদ কর্তৃক রচিত নূতন সংবিধান গৃহীত হয় এবং ১৯৫০ সালে ২৬শে জানুয়ারী আনুষ্ঠানিকভাবে নূতন সংবিধান অনুযায়ী শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়।

প্রশ্ন

1. Trace the evolution of the Constitution of India.

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভারতীয় শাসনতন্ত্রের উৎস্ ও বৈশিষ্ট্য

(Sources and Features of the Indian Constitution)

ভারতের নূতন শাসনতন্ত্র বহু তথ্য-সম্বলিত ও জটিলতাপূর্ণ হইবার অন্যতম কারণ হইল যে, এই শাসনতন্ত্র কোন একটিমাত্র দেশের শাসনতন্ত্র অনুসরণ করিয়া গঠিত হয় নাই, পরন্তু পৃথিবীর বহুদেশের শাসনতন্ত্রের প্রভাব ভারতের শাসনতন্ত্রের উপর পরিদৃষ্ট হয়। ভারতের শাসনতন্ত্রের রচয়িতাগণ এই উপমহাদেশের বিভিন্ন ভাষাভাষী ও বিভিন্ন ধর্মমতাবলম্বী সম্প্রদায়গুলির মধ্যে জাতীয়তাবোধ অক্ষুন্ন রাখিবার উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া শাসনতন্ত্রকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বিভিন্ন দেশের প্রচলিত শাসনতন্ত্রগুলি হইতে ভারতে প্রযোজ্য অংশগুলি গ্রহণ করিয়াছেন। ভারতের 'বর্তমান শাসনতন্ত্র ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ভারতশাসন আইন দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বৃটিশ, আইরিশ, ডোমিনিয়নসমূহ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বর্মা, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশগুলির শাসনতন্ত্রের প্রভাব ভারতীয় শাসনতন্ত্রের উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কার্যকরী হইয়াছে।

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ভারতশাসন আইনের মত এই নূতন সংবিধান শুধু কতকগুলি শাসনতান্ত্রিক আইনের সমষ্টিমাত্র নহে। শাসনতান্ত্রিক আইন ব্যতীতও বহু অর্থনৈতিক নির্বাচন সংক্রান্ত, ভাষা-সম্পর্কিত ও শাসনব্যবস্থা-বহির্ভূত অন্য নানা বিষয়ের অবতারণা এই শাসনতন্ত্রে করা হইয়াছে। কয়েকটি বিষয়ে ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ভারতশাসন আইনের অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইলেও অন্য অনেক বিষয়ে ভারতশাসন আইনের সহিত ইহার সুস্পষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। দায়িত্বশীল প্রজাতন্ত্রী শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন ও যুক্তরাষ্ট্রীয় ভিত্তিতে পূর্বতন প্রদেশগুলি ও দেশীয় রাজ্যগুলির একত্রীকরণ হইল ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ভারতশাসন আইন হইতে নূতন শাসনতন্ত্রের প্রধান পার্থক্য।

ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনা (Preamble) ও মৌলিক অধিকারগুলি (Fundamental Rights) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র হইতে গৃহীত

হইয়াছে। শাসনব্যবস্থার নির্দেশাত্মক মূল নীতিগুলির (Directive Principles of State Policy) উৎস হইল স্বাধীন আয়ারল্যাণ্ড ও বর্মাদেশের শাসনতন্ত্র। গ্রেট বৃটেনের পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থার প্রভাব ভারতের শাসনতন্ত্রে সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রব্যবস্থা ক্যানাডার যুক্তরাষ্ট্রের আদর্শে 'গঠিত, হইযাছে। ক্যানাডার যুক্তরাষ্ট্রের অনুরূপভাবে ভারতেও সমুদয় শাসনক্ষমতাকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে অপেক্ষাকৃত অধিক ক্ষমতার অধিকারী করা হইয়াছে। পূর্বে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র চারিটি বিভিন্ন শ্রেণীর অঞ্চল লইযা গঠিত ছিল। এবিষয়ে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত চারিটি বিভিন্ন শ্রেণীর রাজ্যের সহিত ইহার কিছু সাদৃশ্য ছিল।

ভারতের শাসনতন্ত্রের উপাদান (Elements of the Indian Constitution)

প্রত্যেক দেশেরই সংবিধান নানা উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত হয় এবং বিভিন্ন প্রভাবে প্রভাবিত হয়। ভারতের সংবিধান লিখিত হইলেও ইহা সংকলনের ষোড়শ বৎসরের মধ্যেই নানা প্রভাবে পুষ্ট হইয়াছে। ভারতের শাসনতন্ত্রের প্রধান উপাদানগুলি হইল :—

১। আদি শাসনতন্ত্র (Original Constitution)—১৯৪৯ সালের ২৬শে জানুয়ারী এই সংবিধান ভারতীয় গণপরিষদ্ কর্তৃক গৃহীত হয়। ২৫১ পৃষ্ঠা-সম্বলিত এই সংবিধানে ১৮ পৃষ্ঠা সূচীপত্রসহ ৩৯৫টি সূত্র, ৮টি তপশীল এবং ২২টি অধ্যায় দৃষ্ট হয়। ইহা বিস্তারিতভাবে লিখিত এবং ভারত রাষ্ট্রের রাজ্যগুলি ও অন্যান্য অঞ্চলের শাসনতান্ত্রিক আইন-কানুন ইহার অন্তর্ভুক্ত।

২। শাসনতান্ত্রিক সংশোধন আইন (Amendments of the Constitution)—এ পর্যন্ত সতেরটি সংশোধন আইন পাস হইয়া আদি শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ঘটিয়াছে! ভবিষ্যতেও এইরূপ বহু সংশোধন আইন পাস হইবে। এই সংশোধন আইনগুলিও ভারতীয় শাসনতন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে পরিগণিত হয়।

৩। ভারতের পার্লামেণ্ট সভা কর্তৃক রচিত সংশোধন আইন (Parliamentary Statutes) —শাসনতন্ত্র অনুসারে ভারতের পার্লামেণ্ট সভা সাধারণ আইন প্রণয়ন-পদ্ধতিতে ভারতের শাসনতন্ত্রের কতিপয় বিষয় সংশোধন করিতে

পারেন। আজ পর্যন্ত পার্লামেণ্ট সভা এরূপ বহু সংশোধন আইন পাস করিয়াছে, যথা, ১৯৫০ সালের আটক আইন, ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইন, ১৯৫৬ সালের বাংলা-বিহার স্থান বিনিময় আইন, ১৯৬০ সালের বোম্বাই রাজ্য পুনর্গঠন আইন প্রভৃতি। পার্লামেণ্ট সভা কর্তৃক প্রণীত এই আইনগুলিও শাসনতন্ত্রের আবশ্যিক উপাদান বলিয়া বিবেচিত হয়।

৪। সুপ্রীমকোর্ট ও হাইকোর্টসমূহের সিদ্ধান্ত (Judicial Decisions)—শাসনতন্ত্রের বিভিন্ন ধারা ও উপধারা সম্পর্কে উপরি-উক্ত বিচারালয়সমূহ সময়ে সময়ে যে ভাষ্য ও সিদ্ধান্ত দান করিয়াছে, তাহার ফলেও শাসনতন্ত্রের বিলক্ষণ পরিবর্তন ঘটিয়াছে।

৫। প্রথাগত বিধান (Conventions)—ভারতের শাসনতন্ত্র অতি আধুনিক হইলেও এই শাসনতন্ত্র অতি অল্পদিনের মধ্যে বহু প্রথাগত বিধানের দ্বারা পুষ্ট হইয়াছে। এবিষয়ে ভারতের শাসনতন্ত্র অনেক ক্ষেত্রেই বৃটিশ শাসনতন্ত্রের অনুসরণ করিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রী সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হইতে মনোনীত হইয়া থাকেন—এই নিয়মটি প্রথাগত বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত। পার্লামেণ্ট সভার সভাপতি (Speaker) প্রথাগত বিধান অনুসারে নিদলীয় ও পক্ষপাতশূন্য হইয়া থাকেন।

৬। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন (Government of India Act, 1935)—ভারতের সংবিধানের বহু অংশ ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইন হইতে গৃহীত হইয়াছে।

ইহা ছাড়াও স্বদেশী ও বিদেশী বহু আইন-বিশারদের ভাষ্য ও মন্তব্যের দ্বারা ভারতের শাসনতন্ত্র প্রভাবিত হইয়াছে।

ভারতের শাসনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য (Salient features of the constitution)

১। ভারতের নূতন সংবিধান ভারতকে একটি যুক্তরাষ্ট্রের (Federal) ভিত্তিতে গঠিত করিয়াছে। অন্য নানাবিষয়ে বৃটিশ শাসনব্যবস্থার অনুরূপ হইলেও, ভারতের শাসনব্যবস্থা মূলতঃ যুক্তরাষ্ট্রীয় আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যানাডার যুক্তরাষ্ট্র এই উভয়ের গঠন-পদ্ধতির সমন্বয়ে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে। ক্যানাডার মতই বৃটিশ-ভারতের এককেন্দ্রীয়

শাসনব্যবস্থাকে বিকেন্দ্রীকরণ-পদ্ধতি দ্বারা কতকগুলি স্বায়ত্তশাসনশীল রাজ্যে বিভক্ত করা হইয়াছে। অপরপক্ষে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত কতকগুলি বিচ্ছিন্ন দেশীয় রাজ্যকে কেন্দ্রীকরণ-পদ্ধতির দ্বারা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের আঞ্চিক রাজ্যে পরিণত করা হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্র হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অপেক্ষা ক্যানাডার সহিত ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অধিকতর সাদৃশ্য বিদ্যমান। ক্যানাডা ও ভারত উভয় যুক্তরাষ্ট্রে অনুল্লিখিত ক্ষমতা (Residuary Powers) কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে ন্যস্ত করিয়া কেন্দ্রীয় সরকারকে অধিকতর শক্তিশালী করা হইয়াছে। উভয় যুক্তরাষ্ট্রেই শাসনক্ষমতাগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা হইয়াছে, যথা,—যুক্তরাষ্ট্রীয় (সর্বভারতীয়) তালিকা, রাজ্যতালিকা ও যুগ্ম-তালিকা। ক্যানাডায় মাত্র কৃষি ও দেশান্তরে বাস এই বিষয় দুইটি যুক্ত-তালিকার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে; অপরপক্ষে, ভারতে সাতচল্লিশটি বিষয় যুগ্ম-তালিকায়, সাতানব্বুইটি বিষয় যুক্তরাষ্ট্রীয় তালিকায় ও ছেষট্টিটি বিষয় রাজ্য-তালিকায় স্থান পাইয়াছে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র-ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, জরুরি অবস্থায় এই যুক্তরাষ্ট্রকে এককেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থায় পবিবর্তিত করা যায় এবং এই উদ্দেশ্যে শাসনতন্ত্রের রচয়িতাগণ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির হস্তে বহু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন। জরুরি অবস্থায় রাষ্ট্রপতি এই বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগে রাজ্যসরকারগুলিকে বাতিল করিযা শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিতে পারেন।

২। ভারতের শাসনতন্ত্রের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হইল যে, এই শাসনতন্ত্র বিস্তৃতভাবে লিখিত (written)। শাসনকার্য পরিচালনা করিবার প্রধান নীতি ও নিয়মগুলি ব্যতীতও অন্যান্য বহু বিষয় এই শাসনতন্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ জনসাধারণের মধ্যে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা পরিচালনার জন্য ভারতীয় সংবিধানে বহু শাসনব্যবস্থা-বহির্ভূত বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে।

৩। তৃতীয়তঃ, বৃটিশ শাসনতন্ত্রের নমনীয়তা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের কঠোরতার সমন্বয়সাধন করিয়া ভারতীয় শাসনতন্ত্র গঠিত হইয়াছে (partly rigid and partly flexible)। আইনের দিক দিয়া দেখিতে গেলে ভারতীয় শাসনতন্ত্র অনমনীয় শাসনতন্ত্রের পর্যায়ভুক্ত হয়, কেন-না, সাধারণ আইনসভা সাধারণ আইন-প্রণয়নপদ্ধতিতে সর্বক্ষেত্রে শাসনতন্ত্রের পরিবর্তনসাধন করিতে পারা যায় না। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও বলিতে হইবে যে, ভারতের শাসনতন্ত্র

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের ন্যায় চূড়ান্তরূপে অনমনীয় নহে।• অনমনীয়তার মধ্যেও প্রকারভেদ আছে। ভারতে কোন শাসনতান্ত্রিক আইনের সংশোধন করিতে হইলে, ঐ সংশোধন প্রস্তাব একটি বিলের আকারে পার্লামেণ্ট সভার উভয় পরিষদের অন্ততঃ দুই-তৃতীয়াংশের ভোটাধিক্যে গৃহীত হওয়া অপরিহার্য। কিন্তু এই দুই-তৃতীয়াংশ আবার পার্লামেণ্টের উপস্থিত ও অনুপস্থিত সদস্যসংখ্যা মিলিয়া সমগ্র সদস্যসংখ্যার অর্ধেকের অধিক হওয়া চাই। কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে, যথা,—রাষ্ট্রপতি-নির্বাচনের পদ্ধতি, কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকারগুলির মধ্যে আইনগত সম্পর্ক, শাসনতান্ত্রিক আইনের সংশোধনের বিধিব্যবস্থা প্রভৃতি,—সংশোধন বিলগুলি পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষের দুই-তৃতীয়াংশের ভোটাধিক্যে গৃহীত হওয়া চাই এবং তৎপরে পার্লামেণ্ট কর্তৃক অনুমোদিত বিল প্রথম তপশীলভুক্ত রাজ্য আইনসভাগুলির অন্ততঃ শতকরা পঞ্চাশটি কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া চাই। উভয় ক্ষেত্রেই আইনসভা কর্তৃক অনুমোদিত বিল রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়া আইনের মর্যাদা প্রাপ্ত হয়।

৪। চতুর্থতঃ, ভারতীয় সংবিধান ভারতে মন্ত্রিসংসদ-পরিচালিত শাসনব্যবস্থার (Parliamentary or Cabinet System) প্রবর্তন করিয়াছে। বৃটিশ শাসনব্যবস্থার অনুকরণে ভারতে এই শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে। এই শাসনব্যবস্থার বিশেষত্ব হইল যে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী একজন শাসকপ্রধান থাকিলেও কার্যতঃ এই শাসনক্ষমতা একজন প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক পরিচালিত হয়। মন্ত্রিপরিষদের সহিত আইনসভার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে। মন্ত্রিপরিষদের সদস্যবর্গকে আইনসভার সদস্য হইতে হয় এবং তাঁহারা তাঁহাদের নির্ধারিত নীতি ও কার্যক্রমের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী থাকেন। ভারতের নির্বাচিত রাষ্ট্রপতিই হইলেন শাসকপ্রধান। তিনিই প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু কার্যতঃ প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিপরিষদই শাসনক্ষমতা পরিচালনা করিয়া থাকেন।

৫। পঞ্চমতঃ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতই ভারতেও শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য (Supremacy of the Constitution) পরিলক্ষিত হয়। শাসনতন্ত্র হইল সরকারের সমস্ত ক্ষমতার উৎস। শাসনতন্ত্রের এই প্রাধান্য ভারতীয় সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক সংরক্ষিত হয়। ভারতের সুপ্রিম কোর্ট ও অন্যান্য উচ্চ বিচারালয়গুলির শাসনতান্ত্রিক আইনের ব্যাখ্যা করিবার ক্ষমতা থাকা ছাড়াও শাসনতন্ত্র কর্তৃক স্বীকৃত মৌলিক নাগরিক অধিকারগুলি রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপে যাহাতে ব্যাহত

না হয়, তাহা প্রতিরোধ করিবার জন্য সরকারী নির্দেশকে বে-আইনী ঘোষণা করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে।

৬। ষষ্ঠতঃ, ভারতের নূতন সংবিধানের আর একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হইল যে, শাসনতন্ত্র কর্তৃক ভারতীয়গণের এক-নাগরিকত্ব (One Citizenship) স্বীকৃত হইয়াছে। ভারতীয় নাগরিকত্ব ব্যতীত ভারতীয়গণের অন্য কোন প্রাদেশিক নাগরিকত্ব নাই। অনেক যুক্তরাষ্ট্রে বিশেষ করিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসিগণের দ্বিবিধ নাগরিকত্ব আছে, ফলে নাগরিকগণের আনুগত্য যুক্তরাষ্ট্র ও মূলরাষ্ট্রের মধ্যে বিভক্ত হইয়াছে। ভারতীয় নাগরিকগণের শুধুমাত্র যুক্তরাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করিতে হয়।

৭। সপ্তমতঃ, ভারতের সংবিধানে রাষ্ট্রপরিচালনার কতকগুলি নির্দেশাত্মক নীতি (Directive Principles of State Policy) উল্লিখিত হইয়াছে। সংবিধানে নাগরিকগণের কতকগুলি মৌলিক অধিকারও (Fundamental Rights) স্বীকৃত হইয়াছে। নাগরিকগণের এই মৌলিক অধিকারগুলি যদি সরকারী হস্তক্ষেপের ফলে কোনক্রমে ক্ষুণ্ণ হয়, তাহা হইলে নাগরিকগণ আইন-সম্মত উপায়ে তাহার প্রতিবিধান করিতে পারেন, কিন্তু রাষ্ট্রপরিচালনার এই নির্দেশাত্মক নীতিগুলি যদি সরকার কর্তৃক কার্যকরী করা না হয়, তাহা হইলে নাগরিকগণ ইহার কোন প্রতিবিধান করিতে পারেন না। সরকারের পক্ষে এই নির্দেশাত্মক নীতিগুলি বাধ্যতামূলক নহে। এই নীতিগুলির সহিত যথাসম্ভব সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া শাসনকর্তৃপক্ষ যাহাতে শাসনক্ষমতা পরিচালনা করে, সেই উদ্দেশ্যে সংবিধানে এইগুলি সংযোজিত হইয়াছে।

৮। অষ্টমতঃ, নূতন সংবিধান অনুসারে ভারত একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র-(Secular State) রূপে গঠিত হইয়াছে। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে এই রাষ্ট্রের নাগরিকগণ সমান সুযোগ-সুবিধার অধিকারী। ভারতের সকল অধিবাসীই ভারতীয় নাগরিক ও ধর্মমতের পার্থক্য সত্ত্বেও সকলেই সমান পদমর্যাদার অধিকারী। ধর্মমতের পার্থক্যের জন্য রাষ্ট্র নাগরিকগণের মধ্যে কোনরূপ বৈষম্যমূলক আচরণ করে না।

৯। নবমতঃ, ভারতের সংবিধান ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রকে একটি সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র (Sovereign Democratic Republic) আখ্যা দিয়াছে। ভারত বৃটিশ কমনওয়েলথভুক্ত রাজ্যসমূহের সদস্য হইলেও বৃটিশ রাজার আনুগত্য স্বীকার করে নাই। নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি হইলেন ভারতের উচ্চতম

শাসনকর্তৃপক্ষ। ভারতের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার একমাত্র উৎস হইল ভারতীয় জনসাধারণ।

১০। ভারতের নূতন শাসনতন্ত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল যে, এই শাসনতন্ত্র দ্বারা ভারতের পূর্বতন দেশীয় রাজ্যগুলিকে গণসার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে ভারতের অঙ্গীভূত করা হইয়াছে। দেশীয় রাজ্যগুলি ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ-রূপে ভারতীয় সাধারণতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

১১। নূতন শাসনতন্ত্রের আর একটি অভিনবত্ব হইল যে, ভারতের শাসন-ব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রীয় ধাঁচে গঠিত হইলেও কতকগুলি মৌলিক বিষয়ে সর্বভারতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিয়াছে। সর্বভারতের জন্য একদফা নাগরিকত্ব, সকলের জন্য সমান অধিকার, সবভারতের জন্য একটিমাত্র সুপ্রিম কোর্ট ও একই দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন এবং একটি সবভারতীয় কৃত্যক সমগ্র দেশের ঐক্যের প্রতীক।

ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে ভারত—India as a Secular State.

বহু অনৈক্যের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করাই হইল ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূল আদর্শ। বিভিন্ন যুগে ভারতে এই আদর্শই অনুসৃত হইয়াছে। স্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্রের রচয়িতাগণও নূতন সংবিধান রচনাকালে এই আদর্শ হইতে বিচ্যুত হন নাই। ভারতের নূতন শাসনতন্ত্রে তাই এরূপ কয়েকটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখিত হইয়াছে যাহার ভিত্তিতে ভারতে জাতি-বর্ণ-ধর্ম-নির্বিশেষে সকল মানুষই সমান সুযোগ-সুবিধা পাইতে পারে। এই কারণেই ভারতকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র নামে অভিহিত করা হয়।

এখন প্রশ্ন হইল কি অর্থে ভারতকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলা হয়। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলিতে প্রথমতঃ বুঝা যায় এমন একটি রাষ্ট্র যে রাষ্ট্র কোন বিশেষ ধর্মমতের সমর্থক নহে। ভারত বহুজাতি সমন্বিত হইলেও হিন্দু ধর্মাবলম্বী লোকের সংখ্যাগরিষ্ঠতা এই রাষ্ট্রে বর্তমান। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও ভারত রাষ্ট্র শুধুমাত্র হিন্দু-ধর্মের পৃষ্ঠপোষক নহে। যে অর্থে ভারতকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলা হয়, সে অর্থে পাকিস্তান বা এমন কি গ্রেট বৃটেনকেও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলা চলে না। যেহেতু পাকিস্তান সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান সম্প্রদায় দ্বারা অধ্যুষিত, সেইহেতু পাকিস্তানের শাসনব্যবস্থা ইস্‌লামীয় নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং পাকিস্তান সংবিধানে বিশেষভাবে বিধিবদ্ধ করা হইছে যে, একমাত্র মুসলমান ব্যতীত

অন্য কোন ধর্মমতাবলম্বী কোন ব্যক্তি পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি পদে নিযুক্ত হইতে পারিবে না। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, পাকিস্তান একটি বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের লোকের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পাকিস্তান রাষ্ট্র হইল ইসলামধর্মের পৃষ্ঠপোষক এবং ইসলামধর্ম অনুসরণকারী ব্যক্তিগণ এই রাষ্ট্রের প্রথম শ্রেণীর নাগরিক।

অন্য নানা বিষয়ে প্রগতিশীল হইলেও ইংলণ্ডকেও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলা চলে না, কারণ এই রাষ্ট্রের সরকারী ধর্ম হইল প্রটেস্ট্যাণ্ট ধর্ম। ইংলণ্ডের রাজাকে অবশ্যই প্রোটেস্ট্যাণ্ট হইতে হইবে এবং তিনি কোন ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী মহিলাকে বিবাহ করিতে পারিবেন না। সুতরাং ইংলণ্ডেও ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্র-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু ভারত রাষ্ট্রের এরূপ কোন সরকারী ধর্ম নাই।

দ্বিতীয়তঃ, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলিতে বুঝা যায় এমন একটি রাষ্ট্র যে রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় ধর্মমতের ভিত্তিতে মানুষে মানুষে কোন পার্থক্য করা হয় না। প্রত্যেক ধর্মসম্প্রদায়ের লোক স্বাধীনভাবে তাহার ধর্মমত পোষণ ও প্রচার করিতে পারে। সকল ধর্মসম্প্রদায়ের লোকই রাষ্ট্রের সহিত সম্পর্কে সমান সুযোগ-সুবিধার অধিকারী। সুতরাং ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রব্যবস্থায় ধর্ম ও রাজনীতির সম্পূর্ণ পৃথকী-করণ করা হয়। রাষ্ট্র সকল নাগরিককেই সমান চক্ষে দেখে।

ভারত যে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ইহা ভারতের সংবিধানে উল্লিখিত কতিপয় ধারা হইতে প্রমাণিত হয়। সংবিধানের ১৫নং ধারায় বলা হইয়াছে যে, রাষ্ট্র ধর্ম, জাতি, সম্প্রদায় প্রভৃতির কারণে কোন নাগরিকের সহিত পার্থক্যমূলক ব্যবহার করিবে না। অন্য আর একটি ধারায় বলা হইয়াছে যে, সকল ব্যক্তিই স্বাধীনভাবে ধর্মমত পোষণ, প্রচার প্রভৃতি করিবার অধিকারী। সরকারী সাহায্যে সম্পূর্ণভাবে পরিচালিত কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ধর্মসম্বন্ধীয় শিক্ষাদান করা চলিবে না। সরকারের বিনা অনুমতিতে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বা সাহায্যপ্রাপ্ত কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মশিক্ষা ব্যাপারে যোগদান করিতে কাহাকেও বাধ্য করা যাইবে না। ধর্ম ও ভাষা নিরপেক্ষভাবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় কর্তৃক স্থাপিত বিদ্যালয়গুলি সরকারী সাহায্য পাইবে।

ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ধারণার সহিত নিরীশ্বরবাদিতার কোন সম্পর্ক নাই। ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ হইল যে, রাজনীতি ধর্ম হইতে পৃথক থাকিবে। রাষ্ট্র লোকের বহির্জীবন নিয়ন্ত্রণ করে আর ধর্ম লোকের অন্তর্জীবন নিয়ন্ত্রণ করে। সুতরাং উভয়ের ক্ষেত্র পৃথক, এবং বিরোধের কোন কারণ নাই।

ভারতের ন্যায় বিশাল উপ-মহাদেশে রাষ্ট্রের এই ধর্মনিরপেক্ষ রূপ একান্তরূপে অপরিহার্য। অতীতে ধর্মমতের পার্থক্যের হেতু ভারতের রাষ্ট্রীয় জীবনের অগ্রগতি বহুবার বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে। তাই ভারতের নূতন সংবিধানের রচয়িতাগণ ভারতে একটি জনগণ সমর্থিত স্থায়ী রাষ্ট্র-ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে ভারতে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র গঠন করিয়াছেন। এই রাষ্ট্রের সাফল্য ইহার বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকের সদিচ্ছার উপর একান্তভাবে নির্ভর করে।

ভারতের নূতন শাসনতন্ত্র ও ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইন

(The New Constitution of India and the Government of India Act, 1935)

ভারতের নূতন শাসনতন্ত্রের সহিত ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইনের কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়। এই সাদৃশ্যগুলির ভিত্তিতে বলা যায়, যে, ভারতের নূতন সংবিধান ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইনের দ্বারা বহুলাংশে প্রভাবিত হইয়াছে। ভারতের বর্তমান শাসনতন্ত্রের আকার, বিষয়বস্তু ও শাসনতন্ত্রে শাসনতন্ত্র-বহির্ভূত বিষয়ের সমাবেশ দেখিলে নূতন সংবিধানকে ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইনের একটি প্রতিলিপি বলিয়া মনে হয়, কিন্তু কার্যতঃ তাহা নহে। আসল কথা হইল যে, নূতন শাসনতন্ত্রের রচয়িতাগণ সংবিধান রচনাকালে তদানীন্তন শাসনব্যবস্থার কয়েকটি মূলনীতি নূতন শাসনতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করা যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন। এই কারণে ভারতের নূতন শাসনতন্ত্রে ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইনের কিছু প্রভাব দেখা যায়। কিন্তু এই সাদৃশ্যগুলির অন্তরালে আবার উভয় আইনের মধ্যে বহু বৈসাদৃশ্যও বর্তমান।

সাদৃশ্য: প্রথমতঃ, উভয় আইনেই ভারতে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব করা হয়। ভারতীয়গণের বিরোধিতা ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য ১৯৩৫ সালের এই প্রস্তাব কার্যকরী হয় নাই। ভারতের নূতন শাসনতন্ত্র অনুসারে ভারতে যে যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব হয়, পাকিস্তান বাদ দিয়া পূর্বতন ভারতের অবশিষ্টাংশ লইয়া সেই প্রস্তাব কার্যে রূপায়িত হইয়াছে। কিন্তু ভারতের জাতি, ধর্ম, ভাষা প্রভৃতি অসংখ্য বৈচিত্র্যের পরিপ্রেক্ষিতে উভয় শাসনতন্ত্রের এই সাদৃশ্য স্বাভাবিক ও অবশ্যম্ভাবী বলিয়া মনে হয়। দ্বিতীয়তঃ, ক্ষমতা বিভাজনের দিক দিয়া দেখিলেও উভয় শাসনতন্ত্রের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য

দেখা যায়। উভয় শাসনতন্ত্রই সর্বভারতীয়, রাজ্য ও যুগ্ম এই তিনটি ভাগে শাসনক্ষমতাগুলিকে ভাগ করিয়াছে। তবে এই ক্ষমতাভাগের পার্থক্য হইল যে, ১৯৩৫ সালের আইনের দ্বারা অবশিষ্ট ক্ষমতাসমূহ ভারতের গভর্ণর-জেনারেলের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল। নূতন শাসনতন্ত্র অনুসারে অবশিষ্ট ক্ষমতাসমূহ কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে।

তৃতীয় সাদৃশ্য হইল যে, ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইনের অনুরূপভাবেই ভারতের ১০টি রাজ্যে বর্তমান শাসনতন্ত্র দ্বি-কক্ষ আইনসভা গঠন করিয়াছে।

চতুর্থতঃ, ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইন অনুসরণ করিয়া নূতন শাসনতন্ত্র ভারতে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, যদিও বর্তমান যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় সুপ্রিম কোর্ট ইহার এলাকার বিস্তৃতি ও ক্ষমতায় পূর্বতন যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর।

পরিশেষে বলা যায় যে, আর একটি বিষয়ে উভয় শাসনতন্ত্রের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। ১৯৩৫ সালের আইনের মতই নূতন শাসনতন্ত্রে সর্বভারতের ও রাজ্যগুলির শাসনতন্ত্র একত্র সমাবেশ করা হইয়াছে। ইহা ছাড়াও উভয় শাসনতন্ত্রে সম্পত্তি, নির্বাচন, ভাষা, চুক্তি, রাষ্ট্রভৃত্য নিয়োগ পরিষদ্ প্রভৃতি শাসনতন্ত্র-বহির্ভূত বিষয়গুলিও স্থান পাইয়াছে।

বৈসাদৃশ্য : ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইনের সহিত নূতন শাসনতন্ত্রের প্রথম পার্থক্য হইল যে, ১৯৩৫ সালের আইন সর্বভারতীয় ভিত্তিতে ভারতে একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছিল। বর্তমান শাসনতন্ত্র দেশ-বিভাগের পর পাকিস্তান বাদ দিয়া ভারতের অবশিষ্টাংশের বিভিন্ন অঞ্চল লইয়া ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠন করিয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, ভারতের নূতন শাসনতন্ত্রের প্রধান কৃতিত্ব হইল পূর্বতন দেশীয়রাজ্য ও চীফ-কমিশনার-শাসিত অঞ্চলগুলিকে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের আঙ্গিক রাজ্যে পরিণত করা। ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইন কর্তৃক এই অঞ্চলগুলি উপেক্ষিত হয়।

তৃতীয়তঃ, ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইন কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রে অতি সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে দ্বিধাগ্রস্তভাবে দায়িত্বশীল সরকার প্রবর্তন করিয়াছিল এবং এই সংকীর্ণ দায়িত্বশীলতাও আবার গভর্ণর জেনারেলের বিশেষ ক্ষমতার দ্বারা সংকুচিত করা হইয়াছিল। কিন্তু নূতন শাসনতন্ত্র কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার সর্বক্ষেত্রে প্রকৃত দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়াছে। কেন্দ্রীয় শাসন-

ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি শাসক-প্রধান হইলেও মন্ত্রি-পরিষদ্ হইল প্রকৃত শাসক-গোষ্ঠী এবং মন্ত্রি-পরিষদ্ আইনসভার নিকট তাঁহাদের কার্যের জন্য দায়ী।

সত্য বটে ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইনের অনুসরণে গভর্ণর-জেনারেলের বিশেষ ক্ষমতার অনুরূপভাবে ভারতের রাষ্ট্রপতির হস্তে জরুরী অবস্থার ক্ষেত্রে কতকগুলি গণতান্ত্রিক আদর্শ-বিরুদ্ধ ব্যাপক ক্ষমতা নূতন শাসনতন্ত্র কর্তৃক অর্পিত হইয়াছে। কিন্তু এ সম্পর্কে বলা যায় যে, পূর্বতন গভর্ণর-জেনারেল ছিলেন প্রকৃত শাসক—তিনি নিজের খুসীমত এই ক্ষমতাগুলির প্রয়োগ করিতে পারিতেন। এজন্য তিনি ভারতে কাহারও নিকট দায়ী ছিলেন না। কিন্তু বর্তমান রাষ্ট্রপতি হইলেন ইংলণ্ডের রাজার ন্যায় নাম-সর্বস্ব রাষ্ট্রপ্রধান। এই বিশেষ ক্ষমতাগুলি প্রয়োগ করিতে হইলে তাঁহাকে মন্ত্রি-পরিষদের পরামর্শ গ্রহণ করা অবশ্যম্ভাবী হয়। কারণ নূতন শাসনতন্ত্র ভারতে দায়িত্বশীল গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়াছে—অপরপক্ষে পূর্বতন শাসনব্যবস্থা ছিল স্বৈরাচারী, সুতরাং গভর্ণর-জেনারেলের বিশেষ ক্ষমতা ও রাষ্ট্রপতির বিশেষ ক্ষমতা তুলনীয় নহে।

চতুর্থতঃ, ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইন অনুসারে কেন্দ্রীয় গভর্ণর-জেনারেল ও প্রাদেশিক গভর্ণরগণের কতকগুলি স্বকীয় ক্ষমতা ও বিশেষ দায়িত্ব ছিল এবং এই ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্বপালনের ক্ষেত্রে তাঁহারা মন্ত্রি-পরিষদ্ নিরপেক্ষভাবে এই কাজগুলি করিতে পারিতেন। কিন্তু নূতন শাসনতন্ত্র এক আসামের রাজ্যপালের ক্ষেত্রে উপজাতি সম্পর্কিত ব্যাপার ব্যতীত অন্য কোন ক্ষেত্রে রাজ্যপালগণকে কোন বিশেষ ক্ষমতা বা দায়িত্ব অর্পণ করে নাই।

পঞ্চমতঃ, পূর্বতন শাসনব্যবস্থায় ভারতের আইনসভাগুলি অধস্তন, প্রায় ক্ষমতাবিহীন ছিল। গভর্ণর জেনারেল ও প্রাদেশিক গভর্ণরগণের অত্যধিক ক্ষমতার জন্য আইনসভাগুলির ক্ষমতা অতি সংকীর্ণ পরিধিতে সীমাবদ্ধ ছিল। আইন-প্রণয়ন বিষয়ে গ্রেট বৃটেনের পার্লামেণ্ট সভাই ছিল সর্বেসর্বা। কিন্তু নূতন শাসনতন্ত্র অনুসারে ভারতের কেন্দ্রীয় ও রাজ্য-আইনসভাগুলির আইন-প্রণয়ন বিষয়ে আদৌ কোন বাহিরের বাধা নাই। শাসনতন্ত্র-নির্ধারিত সীমার মধ্যে উভয় আইনসভাই আইন-প্রণয়ন করিতে পারে। কতিপয় ক্ষেত্রে ভারতের বর্তমান পার্লামেণ্ট সভা শাসনতন্ত্র পরিবর্তন করিতে পারে এবং কতিপয় নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে রাজ্য আইনসভাগুলিও শাসনতন্ত্র সংশোধন আইন-প্রণয়নে অংশ গ্রহণ করিতে পারে। পূর্বতন আইনসভাগুলির শাসনতন্ত্র সংশোধনের আদৌ কোন ক্ষমতা ছিল না।

ষষ্ঠতঃ, নির্দেশাত্মক নীতিসহ কতিপয় মৌলিক অধিকার শাসনতন্ত্রে সন্নিবেশিত করিয়া নূতন শাসনতন্ত্র ভারতশাসন ব্যবস্থায় প্রকৃত গণতান্ত্রিক আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। পূর্বতন শাসনতন্ত্রে ইহাদের অস্তিত্ব ছিল না।

সপ্তমতঃ, নূতন শাসনতন্ত্র ভারতে একটি যুক্তরাষ্ট্র-সুলভ সুপ্রিম কোর্ট প্রতিষ্ঠা করিয়া ভারতে প্রকৃত যুক্তরাষ্ট্র গঠনে সাহায্য করিয়াছে। ক্ষমতা ও এলাকার বিস্তৃতিতে নূতন যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় পূর্বতন যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় হইতে শ্রেষ্ঠতর।

পরিশেষে বলা যায় যে, পূর্বতন শাসনতন্ত্র ইংলণ্ডে বৃটিশ পার্লামেণ্ট সভা কর্তৃক রচিত হয়। শাসকশ্রেণী শাসিতের উপর এই শাসনতন্ত্র বাধ্যতামূলক করিয়াছিল। এই শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনে ভারতীয়গণের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোন স্থান ছিল না। কিন্তু নূতন শাসনতন্ত্র সম্পর্কে বলা যায় যে, সু-শাসনব্যবস্থা কখনই স্ব-শাসনব্যবস্থার বিকল্প বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না—("Good Government is no substitute for self-Government.")।

সংক্ষিপ্তসার

শাসনতন্ত্রের উৎস—১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন, বৃটিশ, আইরিশ, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, ডোমিনিয়নসমূহ, বর্মা, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশসমূহ হইতে ভারতের শাসনতন্ত্রের উপাদান সংগ্রহ করা হইয়াছে।

শাসনতন্ত্রের উপাদান—নিম্নলিখিত উপাদানগুলি লইয়া ভারতের শাসনতন্ত্র গঠিত। ১। আদি শাসনতন্ত্র, ২। শাসনতান্ত্রিক সংশোধন আইন-সমূহ, ৩। পার্লামেণ্ট সভা-প্রণীত সংশোধন আইন, ৪। বিচারবিভাগীয় সিদ্ধান্ত, ৫। প্রথাগত বিধান, ৬। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন, ৭। স্বদেশী ও বিদেশী বহু আইনবিদের ভাষ্য ও মন্তব্য।

শাসনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য—১। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা মার্কিণ ও ক্যানাডা এই উভয় যুক্তরাষ্ট্রের গঠনপদ্ধতির সমন্বয়ে ভারতের যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে। ২। বিস্তৃতভাবে লিখিত, ৩। ভারতের শাসনতন্ত্র অংশতঃ নমনীয় ও অংশতঃ অনমনীয়, ৪। বৃটেনের শাসনব্যবস্থার মত পার্লামেণ্টারী শাসন-ব্যবস্থা, ৫। শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য অর্থাৎ শাসনতন্ত্রই সকল ক্ষমতার উৎস, ৬। সর্বভারতের জন্য এক নাগরিকত্ব, ৭। সংবিধানে নাগরিকগণের কতিপয়

মৌলিক অধিকার স্বীকৃতি ছাড়াও রাষ্ট্র পরিচালনায় কতকগুলি নির্দেশাত্মক নীতি স্থান পাইয়াছে, ৮। ভারত একটি গণতান্ত্রিক সার্বভৌমিক প্রজাতন্ত্র বলিয়া সংবিধান কর্তৃক ঘোষিত হইয়াছে, ৯। যুক্তরাষ্ট্রীয় ভিত্তিতে গঠিত হইলেও কতকগুলি মৌলিক বিষয়ে সর্বভারতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হইয়াছে।

ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র—ভারত রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য হইল যে, এই রাষ্ট্র কোন ধর্মমতের সমর্থক বা পৃষ্ঠপোষক নহে। এ রাষ্ট্রে ধর্মমতের পার্থক্যের জন্য মানুষে মানুষে কোন পার্থক্য করা হয় না। ভারতের রাষ্ট্রব্যবস্থায় ধর্মমতের কোন স্থান নাই। জাতি-বর্ণ-ধর্ম-নির্বিশেষে সকল মানুষই রাষ্ট্রের নিকট হইতে সমান আচরণ পাইবে।

প্রশ্নাবলী

1. Enumerate the elements of the Indian Constitution and comment on them.

2. Give an account of the Salient Features of the Constitution of India.

তৃতীয় অধ্যায়

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের গঠন

(Structure of the Indian Union)

ভারতের যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশ (Indian Union and its Territories)

নূতন শাসনতন্ত্র অনুসারে ভারত একটি 'রাষ্ট্র-সমবায়' (Union of States) রূপে গঠিত হইয়াছিল। চারিটি বিভিন্ন শ্রেণীর অঞ্চল লইয়া ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠিত। এই চারিটি অঞ্চলকে নূতন শাসনতন্ত্র অনুসারে আর 'প্রদেশ' আখ্যা দেওয়া হয় নাই। এতদ্ব্যতীত যদি অন্য কোন অঞ্চল ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহা হইলে এই নূতন অঞ্চলগুলিও ভারতের শাসনাধীন থাকিবে। ভারতীয় পার্লামেণ্ট সভা আইন-প্রণয়ন দ্বারা বিভিন্ন রাজ্যগুলির গঠন, সীমানার হ্রাসবৃদ্ধি, নাম-পরিবর্তন বা একাধিক অঞ্চলের একত্রীকরণ প্রভৃতি করিতে পারিবে। শাসনতন্ত্রে উক্ত প্রথম তপশীলভুক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের রাজ্যগুলির সীমানা বা নাম-পরিবর্তন করিতে হইলে উক্ত রাজ্যগুলির মতামত গ্রহণ করিতে হইত। শাসনতন্ত্রের প্রথম তপশীল অনুসারে বিভিন্ন রাজ্যগুলিকে নিম্নলিখিত পর্যায়ে ভাগ করা হইয়াছিল।

প্রথম ভাগ (ক)	দ্বিতীয় ভাগ (খ)	তৃতীয় ভাগ (গ)	চতুর্থ ভাগ (ঘ)
১। অন্ধ্র	১। হায়দ্রাবাদ	১। আজমীর	১। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ
২। আসাম	২। জম্মু ও কাশ্মীর	২। ভূপাল	
৩। বিহার	৩। মধ্যভারত	৩। কুর্গ	
৪। বোম্বাই	৪। মহীশূর	৪। দিল্লী	
৫। মধ্যপ্রদেশ	৫। পাতিয়ালা ও পূর্ব-পাঞ্জাব রাজ্য-সমবায়	৫। হিমাচল প্রদেশ (বিলাসপুর-সহ)	
৬। মাদ্রাজ	৬। রাজস্থান	৬। কচ্ছ	
৭। উড়িষ্যা	৭। সৌরাষ্ট্র	৭। মণিপুর	
৮। পাঞ্জাব	৮। ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিন	৮। ত্রিপুরা	
৯। উত্তরপ্রদেশ		৯। বিন্ধ্যপ্রদেশ	
১০। পশ্চিমবঙ্গ (কুচবিহার ও চন্দননগর-সহ)			

প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগে বর্ণিত রাজ্যগুলি প্রায় সমক্ষমতার অধিকারী ছিল। এই দুই শ্রেণীর রাজ্যের মধ্যে প্রধান পার্থক্য ছিল যে, ভারতের রাষ্ট্রপতি শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হইবার পর দশ বৎসর পর্যন্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর রাজ্যগুলির উপর কর্তৃত্ব করিতে পারিবেন এবং প্রয়োজনানুসারে এই নির্দিষ্টকালের হ্রাস-বৃদ্ধিও করা চলিত, কিন্তু প্রথম শ্রেণীর রাজ্যগুলির উপর রাষ্ট্রপতির এরূপ কোন শাসনতন্ত্র-অনুমোদিত ক্ষমতা ছিল না। দ্বিতীয়ভাগে বর্ণিত রাজ্যগুলির শাসক-প্রধানকে রাজপ্রমুখ বলা হইত। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর রাজ্যগুলি প্রত্যক্ষভাবে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক শাসিত অঞ্চল। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত লেঃ গভর্ণর অথবা চীফ কমিশনার কর্তৃক ঐগুলি শাসিত হইত।

রাজ্যপুনর্গঠন কমিশনের সুপারিশ (Recommendations of the States Re-organisation Commission)

ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সুপারিশ প্রকাশিত হইয়াছিল। কমিশন শুধু ভাষা ভিত্তি করিয়াই রাজ্যগুলির পুনর্গঠনের সুপারিশ করেন নাই। প্রধানতঃ দেশের বৃহত্তর স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই তাঁহারা রাজ্যগুলির পরিবর্তন সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মতে ভারতের মূলগত ঐক্য রক্ষা করা ও অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য যে সমস্ত পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছিল সেগুলিকে কার্যে রূপদান করিবার জন্যই রাজ্যগুলির পুনর্গঠন হওয়া একান্তরূপে বাঞ্ছনীয়।

রাজ্যগুলির পুনর্গঠন সম্পর্কে কমিশন নিম্নলিখিত সুপারিশ করিয়াছিলেন :

প্রথমতঃ, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র বর্তমান ২৭টি বিভিন্ন পর্যায়ের রাজ্যের পরিবর্তে ১৬টি রাজ্য ও ৩টি কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলে পরিবর্তিত হইবে। কমিশন-প্রস্তাবিত রাজ্যগুলি হইল—১। মাদ্রাজ, ২। কেরল, ৩। কর্ণাটক, ৪। হায়দ্রাবাদ, ৫। অন্ধ্র, ৬। বোম্বাই, ৭। বিদর্ভ, ৮। মধ্যপ্রদেশ, ৯। রাজস্থান, ১০। পাঞ্জাব, ১১। উত্তরপ্রদেশ, ১২। বিহার, ১৩। পশ্চিমবঙ্গ, ১৪। আসাম, ১৫। উড়িষ্যা, ১৬। জম্মু ও কাশ্মীর।

দ্বিতীয়তঃ, মণিপুর, দিল্লী ও আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চল বলিয়া পরিগণিত হইবে।

তৃতীয়তঃ, পুনর্গঠনের ফলে নিম্নলিখিত রাজ্যগুলির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে। যথা—১। হিমাচল প্রদেশ, ২। পেপসু, ৩। আজমীর, ৪। কচ্ছ,

৫। সৌরাষ্ট্র, ৬। মধ্যভারত, ৭। ভূপাল, ৮। বিন্ধ্যপ্রদেশ, ৯। ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন, ১০। মহীশূর।

চতুর্থতঃ, ত্রিপুরা রাজ্য আসামের সহিত সংযুক্ত হইবে এবং সৌরাষ্ট্র ও কচ্ছ রাজ্যদ্বয় বোম্বাইয়ের অংশীভূত হইবে।

পঞ্চমতঃ, বর্তমান হায়দ্রাবাদ তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া প্রথম ভাগ দ্বারা কর্ণাটক নামক নূতন রাজ্য গঠিত হইবে, দ্বিতীয় ভাগ বোম্বাইয়ের সহিত সংযুক্ত হইবে ও অবশিষ্ট তৃতীয় ভাগ পুনর্গঠিত হায়দ্রাবাদ নামে অভিহিত হইবে।

তবে পুনর্গঠিত হায়দ্রাবাদ সম্পর্কে কমিশন সুপারিশ করিয়াছিলেন যে, ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে, সেই নির্বাচনে যদি হায়দ্রাবাদ রাজ্যের আইনসভা ⅔ সংখ্যাধিক্যের ভোটে অন্ধ্র রাজ্যের সহিত মিলিত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করে, তাহা হইলে এই রাজ্য অন্ধ্ররাজ্যের অঙ্গীভূত হইবে।

ষষ্ঠতঃ, উত্তরপ্রদেশ, উড়িষ্যা এবং জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যগুলির কোন পরিবর্তন কমিশন করেন নাই।

সপ্তমতঃ, কমিশন কেরল, কর্ণাটক ও বিদর্ভ—এই তিনটি নূতন রাজ্য গঠনের সুপারিশ করিয়াছিলেন।

অষ্টমতঃ, পুনর্গঠন দ্বারা 'ক' ও 'খ' শ্রেণীর রাজ্যগুলির মধ্যে যে পার্থক্য ছিল তাহা দূরীভূত করা হইয়াছিল এবং 'গ' শ্রেণীর রাজ্যগুলি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করা হইয়াছিল।

১৯৫৬ সালে রাজ্যপুনর্গঠন কমিশনের সুপারিশগুলি সামান্য পরিবর্তিত আকারে কার্যকরী হয়।

রাজ্যপুনর্গঠন-বিল (S. R. Bill)

রাজ্যপুনর্গঠন কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে ভারতের রাজ্যগুলিকে পুনর্গঠন করিবার নিমিত্ত পার্লামেণ্ট সভায় এই বিষয়ে একটা প্রস্তাব উপস্থাপিত করা হইয়াছিল। এ প্রস্তাবে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রকে নিম্নলিখিত পনেরটি রাজ্য ও সাতটি কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলে ভাগ করা হইয়াছিল।

রাজ্য :—১। অন্ধ্র-তেলেঙ্গনা ২। আসাম ৩। বিহার ৪। গুজরাট ৫। কেরল ৬। মধ্যপ্রদেশ ৭। মাদ্রাজ ৮। মহারাষ্ট্র ৯। মহীশূর

১০। উড়িষ্যা ১১। পাঞ্জাব ১২। রাজস্থান ১৩। উত্তরপ্রদেশ ১৪। পশ্চিমবঙ্গ ১৫। জম্মু ও কাশ্মীর।

কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল :—

১। বৃহত্তর বোম্বাই ২। দিল্লী ৩। হিমাচল প্রদেশ ৪। মণিপুর ৫। ত্রিপুরা ৬। আন্দামান ও নিকোবর ৭। লাক্ষা দ্বীপ, মিনিকয় ও আমিনদিভ দ্বীপপুঞ্জ।

প্রস্তাবে আরও বলা হইয়াছিল যে, সমগ্র ভারতকে পাঁচটি অঞ্চলে ভাগ করিয়া প্রত্যেকটি অঞ্চলের জন্য একটি আঞ্চলিক মন্ত্রণাসভা গঠিত হইবে। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার একজন মন্ত্রী, আঞ্চলিক রাজ্যসমূহের মুখ্যমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের একজন সদস্য ও পূর্বাঞ্চলের ক্ষেত্রে আসাম সরকারের উপজাতি সম্পর্কিত উপদেষ্টা লইয়া আঞ্চলিক মন্ত্রণাসভা গঠিত হইবে।

প্রত্যেকটি অঞ্চল নিম্নলিখিতরূপে গঠিত হইবে :—

১। উত্তর অঞ্চল—পাঞ্জাব, রাজস্থান, জম্মু ও কাশ্মীর, দিল্লী এবং হিমাচল প্রদেশ।

২। পূর্ব অঞ্চল -বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা, আসাম, মণিপুর ও ত্রিপুরা।

৩। দক্ষিণ অঞ্চল—অন্ধ্র-তেলেঙ্গনা, মাদ্রাজ, মহীশূর ও কেরল।

৪। পশ্চিম অঞ্চল—গুজরাট, মহারাষ্ট্র ও বৃহত্তর বোম্বাই।

৫। মধ্য অঞ্চল—উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশ।

রাজ্যপুনর্গঠন আইন ও ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান রূপ (States Re-organisation Act and the present structure of the Indian Union)

প্রধানতঃ রাজ্যপুনর্গঠন কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে ১৯৫৬ সালের আগষ্ট মাসের শেষ ভাগে রাজ্যপুনর্গঠন আইন পার্লামেণ্ট সভা কর্তৃক গৃহীত হয় ও ১লা নভেম্বর এই আইন বলবৎ হয়।

রাজ্যপুনর্গঠন আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, (১) এই আইন আদি শাসনতন্ত্র কর্তৃক প্রবর্তিত 'ক', 'খ' ও 'গ' শ্রেণীর রাজ্যগুলির মধ্যে যে প্রশাসনিক পার্থক্য ছিল তাহা দূর করিয়া নবগঠিত ১৪টি রাজ্যকে সমপর্যায়ভুক্ত করিল। (২) আদি শাসনতন্ত্র কর্তৃক সৃষ্ট 'খ' শ্রেণীর রাজ্যের রাজপ্রমুখ-পদের

বিলোপসাধন' করিয়া সকল রাজ্যগুলিই রাজ্যপাল-শাসিত অঞ্চল বলিয়া অভিহিত হইল। কেবলমাত্র জম্মু ও কাশ্মীরের শাসক পূর্বের ন্যায় সদর-ই-রিয়াসৎ বলিয়া অভিহিত হইবেন। (৩) নূতন আইন অনুসারে ভারতীয যুক্তরাষ্ট্র মাত্র দুই শ্রেণীর অঞ্চল লইয়া গঠিত হইল, যথা, (ক) ১৪টি রাজ্য ও (খ) ১০টি কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চল। বোম্বাই রাজ্য ভাগ হওয়ার ফলে রাজ্যসংখ্যা হইয়াছিল ১৫টি।

রাজ্য (States)

১। **অন্ধ্রপ্রদেশ**—এই নূতন রাজ্যটি ১৯৫৩ সালে মাদ্রাজ হইতে খণ্ডিত অন্ধ্র ও পূর্বতন দেশীয় রাজ্য হায়দ্রাবাদের তেলেঙ্গনা অংশ লইয়া গঠিত। এই রাজ্যের বর্তমান আয়তন হইল ১,১০,২৫০ বর্গমাইল এবং অধিবাসীর সংখ্যা হইল ৩১০ লক্ষ। হায়দ্রাবাদ হইল এই রাজ্যের প্রধান শহর।

২। **আসাম**—রাজ্যপুনর্গঠন আইনে আসাম রাজ্যের কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। এই রাজ্য ভারতের পূর্ব সীমায় অবস্থিত এবং নবগঠিত উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চল লইয়া ইহার আয়তন হইল ৮৪,৯২৭ বর্গমাইল এবং জনসংখ্যা হইল ৯০ লক্ষ। নৈসর্গিক দৃশ্যে অতুলনীয় শিলং শহর হইল এই রাজ্যের প্রধান শাসনকেন্দ্র।

৩। **বিহার**—ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে বিহার রাজ্য খনিজ সম্পদে প্রথম স্থান অধিকার করে। পুরুলিয়া জেলা ও পূর্ণিয়া জেলার কিয়দংশ পশ্চিমবঙ্গ-ভুক্তি হওয়ার ফলে বর্তমানে বিহার রাজ্যের আয়তন কিয়ৎ-পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। ইহার বর্তমান আয়তন হইল ৬৭,১৬৩ বর্গমাইল এবং জনসংখ্যা হইল ৩,৮৭,৭৬,৮৬০। পাটনা ইহার প্রধান শহর।

৪। **গুজরাট**—১৯৬০ সালের ১লা মে তারিখে পূর্বতন বোম্বাই রাজ্যটিকে ভাষার ভিত্তিতে বিভক্ত করিবার ফলে গুজরাট রাজ্যের জন্ম হয়। এই রাজ্যটির আয়তন হইল ৭২ হাজার ১৩৭ বর্গমাইল এবং ১৯৫১ সালের আদম-সুমারী অনুযায়ী ইহার জনসংখ্যা হইল ১ কোটি ৬২ লক্ষ ৬২ হাজার ১৩৭। এই রাজ্যটি ১৫টি জেলা লইয়া গঠিত এবং আয়তনে ইহা উড়িষ্যা, পাঞ্জাব ও রাজস্থানের প্রায় অনুরূপ হইবে। গুজরাটে আদিবাসী অনগ্রসর বা অনুন্নতের সংখ্যা প্রায় ৩০ লক্ষ। নূতন গুজরাটের প্রধান কর্মকেন্দ্র হইল আহমদাবাদ শহর।

৫। **মহারাষ্ট্র**—পূর্বতন বোম্বাই রাজ্যকে ভাষার ভিত্তিতে দ্বি-খণ্ডিত করিয়া ১৯৬০ সালের ১লা মে এই রাজ্যটির জন্ম হয়। ২৬টি জেলা লইয়া মহারাষ্ট্র রাজ্যটি গঠিত হইয়াছে। উহার আয়তন ১ লক্ষ ১৮ হাজার ৯০৩ বর্গমাইল। ১৯৫১ সালের লোকগণনা অনুযায়ী এই রাজ্যের অধিবাসীর সংখ্যা হইল ৩ কোটি ২১ লক্ষ ৬৮ হাজার ৬১৪। নূতন মহারাষ্ট্রের আয়তন ভারতীয় ইউনিয়নের শতকরা দশভাগের কিছু বেশী। বোম্বাই শহর এই রাজ্যের রাজধানী।

৬। **মধ্যপ্রদেশ**—পূর্বতন ভূপাল, বিন্ধ্যপ্রদেশ, মধ্যভারতের ক্ষুদ্র একটি অংশ ব্যতীত সমগ্র পূর্বতন মধ্যভারত ও পূর্বতন মধ্যপ্রদেশের কয়েকটি জেলা ব্যতীত সমগ্র মধ্যপ্রদেশ লইয়া বর্তমান মধ্যপ্রদেশ গঠিত হইয়াছে। নবগঠিত মধ্যপ্রদেশের আয়তন হইল ১,৭১,২০০ বর্গমাইল এবং জনসংখ্যা হইল ২৬১ লক্ষ। এই জনসংখ্যার এক ষষ্ঠমাংশ হইল উপজাতি। ভূপাল শহর ইহার নূতন রাজধানী।

৭। **মাদ্রাজ**—রাজ্যপুনর্গঠন আইন বলবৎ হওয়ার ফলে আয়তনে ও জনসংখ্যায় মাদ্রাজ রাজ্য সংকুচিত হইয়াছে। পূর্বতন মাদ্রাজের দক্ষিণ কানাড়া মহীশূরের ও মালাবার অংশ কেরলের সহিত সংযুক্ত হওয়ায় মাদ্রাজ রাজ্য ক্ষুদ্রতর হইলেও এক ভাষাভাষী অঞ্চলে পর্যবসিত হইয়াছে। বর্তমানে এই রাজ্যের আয়তন হইল ৫০,১১০ বর্গমাইল ও জনসংখ্যা হইল ৩০০ লক্ষ। মাদ্রাজ হইল ইহার প্রধান শহর।

৮। **উড়িষ্যা**—রাজ্যপুনর্গঠনের ফলে উড়িষ্যা রাজ্যের কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। ইহার আয়তন ৬০,১৩৬ বর্গমাইল ও লোকসংখ্যা হইল ১৪,৬৪,৬০০। বর্তমানে এই রাজ্যের প্রধান শাসনকেন্দ্র কটক হইতে ভুবনেশ্বরে স্থানান্তরিত হইয়াছে।

৯। **পাঞ্জাব**—পূর্বতন পূর্বপাঞ্জাব ও পেপসু এই দুইটি রাজ্য সংযুক্তির ফলে বর্তমান পাঞ্জাব রাজ্যের সৃষ্টি হইয়াছে। বোম্বাই রাজ্যের ন্যায় এই রাজ্যটিও দ্বি-ভাষাভাষী রাজ্য। এখানে হিন্দী ভাষাভাষী ও পাঞ্জাবী ভাষাভাষী অধিবাসীর সমাবেশ হইয়াছে। আয়তনে এই রাজ্যটি হইল ৪৭,৫৫৬ বর্গমাইল ও জনসংখ্যা হইল ১৬০ লক্ষ। নূতন শাসনকেন্দ্র হইল চণ্ডিগড় শহর।

১০। **উত্তরপ্রদেশ**—পূর্বতন যুক্তপ্রদেশের নূতন নামকরণ হইল উত্তরপ্রদেশ। রাজ্যপুনর্গঠনের ফলে এই রাজ্যেরও আয়তন ও লোকসংখ্যার কোন পরিবর্তন হয় নাই। এই রাজ্যের জনসংখ্যা হইল ৬,৩২,১৫,৭৪২। জনসংখ্যার দিক দিয়া উত্তরপ্রদেশ হইল ভারতের বৃহত্তম রাজ্য এবং আয়তনে ১,১৩,৪০০ বর্গমাইল।° লক্ষ্ণৌ শহর ইহার প্রধান শাসনকেন্দ্র।

১১। **পশ্চিমবঙ্গ**—বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ হইল ১৯৪৭ সালের পূর্বের অবিভক্ত বাংলার মাত্র এক-তৃতীয়াংশ। ১৯৫৬ সালের রাজ্যপুনর্গঠন আইন অনুসারে বিহার রাজ্যের পুরুলিয়া ও পূর্ণিয়া জেলার কিয়দংশ পশ্চিমবঙ্গের সহিত সংযুক্ত হইয়া এই রাজ্যের আয়তন সামান্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। অবিভক্ত বাংলার ১৭টি জেলা, পূর্বতন ফরাসী অধিকৃত চন্দননগর, দেশীয় রাজ্য কুচবিহার এবং বিহারের পুরুলিয়া ও পূর্ণিয়ার কিছু অংশ লইয়া বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ গঠিত হইয়াছে। বর্তমানে ইহার আয়তন হইল ৩৪,৯৪৫ বর্গমাইল, আর লোকসংখ্যা হইল ২,৬৩,০১,৯৯২। এশিয়ার বৃহত্তম নগর কলিকাতা হইল এই রাজ্যের প্রধান শহর।

১২°। **মহীশূর**—পূর্বতন বোম্বাই রাজ্যের কুর্গসহ কর্ণাটক অঞ্চল, পূর্বতন হায়দ্রাবাদের কর্ণাটক অঞ্চল ও পূর্বতন মাদ্রাজ রাজ্যের দক্ষিণ কানাড়া ও কোলেগাল তালুক লইয়া বর্তমান মহীশূর রাজ্য গঠিত হইয়াছে। এই রাজ্যটির আয়তন হইল ৭৭,৩২৬ বর্গমাইল এবং জনসংখ্যা হইল ১,৯৭,৩৮,১৯৩। বাঙ্গালোর ইহার প্রধান শহর।

১৩। **রাজস্থান**—পূর্বতন রাজস্থান রাজ্যের সহিত আজমাড় এবং বোম্বাই ও মধ্যভারতের দুইটি ক্ষুদ্র অঞ্চল যোগ করিয়া বর্তমান রাজস্থান রাজ্য গঠিত হইয়াছে। ইহার আয়তন হইল ১,৩২,০৭৮ বর্গমাইল ও জনসংখ্যা হইল ১৬০ লক্ষ। জয়পুর এই রাজ্যের প্রধান শহর।

১৪। **কেরল**—পূর্বতন ত্রিবাঙ্কুর কোচিন রাজ্য ও মাদ্রাজের মালাবার জেলা লইয়া এই রাজ্যটি সম্পূর্ণ নূতন করিয়া গঠিত হইয়াছে। ইহার আয়তন হইল ১৫,০৩৫ বর্গমাইল ও লোকসংখ্যা হইল ১৩৬ লক্ষ। ইহাই ভারতের ক্ষুদ্রতম রাজ্য এবং একমাত্র এই রাজ্যটিই কিছুকাল ভারতের সাম্যবাদী দল কর্তৃক শাসিত হইয়াছিল। ত্রিবেন্দ্রাম এই রাজ্যের প্রধান শহর।

১৫। **জম্মু ও কাশ্মীর**—এই রাজ্যটি ১৯৪৭ সালে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিলেও ভারতের অন্যান্য রাজ্যগুলির সহিত ইহার কিছু পার্থক্য

আছে। এই রাজ্যের আয়তন হইল ৮৫,৮৬১ বর্গমাইল এবং জনসংখ্যা হইল ৩৩,২৩,৬১৫। নৈসর্গিক সৌন্দর্যে অদ্বিতীয় শ্রীনগর শহর হইল ইহার রাজধানী।

১৬। **নাগাভূমি—(Nagaland)**—কিছুদিন পূর্ব পর্যন্তও এই নবগঠিত রাজ্যটি কেন্দ্রীয় শাসন-পরিচালনাধীন নাগা পার্বত্য তুয়েনসাং অঞ্চল নামে অভিহিত ছিল। ১৯৬২ সালে শাসনতান্ত্রিক ত্রয়োদশ সংশোধন আইন অনুযায়ী ১৯৬৩ সালের ১লা ডিসেম্বর তারিখ হইতে এই অঞ্চলটি ভারতের ষোড়শ রাজ্যে উন্নীত হয়। আয়তনে এই রাজ্যটি হইল ৬,৩৬৬ বর্গমাইল এবং ইহার জনসংখ্যা হইল ৩,৬৯,২০০। কোহিমা হইল এই রাজ্যের রাজধানী। শাসনকার্যের জন্য এই রাজ্যে অন্যান্য রাজ্যের মত একজন রাজ্যপাল, ৮ জন মন্ত্রী লইয়া একটি মন্ত্রিসভা এবং একটি নির্বাচিত আইনসভা আছে।

কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল—Centrally administered Areas

১। **দিল্লী**—শাসনকার্যের জন্য দিল্লীকে একটি স্বতন্ত্র অঞ্চল বলিয়া গণ্য করা হয়। ১৯১১ সাল হইতে দিল্লী ভারতের রাজধানী হইয়াছে। ইহার আয়তন হইল ৫৭৮ বর্গমাইল ও লোকসংখ্যা হইল ১৭,৪৭,০৭১।

২। **হিমাচল প্রদেশ**—পাঞ্জাবের একুশটি পার্বত্য রাজ্য লইয়া গঠিত পূর্বতন 'গ' শ্রেণীভুক্ত হিমাচল প্রদেশটিকে কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে পর্যবসিত করা হইয়াছে। ইহার আয়তন হইল ১১,০৫৩ বর্গমাইল ও লোকসংখ্যা হইল ১১,১০,০০০। পার্বত্য শহর সিমলা ইহার প্রধান নগর।

৩। **মণিপুর**—এই অঞ্চলটি ভারতের পূর্বপ্রান্তে আসাম ও বর্মাদেশের সীমান্তে অবস্থিত। ৮,৬২৮ বর্গমাইল আয়তনের এই অঞ্চলটিতে ৫,৭৮,০০০ লোকের বাস। ইম্ফাল এই অঞ্চলের প্রধান শহর।

৪। **ত্রিপুরা**—আসাম ও পূর্বপাকিস্তানের সীমান্তে অবস্থিত এই অঞ্চলটির আয়তন হইল ৪,০৪৯ বর্গমাইল ও জনসংখ্যা হইল ৫,৩৯,০০০। আগরতলা ইহার প্রধান শহর।

৫। **আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ**—বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত এই দ্বীপপুঞ্জে ইংরাজ শাসনকালে নির্বাসন দণ্ডাজ্ঞা-প্রাপ্ত ব্যক্তিগণকে বন্দী রাখা হইত। ভারতের জাতীয় সরকার কিছুদিন পর্যন্ত এই দ্বীপে উদ্বাস্তুগণের

পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই দ্বীপপুঞ্জের আয়তন হইল ৩,১৪৩ বর্গমাইল এবং জনসংখ্যা হইল ৩১,০০০। পোর্টব্লেয়ার ইহার প্রধান শহর।

৬। **লাক্ষা, মিনিকয় ও আমিনদিভ দ্বীপপুঞ্জ**—মালাবার উপকূল হইতে এই দ্বীপপুঞ্জ ২০০ মাইল দূরে সমুদ্রমধ্যে অবস্থিত। ইহার জনসংখ্যা হইল ২১,১৯৫। কোজিকোড় ইহার শাসনকেন্দ্র।

৭। **দাদ্রা ও নগর হেভেলি (Dadra and Nagar Haveli)**—১৯৬১ সালের ১১ই আগষ্ট দাদ্রা ও নগর হেভেলি স্থানীয় জনসাধারণের অনুরোধে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের একটি কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলে পরিণত হয়। এই অঞ্চলটির আয়তন হইল ১৮৯ বর্গমাইল।

৮। **গোয়া, দমন ও দিউ (Goa, Daman and Dieu)**—পূর্বতন পর্তুগীজ উপনিবেশ গোয়া, দমন ও দিউ ১৯৬১ সালের ১১ই ডিসেম্বর ভারত রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। ইহা এখন একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল। ইহার আয়তন হইল ১,৪২৬ বর্গমাইল এবং ইহার প্রধান শহর হইল পান্‌জিম।

৯। **পণ্ডিচেরি, ইয়েনান, মাহে**—প্রভৃতি ফরাসী অধিকৃত স্থানগুলি ফরাসী সরকারের সহিত ১৯৫৬ সালের ২৮শে মে তারিখের চুক্তির ফলে ভারত রাষ্ট্রের সহিত যুক্ত হইয়াছে। তবে চুক্তিটি এখনও পর্যন্ত ফরাসী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হয় নাই। এই কারণে এই অঞ্চলটি বর্তমানে ভারত সরকার কর্তৃক একজন চীফ কমিশনার কর্তৃক শাসিত হয়। ইহার আয়তন হইল ১৮৬ বর্গমাইল—প্রধান শহর পণ্ডিচেরি।

পুনর্গঠনের ফলে উপরি-উক্ত জম্মু ও কাশ্মীর ব্যতীত ১৫টি রাজ্যে একই গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন হইল। প্রত্যেক রাজ্যেই একজন নিয়মতান্ত্রিক রাজ্যপাল, দায়িত্বশীল মন্ত্রিমণ্ডলী, একটি নির্বাচিত আইনসভা ও একটি উচ্চ বিচারালয় থাকিবে। বিহার, বোম্বাই, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ, মহীশূর, পাঞ্জাব, পশ্চিমবঙ্গ, জম্মু ও কাশ্মীর এবং মহারাষ্ট্র এই দশটি রাজ্যের আইনসভা দ্বিকক্ষবিশিষ্ট হইবে। অন্যত্র একটিমাত্র কক্ষ থাকিবে।

কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলের জন্য কোনরূপ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয় নাই। এই অঞ্চলগুলি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত শাসনকর্তা দ্বারা শাসিত হইবে এবং এই অঞ্চলগুলির জন্য একমাত্র পার্লামেণ্ট সভা আইন প্রণয়ন করিতে পারিবে। ১৯৫৬ সালের শেষভাগে একটি নূতন আইন পাস করিয়া হিমাচল প্রদেশ, মণিপুর ও ত্রিপুরা—এই তিনটি কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলের জন্য স্থানীয় সভা

(Territorial Councils) গঠন করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সার্বজনীন ভোটাধিকার ভিত্তিতে জনগণ দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধি লইয়া এই সভাগুলি গঠিত হইবে। হিমাচল প্রদেশের সভা ৪১ জন সদস্য লইয়া গঠিত হইবে এবং ইহার মধ্যে বারটি আসন তপশীলী শ্রেণীর জন্য সংরক্ষিত থাকিবে। মণিপুর ও ত্রিপুরার স্থানীয় সভাগুলিতে ৩০ জন সদস্য থাকিবে। কেন্দ্রীয় সরকার এই সভাগুলিতে ৪ জন পর্যন্ত সদস্য মনোনীত করিতে পারিবেন। এই সভাগুলি সাধারণতঃ নিছক স্থানীয় সমস্যা সম্পর্কে ব্যবস্থা করিতে পারিবে। স্থানীয় সমস্যা সমাধান করিবার উদ্দেশ্যে দিল্লীতে একটি কর্পোরেশন গঠন করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। রাজ্য-পুনর্গঠনের ফলে বিভিন্ন রাজ্যের আইনসভার গঠনে ও কেন্দ্রীয় আইনসভায় এই রাজ্যগুলির প্রতিনিধিত্বের বিষয় যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা ও রাজ্য আইনসভা অধ্যায়গুলিতে আলোচনা করা হইয়াছে।

রাজ্যপুনর্গঠন আইনের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহার দ্বারা সমগ্র ভারতকে ৫টি অঞ্চলে ভাগ করিয়া প্রত্যেকটি অঞ্চলের জন্য একটি **আঞ্চলিক সভা** (Zonal Council) গঠন করা হইয়াছে। অঞ্চলগুলি হইল :—

১। উত্তর অঞ্চল (Northern Zone)—পাঞ্জাব, রাজস্থান, জম্মু ও কাশ্মীর, দিল্লী এবং হিমাচল প্রদেশ লইয়া এই অঞ্চল গঠিত হইয়াছে।

২। মধ্য অঞ্চল (Central Zone) —উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশ লইয়া এই অঞ্চলটি গঠিত।

৩। পূর্ব অঞ্চল (Eastern Zone)—এই অঞ্চলের সদস্য রাজ্যগুলি হইল বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা, আসাম ও কেন্দ্র-শাসিত মণিপুর ও ত্রিপুরা।

৪। পশ্চিম অঞ্চল (Western Zone)—পশ্চিম অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত হইল বোম্বাই ও মহীশূর।

৫। দক্ষিণ অঞ্চল (Southern Zone)—অন্ধ্র, কেরল ও মাদ্রাজ লইয়া এই অঞ্চল গঠন করা হইয়াছে।

এস্থলে একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই আঞ্চলিক বিভাগ রাজ্য-পুনর্গঠন আইনের অংগীভূত করা হয় নাই।

আঞ্চলিক সভার গঠন ও ক্ষমতা (Composition and Functions of the Zonal Councils)

প্রত্যেকটি আঞ্চলিক সভা নিম্নলিখিতভাবে গঠিত হইবে

১। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার একজন সদস্য; ২। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ; জম্মু ও কাশ্মীরের ক্ষেত্রে সদর-ই-রিয়াসৎ কর্তৃক মনোনীত অপর দুইজন মন্ত্রী, অন্য রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে রাজ্যপাল কর্তৃক মনোনীত দুইজন মন্ত্রী এবং যে সমস্ত অঞ্চলে কোন মন্ত্রিপরিষদ নাই, সে সমস্ত অঞ্চল হইতে রাষ্ট্রপতি-মনোনীত তিনজন সদস্য ; ৩। যে অঞ্চলে পূর্বতন 'গ' শ্রেণীর কোন রাজ্য অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে, সেখানে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক 'গ' শ্রেণীর প্রতি রাজ্য হইতে মনোনীত দুইজন সদস্য ; ৪। পূর্বাঞ্চলের ক্ষেত্রে আসাম সরকারের উপজাতি সম্পর্কিত উপদেষ্টা।

রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত কেন্দ্রীয় মন্ত্রিমহাশয় আঞ্চলিক সভার সভাপতি হইবেন। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের প্রত্যেকটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এক বৎসরের জন্য পর্যায়ক্রমে সহ-সভাপতির কার্য করিবেন। পরিকল্পনা সমিতি (Planning Commission) কর্তৃক মনোনীত একজন সদস্য, সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকটি রাজ্যের মুখ্য কর্মসচিব (Chief Secretary) এবং প্রত্যেক রাজ্যের উন্নয়ন অধিকর্তা (Development Commissioner) অথবা রাজ্য সরকার কর্তৃক মনোনীত অপর কোন সরকারী কর্মচারী আঞ্চলিক সভার উপদেষ্টা হিসাবে কার্য করিবেন। আঞ্চলিক সভার বৈঠক প্রত্যেক অঞ্চলের প্রত্যেক রাজ্যে পর্যায়ক্রমে বসিবে এবং এই সভার কার্য পরিচালনার জন্য একটি ক্ষুদ্র দপ্তরখানা (Secretariat) থাকিবে। সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক রাজ্যের মুখ্য কর্মসচিব এক বৎসরের জন্য দপ্তরখানার কর্মসচিব হইবেন এবং যুগ্ম-কর্মসচিব সভাপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন। সভার কার্য সাধারণতঃ সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে স্থিরীকৃত হইবে এবং সমান ভোটের ক্ষেত্রে সভাপতির ভোট দ্বারা মীমাংসা হইবে। সভার প্রত্যেকটি প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকার ও সংশ্লিষ্ট রাজ্যসরকারগুলির নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

আঞ্চলিক সভাগুলি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা ও সুপারিশ করিতে পারে। ১। রাজ্যগুলির সাধারণ স্বার্থসম্পর্কিত অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন পরিকল্পনা, ২। রাজ্যগুলির সীমানা সম্পর্কিত বিরোধ, সংখ্যালঘু ভাষাভাষী সমস্যা ও আন্তঃরাজ্য পরিবহন ব্যবস্থা, ৩। রাজ্যপুনর্গঠন আইন বলবৎ হওয়ার ফলে উদ্ভূত যে-কোন সমস্যা।

দুই বা ততোধিক অঞ্চলের দুই বা ততোধিক রাজ্যের সম-স্বার্থ সম্পর্কিত বিষয়ে দুই বা ততোধিক আঞ্চলিক সভার যুক্ত অধিবেশন হইতে পারে সভার

যুক্ত অধিবেশনের স্থান, কাল ও কর্মসূচী সংশ্লিষ্ট সভার সভাপতিগণ পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার দ্বারা স্থির করিবেন। যুক্ত অধিবেশনের সিদ্ধান্ত ও সুপারিশ সংশ্লিষ্ট সরকারগুলিকে জ্ঞাত করান হয়। সভাগুলির যুক্ত অধিবেশন পরিচালনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারও নিয়মকানুন প্রবর্তন করিতে পারে।

সংক্ষিপ্তসার

ভারতের নূতন সংবিধান ভারতকে একটি যুক্তরাষ্ট্রের ভিত্তিতে গঠিত করিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হইল : (১) একসঙ্গে একটি কেন্দ্রীয় সরকার ও কতকগুলি রাজ্য সরকারের পাশাপাশি অবস্থিতি, (২) ক্ষমতার বিভাগ ও বণ্টন, (৩) লিখিত ও অনমনীয় শাসনতন্ত্র, (৪) যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত ও (৫) রাজস্বের বণ্টন। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের উপরি-উক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি দেখিতে পাওয়া যায়। আদি শাসনতন্ত্র অনুসারে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র 'ক', 'খ' ও 'গ' এই তিন শ্রেণীর রাজ্য এবং 'ঘ' শ্রেণীর অঞ্চল লইয়া গঠিত হইয়াছিল। তাহার পর ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে ১৯৫৬ সালে ভারত সরকার যে রাজ্য পুনর্গঠন আইন পাস করেন, সেই আইন অনুসারে ১৯৫৬ সালের ১লা নভেম্বর হইতে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র মাত্র দুই শ্রেণীর অঞ্চল লইয়া গঠিত হইয়াছে। ভাষার ভিত্তিতে বোম্বাই রাজ্য দ্বিখণ্ডিত হওয়ার ফলে রাজ্য-সংখ্যা হইয়াছিল ১৫টি।

(ক) ১৬টি রাজ্য ও

(খ) ৯টি কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চল।

(ক) রাজ্য—		(খ) কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চল—	
১। অন্ধ্রপ্রদেশ	২। আসাম	১। দিল্লী	২। হিমাচল প্রদেশ
৩। বিহার	৪। গুজরাট	৩। মণিপুর	৪। ত্রিপুরা
৫। মহারাষ্ট্র	৬। কেরল	৫। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ	৬। লাক্ষাদ্বীপ মিনিকয় ও আমিনদিভ দ্বীপপুঞ্জ
৭। মধ্যপ্রদেশ	৮। মাদ্রাজ	৭। নাগা পার্বত্য তুয়েনসাঙ্	৮। দাদ্রা ও নগর হেভেলি, গোয়া, দমন ও দিউ
৯। মহীশূর	১০। উড়িষ্যা	৯। পণ্ডিচেরী	
১১। পাঞ্জাব	১২। রাজস্থান		
১৩। উত্তরপ্রদেশ	১৪। পশ্চিমবঙ্গ		
১৫। জম্মু ও কাশ্মীর	১৬। নাগাভূমি		

রাজ্য পুনর্গঠন আইন বলবৎ হওয়ার ফলে কেবলমাত্র জম্মু ও কাশ্মীর, উত্তরপ্রদেশ, আসাম ও উড়িষ্যা ব্যতীত অন্যান্য রাজ্যগুলির আয়তন, জনসংখ্যা ও সম্পদের পরিবর্তন ঘটিয়াছে। রাজ্য পুনর্গঠনের ফলে পূর্বতন বিহার রাজ্যের পূর্ণিয়া জেলার কিয়দংশ ও পুরুলিয়া পশ্চিমবঙ্গভুক্ত হইয়াছে এবং আয়তনে পূর্বতন বোম্বাই বৃহত্তম রাজ্য ও জনসংখ্যায় উত্তরপ্রদেশ বৃহত্তম রাজ্যে পরিণত হইয়াছে।

পুনর্গঠনের ফলে এক জম্মু ও কাশ্মীর ব্যতীত ১৪টি রাজ্যে একই গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্তন হইয়াছে। প্রত্যেক রাজ্যেই একজন নিয়মতান্ত্রিক রাজ্যপাল, দায়িত্বশীল মন্ত্রিমণ্ডলী, একটি আইনসভা ও একটি উচ্চ আদালত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলগুলি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত শাসনকর্তা দ্বারা শাসিত হইবে এবং এই অঞ্চলগুলির জন্য একমাত্র পার্লামেণ্ট সভা আইন প্রণয়ন করিতে পারিবে।

আঞ্চলিক পরামর্শ সভা—

রাজ্য পুনর্গঠন আইন অনুসারে সমগ্র ভারতের পাঁচটি অঞ্চলে ভাগ করিয়া প্রত্যেকটি অঞ্চলের জন্য একটি আঞ্চলিক পরামর্শ-সভা গঠন করা হইয়াছে। অঞ্চলগুলি হইল :—

১। উত্তর অঞ্চল—পাঞ্জাব, রাজস্থান, জম্মু ও কাশ্মীর, দিল্লী ও হিমাচল প্রদেশ লইয়া এই অঞ্চল গঠিত।

২। মধ্য অঞ্চল—উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশ লইয়া এই অঞ্চল গঠিত।

৩। পূর্ব অঞ্চল—এই অঞ্চল বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা, আসাম ও কেন্দ্র-শাসিত মণিপুর ও ত্রিপুরা লইয়া গঠিত।

৪। পশ্চিম অঞ্চল—বোম্বাই ও মহীশূর হইল এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত।

৫। দক্ষিণ অঞ্চল—অন্ধ্র, কেরল ও মাদ্রাজ লইয়া এই অঞ্চল গঠিত।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার একজন সদস্য, সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের প্রত্যেকটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও আরও কতিপয় সদস্য লইয়া পরামর্শ-সভা গঠিত হইয়াছে। রাজ্যগুলির সাধারণ স্বার্থ-সম্পর্কিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা ও সুপারিশ করা হইল পরামর্শ সভাগুলির প্রধান কায।

প্রশ্ন

1. What are the different parts of the Indian Union and what are their relation with the Union Government ?

চতুর্থ অধ্যায়

প্রস্তাবনা

(The Preamble to the Constitution)

ভারতের শাসনতন্ত্রের প্রস্তাবনা (The Preamble to the Constitution of India)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের অনুরূপভাবে ভারতের শাসনতন্ত্রেও একটি প্রস্তাবনা সংযোজিত হইয়াছে। প্রস্তাবনায় শাসনতন্ত্র-প্রণয়নের উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হইয়াছে। প্রস্তাবনায় ভারতকে একটি সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র (Sovereign Democratic Republic) নামে অভিহিত করা হইয়াছে এবং জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকল নাগরিকের জন্য সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃভাব সৃষ্টি করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

"*We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a Sovereign Democratic Republic and to secure to all its citizens.*

Justice, social, economic and political, Liberty of thought, expression, belief, faith and worship ; Equality of Status and of opportunity, and to promote among them all .

Fraternity assuring the dignity of the individual and the unity of the nation ;

In our Constituent Assembly this twenty-sixth day of November, 1949, do hereby Adopt, Enact and give to ourselves this Constitution."

প্রস্তাবনায় তিনটি উদ্দেশ্য প্রচারিত হইয়াছে। প্রথমতঃ, বলা হইয়াছে যে, ভারত সরকারের ক্ষমতার একমাত্র উৎস হইল ভারতীয় জনগণ (We the people of India)। যেহেতু এই ক্ষমতা জনসাধারণের নিকট হইতে প্রাপ্ত সেই হেতু কোন ব্যক্তিবিশেষ বা ব্যক্তিসমষ্টি বা কোন রাজ্য বা অন্য কেহ এই ক্ষমতার বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন করিতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ, প্রস্তাবনা অনুসারে ভারতের জনগণ সরকারের নিকট হইতে কয়েকটি কর্তব্য সম্পাদনের দাবী রাখে। সরকার ভারতের সকল নাগরিকের সামাজিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক সমানাধিকার, চিন্তা ও স্বাধীন মতামত

ব্যক্ত করিবার অধিকার, ধর্মীয়, বৃত্তিগত ও কৃষ্টিগত অধিকার ভোগ করিতে সাহায্য করিবেন এবং এই অধিকারগুলি সুরক্ষিত করিবেন।

তৃতীয়তঃ, এই প্রস্তাবনার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের বিভিন্ন হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্ট শাসনতন্ত্রের বিভিন্ন ধারার যথাযথ ব্যাখ্যা ও ভাষ্য করিতে সক্ষম হইবে। প্রস্তাবনায় শাসনতন্ত্র রচনার উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হইয়াছে এবং শাসনতন্ত্রের কোন অংশের অভিপ্রায় সম্পর্কে যদি কখনও সংশয় জাগে তাহা হইলে বিচারপতিগণ প্রস্তাবনায় বর্ণিত উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করিতে পারিবেন। প্রস্তাবনাই শাসনতন্ত্রের ভাষ্যের পথনির্দেশকের কাজ করিবে।

প্রস্তাবনায় ভারতকে সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। অনেক সমালোচক ভারতকে সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র আখ্যা দিতে আপত্তি করেন। আপত্তির প্রথম কারণ হইল যে, প্রস্তাবনায় বলা হইয়াছে যে, ভারতে শাসনক্ষমতার প্রধান উৎস হইল ভারতীয় জনসাধারণ। কিন্তু কার্যতঃ দেখা যায় যে, ভারতের বর্তমান শাসনতন্ত্র যে প্রতিনিধি-সংসদ কর্তৃক রচিত হইয়াছিল তাহাকে প্রকৃতপক্ষে জনগণের প্রতিনিধিমূলক সংসদ বলা কোনক্রমেই যুক্তিসঙ্গত নহে। যে গণপরিষদ কর্তৃক এই শাসনতন্ত্র রচিত হইয়াছে, সেই গণপরিষদের সদস্যগণ ভারতের সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা মাত্র চৌদ্দজন ভোটদাতার ভোটে গঠিত প্রাদেশিক আইনপরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত হইয়াছিলেন। সুতরাং এইরূপ সংকীর্ণ ভোটদান-ক্ষমতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত কোন সংসদকেই প্রতিনিধিমূলক সংসদ বলা যায় না।

কিন্তু ভারতের সংবিধানের সার্বজনীন ভিত্তির বিরুদ্ধে উপরি-উক্ত যুক্তি বর্তমানে আর প্রযোজ্য নহে। কারণ ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে সার্বজনীন ভোটাধিকার ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়া যে নূতন পার্লামেণ্ট সভা গঠিত হইয়াছিল সে সভাও পূর্বতন গণপরিষদ কর্তৃক রচিত সংবিধান বর্জন না করিয়া সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়াছে : প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার দ্বারা নির্বাচিত পার্লামেণ্ট সভা কর্তৃক গৃহীত সংবিধান যে ভারতীয় জনগণের পূর্ণ সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহা এখন আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

সমালোচনা (Criticism)

প্রস্তাবনায় ভারতীয় জনগণের পক্ষে কতকগুলি উচ্চ আদর্শ ও অভীষ্টের

অবতারণা করা হইয়াছে। ভারতের সংবিধানের প্রধান উদ্দেশ্য হইল, জনগণের মধ্যে স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীভাব আনয়ন করা। শাসনতন্ত্রের সমালোচকগণ বলেন যে, সংবিধানে কতকগুলি উচ্চ আদর্শের অবতারণা করা অপেক্ষাকৃত সহজ, কিন্তু এই আদর্শগুলি কার্যক্ষেত্রে রূপায়িত করিবার কোনরূপ ব্যবস্থা ভারতীয় সংবিধান কর্তৃক গৃহীত হয় নাই। সুতরাং শাসনতন্ত্রে উল্লিখিত এই স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর বাণী নিরর্থক হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত তাঁহারা আরও বলেন যে, প্রকৃত অর্থনৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত না হইলে রাজনৈতিক গণতন্ত্র কতদূর সাফল্য অর্জন করিতে সমর্থ হইবে, তাহাও বিচার্য বিষয়।

উপরি-উক্ত বিরুদ্ধ সমালোচনার মধ্যে কিছু পরিমাণ যুক্তি থাকিলেও উহা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করা যায় না। কোন নবগঠিত জাতি যদি একটি উচ্চ আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত না হয়, তাহা হইলে সে জাতি কখনও কোনও ক্ষেত্রে জাতীয় জীবনের মান উন্নয়ন করিতে পারে না। ভারতের সংবিধানে যে উচ্চ আদর্শের উল্লেখ করা হইয়াছে, সে আদর্শ অনুসারে যে শাসনকার্য পরিচালিত হইতেছে না, একথা বলিলে সত্যের অপলাপ হইবে। অস্পৃশ্যতা দূর করিয়া জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সমানাধিকার প্রতিষ্ঠিত করা ভারতীয় শাসনব্যবস্থার এক অন্যতম প্রধান কীর্তি। জমিদারী প্রথার বিলোপসাধন, প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির ভোটাধিকার প্রবর্তন এবং জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অন্য নানারূপ গঠনমূলক কার্য, বিশেষ করিয়া তিনটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দ্বারা সংবিধানে উল্লিখিত উচ্চ আদর্শগুলিকে কার্যকরী করিবার প্রচেষ্টা চলিতেছে। ভারতের জনসাধারণের মধ্যে গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য এখনও গড়িয়া উঠে নাই। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় জনসাধারণ সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। তাহা সত্ত্বেও স্বাধীনতা লাভ করিবার কুড়ি বৎসরের মধ্যে ভারতের ন্যায় অনগ্রসর দেশ সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে সাফল্য অর্জন করিয়াছে, একনায়কতন্ত্র শাসনব্যবস্থা ব্যতীত অন্য কোথায়ও তাহা সম্ভব হয় নাই। সুতরাং বিরুদ্ধ সমালোচকগণের ধৈর্য-চ্যুতির কোন কারণ ঘটে নাই।

ভারত ও সাধারণতন্ত্র রাষ্ট্রসমূহ (India and the Commonwealth)

প্রজাতান্ত্রিক ভারতের সহিত বৃটিশ কমনওয়েলথের সম্পর্ক লইয়া অনেক বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রস্তাবনায় ভারতকে একটি সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র বলা হইয়াছে। কিন্তু ভারত বৃটিশ রাজার আনুগত্য স্বীকার না

করিলেও কমনওয়েল্‌থের সদস্য হিসাবে তাঁহার নেতৃত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছে। বৃটিশ রাজার এই নেতৃত্ব স্বীকৃতির ফলে ভারতের সার্বভৌম ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে বলিয়া অনেকে মনে করেন।

সত্য বটে যে, ভারত বৃটিশ রাজার নেতৃত্ব মানিয়া লইয়াছে। কিন্তু একটু প্রণিধানপূর্বক দেখিলেই এই নেতৃত্ব স্বীকার করিবার তাৎপর্য সম্যক উপলব্ধি করা যায়। এ সম্পর্কে ভারতের ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী নেহরুর উক্তি উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন যে, আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কমনওয়েল্‌থটি কোন অর্থেই একটি অভিভাবক রাষ্ট্র (Supor-State) নহে। আমরা রাজাকে এই স্বাধীন রাষ্ট্রসংঘের নেতৃত্বের প্রতীক বলিয়া বিবেচনা করিতে স্বীকৃত হইয়াছি, কিন্তু এই সাধারণতন্ত্র রাষ্ট্রসমূহ সম্পর্কে রাজার কোন কর্তব্য নাই। ভারতের শাসনতন্ত্র অনুসারে বলা যায় যে, আমরা রাজার কোন আনুগত্য স্বীকার করিব না।

ইংলণ্ডের রাজাকে সাধারণতন্ত্র রাষ্ট্রসমূহের নেতৃত্বের প্রতীক বলিয়া মানিয়া লইবার ফলে ভারত অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রসমূহের বিনা সম্মতিতে নূতন কোন বংশকে ইংলণ্ডের রাজসিংহাসনে স্থাপন করিতে বা এতদসংক্রান্ত উত্তরাধিকার আইন পরিবর্তন-সম্বলিত কোন আইন পরিবর্তন করিতে পারে না। ভারত-সম্পর্কে বৃটিশ রাজার আদৌ কোন ক্ষমতা নাই—এমন কি আনুষ্ঠানিক ব্যাপারেও রাজার নাম উচ্চারিত হয় না। রাজার নেতৃত্ব শুধু একটি ধারণা মাত্র। বিগত দেড়শত বৎসরের বৃটিশ শাসনের ফলে ভারতের জাতীয় জীবন নানাভাবে গ্রেট বৃটেনের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। দেড়শত বৎসরের বৃটিশ শাসন নানাভাবে আমাদের জাতীয় জীবনকে পঙ্গু করিয়াছে ইহা মানিয়া লইলেও একথা অনস্বীকার্য যে, ইংরাজ জাতির সংস্পর্শে আসিয়া ভারতবাসী অনেক বিষয়ে লাভবান্ হইয়াছে। ভারতের বর্তমান শাসনব্যবস্থা, শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য, খেলাধূলা প্রভৃতি নানাবিষয়ের উপর বৃটিশ প্রভাব সুস্পষ্টরূপে বিদ্যমান। ভারতরাষ্ট্রের কর্ণধারগণ মনে করেন যে, স্বাধীন-ভাবে যদি এই স্বাধীন বৃটিশ জাতির সহিত আরও কিছুদিন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখা যায় তাহা হইলে শিশুরাষ্ট্র ভারত অনেক বিষয়ে অধিকতর লাভবান্ হইবে। তাই ভারত স্বেচ্ছায় কমনওয়েল্‌থভুক্ত রাষ্ট্রের সদস্য রহিয়াছে। প্রয়োজনক্ষেত্রে ভারত বৃটেনের বিরোধিতা করিতেও পশ্চাৎপদ নহে। ভারতকে কমনওয়েল্‌থের সদস্য রাখিবার নিমিত্তই 'বৃটিশ কমনওয়েল্‌থ' হইতে 'বৃটিশ'

শব্দটি পরিত্যক্ত হইয়াছে। সুতরাং কমনওয়েল্থ সদস্যভুক্ত হওয়ায় ভারতরাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব কোন প্রকারে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

সংক্ষিপ্তসার

প্রস্তাবনা—প্রস্তাবনায় শাসনতন্ত্র-প্রণয়নের উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হইয়াছে। প্রস্তাবনায় ভারতকে একটি 'সার্বভৌমত্ব গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে এবং সকল নাগরিকের জন্য সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীভাব আনয়নের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

প্রস্তাবনায় ভারতীয় জনগণের পক্ষে কতকগুলি উচ্চ আদর্শ ও অভীষ্টের কথা বলা হইয়াছে। ভারতের সংবিধানের প্রধান উদ্দেশ্য হইল জনগণের মধ্যে স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীভাব আনয়ন করা। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এইরূপ অবস্থা সৃষ্টি করা সম্ভব হইবে কিনা সে সম্বন্ধে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেন। ইহা ছাড়া আরও বলা হয় যে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই স্বাধীনতা ও সাম্যের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত না হইলে প্রস্তাবনায় উল্লিখিত আদর্শের বাণী নিরর্থক হইবে। এই সমালোচনার বিরুদ্ধে বলা যাইতে পারে যে, কোন সংগঠিত জাতি যদি একটি উচ্চ আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত না হয়, তাহা হইলে সে জাতি কখনও কোন ক্ষেত্রে জাতীয় জীবনের মান উন্নয়ন করিতে পারে না। সংবিধানে উল্লিখিত উচ্চ আদর্শ অনুযায়ী যে শাসন কার্য পরিচালিত হইতেছে না, একথা বলাও সত্য নহে। অস্পৃশ্যতা দূর করিয়া সকলের জন্য সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা, জমিদারী প্রথার বিলোপ-সাধন, প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার প্রবর্তন, উত্তরাধিকার কর, সম্পদ কর প্রভৃতি ধার্য এবং জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অন্য নানারূপ গঠনমূলক কার্য, বিশেষ করিয়া তিনটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাহায্যে সংবিধানে উল্লিখিত উচ্চ আদর্শগুলিকে কার্যকরী করিবার প্রচেষ্টা চলিয়াছে। আশা করা যায়, জনসাধারণের সাহায্য ও সহযোগিতা লাভ করিলে সংবিধানে বর্ণিত উচ্চ আদর্শগুলি কার্যকরী করা সম্ভব হইবে।

সাধারণতন্ত্র-ভুক্ত রাষ্ট্রগুলির সদস্য হিসাবে ভারত ইংলণ্ডের রাজা বা রাণীর নেতৃত্ব স্বীকার করিয়াছে সত্য, কিন্তু ভারত ইংলণ্ডের রাজা বা রাণীর আনুগত্য স্বীকার করে নাই। ভারত কতকগুলি সুবিধা পাইবার উদ্দেশ্যে সাধারণতন্ত্র-ভুক্ত রাষ্ট্রগুলির সদস্য রহিয়াছে। স্বেচ্ছায় ভারত এই সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছে এবং

নিজ ইচ্ছামত এই সদস্যপদ পরিত্যাগ করিতে পারে। সুতরাং সাধারণতন্ত্র-ভুক্ত হওয়ার ফলে ভারতরাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব বা মর্যাদা হানি হয় নাই।

১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে যে গণপরিষদ শাসনতন্ত্র রচনা করে, সে গণপরিষদ সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গঠিত হয় নাই—ইহা সত্য। কিন্তু ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে যে পার্লামেন্ট সভা গঠিত হয়, সে সভা কর্তৃক আদি শাসনতন্ত্র অনুমোদিত হয়। সুতরাং ভারতে শাসনতন্ত্রের সার্বজনীন ভিত্তি অস্বীকার করা যায় না। ভারতে শাসনক্ষমতার প্রকৃত উৎস হইল 'আমরা ভারতবাসী'।

রাজার পরিবর্তে একজন নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি হইলেন ভারত-শাসনের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি। সুতরাং ভারতকে একটি প্রজাতন্ত্র বলা হইয়াছে।

প্রশ্নাবলী

1. The Preamble to the Constitution of India states that India "shall be a Sovereign Democratic Republic." Explain this. (C. U. 1955)

2. Summarise and explain the Preamble to the Constitution of India.

3. Analyse the Preamble to the Constitution of India. Is India's status as a "Sovereign Democratic Republic" impaired by her membership of the Commonwealth of Nations?

4. What is the significance of the Preamble to a Constitution? Discuss in brief the Preamble to the Constitution of India.

পঞ্চম অধ্যায়

ভারতের নাগরিকত্ব ও মৌলিক অধিকারসমূহ

(Indian Citizenship and Fundamental Rights)

নাগরিকত্ব (Citizenship)

ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হইলেও সমগ্র ভারতে মাত্র এক-দফা নাগরিক অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে যেখানে শাসনতন্ত্র কর্তৃক দুইদফা নাগরিক অধিকার স্বীকৃত হয়, সে সমস্ত দেশে ভোটাধিকার ও সরকারী কার্যে লোকনিয়োগ প্রভৃতি ব্যাপারে প্রত্যেক রাজ্য নিজ নিজ নাগরিকের প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করিতে পারে। এ বিষয়ে ভারতের সংবিধান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের নীতি অনুসরণ করে নাই। ভারতে নাগরিকগণ শুধুমাত্র ভারতীয় নাগরিক বলিয়া পরিচিত।

প্রত্যেক রাষ্ট্র নাগরিক ও বিদেশী—এই দুই শ্রেণীর জনসমষ্টি লইয়া গঠিত। নাগরিকগণ রাষ্ট্র-প্রদত্ত সমুদয় পৌর ও রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করিতে পারে, কিন্তু বিদেশীগণ কিছু পরিমাণ পৌর অধিকার ভোগ করিতে সক্ষম হইলেও রাজনৈতিক অধিকার হইতে সাধারণতঃ বঞ্চিত থাকে।

স্বাধীন ভারতের সংবিধান কর্তৃক ভারতীয় নাগরিকগণের উপর কতিপয় অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা অর্পিত হইয়াছে। বিদেশীগণ শুধু যে এই অধিকারগুলি হইতে বঞ্চিত তাহা নহে, অনেক ক্ষেত্রে আবার আইনানুযায়ীভাবে তাহাদের উপর অক্ষমতা আরোপ করা হইয়াছে।

প্রথমতঃ, ভারতের সংবিধানে বর্ণিত সমুদয় অধিকারগুলি একমাত্র ভারতের নাগরিকগণ ভোগ করিতে পারে, বিদেশীগণ পারে না।

দ্বিতীয়তঃ, একমাত্র ভারতীয় নাগরিকগণ রাষ্ট্রপতি, উপ-রাষ্ট্রপতি, সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি, রাজ্যপাল প্রভৃতি কতিপয় পদে নিযুক্ত হইতে পারে।

তৃতীয়তঃ, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের লোকসভা ও রাজ্যগুলির বিধান সভার সদস্য নির্বাচনের ভোটদান ক্ষমতা একমাত্র ভারতীয় নাগরিকগণ ভোগ করেন। ভারতের পার্লামেণ্ট ও রাজ্য আইনসভার সদস্য হইবার অধিকারও একমাত্র

ভারতীয় নাগরিকগণের উপর অর্পিত হইয়াছে। বিদেশীগণ উপরি-উক্ত সকল অধিকার হইতে বঞ্চিত।

ভারতের শাসনতন্ত্র স্থায়ী অথবা সমগ্রভাবে নাগরিকতার কোন সংজ্ঞা নির্দেশ করে নাই। শাসনতন্ত্র বলবৎ হইবার কাল হইতে কোন্ কোন্ শ্রেণীর ব্যক্তিগণ ভারতীয় নাগরিক পর্যায়ভুক্ত হইবেন শুধু তাহা স্থির করিয়া নাগরিকতা সম্পর্কে অন্যান্য নিয়মগুলি ভবিষ্যতে পার্লামেণ্ট কর্তৃক নির্ধারিত হইবে বলিয়া নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হইবার সময়ে বিভিন্ন প্রকার অধিবাসীর উপর নাগরিক অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে। ভারতীয় পার্লামেণ্ট সভা নাগরিক অধিকার সম্পর্কে যে-কোন রূপ পরিবর্তন আনয়ন করিতে ও নূতন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে। নাগরিক অধিকার-সম্পর্কিত নিয়মগুলি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, নাগরিক অধিকার অর্জন করা ভারতে খুব সহজসাধ্য। ভারত-বিভাগের ফলে যে আশ্রয়-প্রার্থীর সমাগম হইয়াছে তাহাদের নাগরিক অধিকার দিবার জন্য নাগরিক অধিকার অত্যন্ত সহজলভ্য করা হইয়াছে।

ভারতীয় নাগরিক বলিয়া পরিগণিত হইতে হইলে যে-কোন ব্যক্তির পক্ষে নিম্নলিখিত তিনটি শর্তের যে-কোন একটি পূরণ করিতে হইবে:—

১। যে-কোন ব্যক্তি ভারতের অধিবাসী হইলে এবং সে এখানে জন্মগ্রহণ করিলে অথবা তাহার পিতামাতা এখানে জন্মগ্রহণ করিলে, অথবা এই দেশে অন্ততঃ পাঁচ বৎসরাধিক কাল বসবাস করিলে সে ভারতীয় নাগরিক বলিয়া পরিগণিত হইবে।

২। (ক) যদি কোন ব্যক্তির পিতামাতা বা পিতামহ-পিতামহী অবিভক্ত ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন এবং এইরূপ ব্যক্তি যদি ১৯৪৮ সালের ১৯শে জুলাইয়ের পূর্বে পাকিস্তান হইতে দেশত্যাগ করিয়া ভারতে বসবাস করিতে থাকে, (খ) এরূপ ব্যক্তি যদি উল্লিখিত তারিখের পরবর্তী কালে ভারতে আসিয়া নাগরিক অধিকার অর্জন করিবার জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা রেজিষ্ট্রি-ভুক্ত হয় এবং রেজিষ্ট্রেশন দরখাস্ত করিবার পূর্বে কমপক্ষে ছয়মাস ভারতে বসবাস করে তাহা হইলে সে ভারতীয় নাগরিক হইবে।

৩। যে সমস্ত ব্যক্তি ১৯৪৭ সালের ১লা মার্চের পর ভারত হইতে পাকিস্তানে চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু পরবর্তী কালে ভারতের ছাড়পত্র লইয়া স্থায়ি-ভাবে বসবাস করিবার জন্য ভারতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে, তাহারাও উপরি-উক্ত

২(খ) সূত্রানুযায়ী আবেদন করিয়া ভারতীয় নাগরিক অধিকার লাভ করিতে পারে।

ভারতে জন্ম অথবা ভারতীয় পিতামাতার সন্তান প্রবাসী হইলেও ভারতীয় নাগরিকত্ব অর্জন করিতে পারে। এরূপক্ষেত্রে প্রবাসীকে তত্রত্য ভারতীয় রাষ্ট্র-প্রতিনিধির নিকট আবেদন করিতে হইবে। যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ভারতীয় নাগরিকত্ব বর্জন করিয়া ভিন্ন দেশের নাগরিকত্ব অর্জন করিয়াছে সে কখনও ভারতীয় নাগরিক বলিয়া পরিগণিত হইবে না। ভারতীয় নাগরিক অধিকার-প্রাপ্ত ব্যক্তি তাহার খুশীমত নাগরিকত্ব অস্বীকার করিতে পারিবে না।

ভারতে নাগরিক অধিকারের বিলুপ্তি (Loss of Indian citizenship)

১৯৫৫ সালে ভারতের পার্লামেণ্ট সভা নাগরিকত্ব আইন (Citizenship Act) পাস করে। এই আইন অনুসারে পাঁচটি বিভিন্ন পদ্ধতিতে ভারতের নাগরিক হওয়া যায় ; যথা, ১। জন্ম (Birth), ২। বংশ (Descent), ৩। অর্জন (Naturalisation), ৪। রেজেষ্ট্রিভুক্ত হওয়া (Registration) ও ৫। রাষ্ট্র-ভুক্তি (Incorporation of territory)। এই আইনে আরও বলা হইয়াছে যে, ভারতীয় নাগরিক কমনওয়েলথভুক্ত রাষ্ট্রগুলিতে এবিষয়ে যে সুবিধা পাইবে, ভারত ঐ সব দেশের নাগরিকগণকে অনুরূপ সুবিধা দিবে।

তিনটি উপায়ে ভারতে নাগরিক অধিকারের বিলুপ্তি ঘটিতে পারে। প্রথমতঃ, যুদ্ধের সময় ব্যতীত, যে-কোন ভারতীয় প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক স্বেচ্ছায় তাহার ভারতীয় নাগরিকত্ব পরিহার করিতে পারে। এজন্য তাহাকে একটি ঘোষণা করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, ভারতীয় নাগরিক যদি ভিন্ন দেশে নাগরিক অধিকার অর্জন করে তাহা হইলে তাহার ভারতীয় নাগরিকত্ব আপনা হইতেই বিলুপ্ত হয়। তৃতীয়তঃ, যদি কোন বিদেশী ভারতে নাগরিক অধিকার অর্জন করিবার পর ভারতে বহুদিন পর্যন্ত ক্রমাগত অনুপস্থিত থাকে বা ভারতের প্রতি তাহার আনুগত্যের অভাব ঘটে তাহা হইলেও এরূপ অর্জিত নাগরিকত্বের অবসান ঘটে।

নাগরিকগণের মৌলিক অধিকার (Fundamental Rights of Indian citizens)

ভারতের নূতন শাসনতন্ত্রের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহার দ্বারা

ভারতীয় নাগরিকের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকারগুলি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় এই অধিকারগুলি জনসাধারণের ব্যক্তিত্ববিকাশের অপরিহার্য উপাদান বলিয়া বিবেচিত হয়। এই অধিকারগুলি যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, সেজন্য সংবিধান দ্বারা আদালতের বিচারের ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। সংবিধানানুযায়ী নাগরিকগণকে নিম্নলিখিত মৌলিক অধিকারগুলি দেওয়া হইয়াছে :—

১। সাম্যের অধিকার (Right of Equality)

সাম্যের অধিকারের অর্থ হইল যে, আইনের চক্ষে সকলেই সমান এবং আইন সকল ব্যক্তিকেই সমভাবে সংরক্ষণ করিবে। রাষ্ট্র কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রেই এই আইনগত সাম্য অস্বীকার করিতে পারিবে না। ডাইসি ইংলণ্ডের আইনের অনুশাসন (Rule of Law) বিধির যে ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন তদনুসারে বলা যায় যে, সাম্যের অধিকারের অর্থ হইল কোন ব্যক্তিই আইনের ঊর্ধ্বে নহে। পদমর্যাদা-নির্বিচারে সকল ব্যক্তিই একই আইনের নিয়ন্ত্রণাধীন এবং একই বিচারালয়ের নিকট দায়ী। অবশ্য এই নিয়মের কিছু ব্যতিক্রমও দেখা যায়। ভারতের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালগণ যতদিন স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকেন ততদিন পর্যন্ত তাঁহাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা চলিতে পারে না এবং বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন না করিয়া দেওয়ানী মামলা রুজ্‌ করা যায় না। অবশ্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই আইনগত সমতার নীতি সমভাবে প্রযুক্ত না হইতে পারে। আয়কর ধার্য করিবার কালে রাষ্ট্র বিভিন্ন ব্যক্তিকে শ্রেণী বিভক্ত করিয়া বিভিন্ন শ্রেণীর ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগ ব্যাপারে পৃথকাচরণ করে। এই শ্রেণী বিভাগ অবশ্য যুক্তিসম্মত হওয়া চাই এবং একই শ্রেণীভুক্ত লোকের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্যমূলক আচরণ করা সমতা-বিরোধী হয়। এস্থলে আর একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সাম্যনীতি সার্থক করিতে হইলে বিচার-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে দরিদ্রগণ যাহাতে ধনীগণের ন্যায় ন্যায়বিচার পাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

জাতি, ধর্ম, বর্ণ, স্ত্রী, পুরুষ ও জন্মস্থান নির্বিশেষে সকল নাগরিকেরই সমান অধিকার সংবিধান কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে। সকল নাগরিকেরই (ক) দোকান, সাধারণের ব্যবহার্য রেস্তোঁরা, হোটেল ও প্রমোদস্থলে প্রবেশাধিকার থাকিবে। (খ) কূপ, পুষ্করিণী, অবগাহন-স্থান, রাস্তা ও আশ্রয়স্থান ব্যবহারের পূর্ণ

অধিকার থাকিবে। স্ত্রীলোক ও শিশুদিগের জন্য রাষ্ট্র পৃথক ব্যবস্থা করিতে পারিবে। সরকারী চাকুরীতে সকলকে সমানাধিকার দিতে হইবে, কিন্তু রাষ্ট্র অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অর্থাৎ আসন নির্দিষ্ট করিতে পারিবে। সমাজ-ব্যবস্থায় সাম্যভাবে অক্ষুণ্ণ রাখিবার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র কর্তৃক নাগরিকগণের মধ্যে কোন উপাধি বা পদবী-প্রদানের প্রথা রহিত করা হইয়াছে। ভারতীয় নাগরিক কোন বিদেশী রাষ্ট্রপ্রদত্ত উপাধি গ্রহণ করিতে পারিবে না। কেবলমাত্র সামরিক ও শিক্ষা-সংক্রান্ত উপাধি ব্যতীত অন্য কোনরূপ উপাধি প্রদান করা হইবে না।

মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত অস্পৃশ্যতাবর্জন নীতি নূতন সংবিধান কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে। যে-কোন আকারে অস্পৃশ্যতা নিষিদ্ধ করা হইয়াছে এবং অস্পৃশ্যতার জন্য কোন ব্যক্তির উপর কোনরূপ অক্ষমতা আরোপ করা আইনতঃ দণ্ডনীয় করা হইয়াছে। কিন্তু নূতন সংবিধানে অস্পৃশ্যতার কোনরূপ সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়া দেওয়া হয় নাই। তৎসত্ত্বেও ইহা বলিতে হইবে যে, সমাজদেহ হইতে অস্পৃশ্যতারূপ দুষ্টব্যাধি দূর করিয়া নূতন সংবিধান ভারতে প্রকৃত সাম্যের অগ্রগতির পথ সুগম করিয়া দিয়াছে। সমাজ-ব্যবস্থায় সাম্য প্রতিষ্ঠিত না হইলে গণতন্ত্র কখনও সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে না। প্রকৃত সাম্যপ্রতিষ্ঠাকল্পে উপাধিপ্রদান-প্রথা রহিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

২। স্বাধীনতার অধিকার (Right to Freedom)

এই অধিকারটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। শাসনতন্ত্র কর্তৃক স্বীকৃত হইযাছে যে, ভারতের সকল নাগরিকই বাক্‌স্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারী হইবে। এতদ্ব্যতীত সকল নাগরিকই নিরস্ত্রভাবে শান্তিপূর্ণ সমাবেশ, সংঘ প্রভৃতি গঠন করিতে পারিবে এবং ভারতের যে-কোন অংশে স্বাধীনভাবে ভ্রমণ, বসবাস, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয় এবং যে-কোন পেশা-গ্রহণ, জীবিকা, ব্যবসায় ও বাণিজ্যে লিপ্ত থাকিতে পারিবে।

উপরি-উক্ত অধিকারগুলি সম্পর্কে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কোন অধিকারই নাগরিকগণ অবাধে ভোগ করিতে পারে না। নাগরিকগণের কোন অধিকার যদি প্রচলিত নীতিজ্ঞানবিরোধী হয় এবং রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বা শান্তি-শৃঙ্খলা ও জনস্বার্থ ব্যাহত করে, তাহা হইলে রাষ্ট্র এই অধিকারগুলি সম্পর্কে নাগরিকগণকে সম্পূর্ণভাবে অথবা আংশিকভাবে বঞ্চিত করিতে পারে।

সংবিধানে•২২ (ক) সূত্রে বলা হইয়াছে যে, কোন ব্যক্তিকে কারণ না দেখাইয়া গ্রেপ্তার করা চলিবে না। আটক ব্যক্তিকে তাহার ইচ্ছামত একজন আইনজীবীর দ্বারা সমর্থিত হইবার অধিকার প্রদান করিতে হইবে। ২২ (খ) সূত্রে বলা হইয়াছে যে, গ্রেপ্তার করিবার পর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সেই ব্যক্তিকে নিকটস্থ কোন ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হাজির করিতে হইবে এবং ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ব্যতীত তাহাকে আটক রাখা চলিবে না। এই নিয়মের ব্যতিক্রম কেবলমাত্র রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তারক্ষাকল্পে আটক আইনের ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়। আটক আইনে আবদ্ধ ব্যক্তিকেও তিন মাসের অধিককাল আটক রাখা যায় না এবং এরূপ ব্যক্তিকেও যত শীঘ্র সম্ভব তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ জ্ঞাত করাইতে হইবে এবং আটক ব্যক্তিকে তাহার বক্তব্য পেশ করিবার অধিকার দিতে হইবে।

রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তারক্ষাকল্পে আটক আইন পরবর্তী কালে সংশোধন করা হইয়াছে। সংশোধিত আইন অনুসারে নিরাপত্তা আইনে আটক ব্যক্তির বিষয় তিনজন উচ্চ বিচারালয়ের বিচারকের সমপদমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি লইয়া গঠিত একটি পরামর্শদাতা কমিটির নিকট বিচারার্থ প্রেরণ করিতে হইবে। এই পরামর্শদাতা কমিটি যদি আটক ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ বিবেচনা করিয়া তাহার মুক্তির সুপারিশ করেন, তাহা হইলে আটক ব্যক্তিকে মুক্তিদান করিতে হইবে। নিরাপত্তা আইনে আটক ব্যক্তিসম্পর্কে পরামর্শদাতা কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া সরকারকে গ্রহণ করিতেই হইবে। কমিটির নিকট উপস্থিত হইয়া আটক ব্যক্তির তাহার বক্তব্য পেশ করিবার অধিকার না থাকিলেও কমিটি প্রয়োজন বোধ করিলে আটক ব্যক্তিকে কমিটির নিকট হাজির হইতে বলিতে পারে। সংশোধিত আইন অনুসারে মহকুমা শাসকগণ রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা আটক আইনের বলে কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারের আদেশ দিতে পারেন না। সংশোধিত আইন অনুসারে এইরূপ আটক ব্যক্তিকে মুক্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সংশোধিত আইনের দ্বারা মূল আইনের কঠোরতা অনেক পরিমাণে হ্রাস করা হইয়াছে।

৩। শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার (Right against Exploitation)

দাসব্যবসায়, বেগার খাটুনি ও অনুরূপভাবে বলপূর্বক শ্রম আদায় করা নিষিদ্ধ হইয়াছে। ১৪ বৎসরের কমবয়স্ক শিশুদের কারখানা, খনি বা অন্য

কোন বিপজ্জনক কার্যে নিযুক্ত করাও নিষিদ্ধ হইয়াছে। অবশ্য জনস্বার্থের উন্নতিকল্পে রাষ্ট্র সকলকেই কার্য করিতে বাধ্য করিতে পারে।

৪। ধর্মসম্বন্ধীয় স্বাধীনতার অধিকার (Right to Freedom of Religion)

সংবিধানে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখিত না হইলেও ভারতকে ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলা হয়। ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের অর্থ হইল যে, ভারতে রাজনীতিকে সম্পূর্ণভাবে ধর্ম হইতে পৃথক করা হইয়াছে। রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় ধর্মমতের কোন স্থান নাই। ভারত রাষ্ট্র ভারতে প্রচলিত সকল ধর্মের প্রতিই সমানভাবে নিরপেক্ষ। ভারতের সংবিধানে রাষ্ট্রের এই ধর্ম-নিরপেক্ষতা নানাভাবে সংরক্ষিত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

প্রথমতঃ, ভারতে ইংলণ্ডের মত রাষ্ট্রের কোন সরকারী ধর্ম নাই বা রাষ্ট্র কোন বিশেষ ধর্মমতের সমর্থন বা পৃষ্ঠপোষকতা করে না। দ্বিতীয়তঃ, পাকিস্তানের ন্যায় ভারত কোন ধর্মীয় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। বিশেষ কোন ধর্মমত অনুসরণকারীদের জন্য ভারতে কোন বিশেষ ব্যবস্থা নাই। ধর্মমত নির্বিশেষে ভারত সকল নাগরিককে সমান সুযোগ-সুবিধা দান করে।

রাষ্ট্রের শান্তি-শৃঙ্খলা বা জনস্বার্থ ও সাধারণ ও নীতিজ্ঞানের বিরোধী না হইলে প্রত্যেক ব্যক্তি স্বাধীনভাবে তাহার ধর্মাচরণ করিতে পারে এবং ধর্মমত প্রচার করিতে পারে। সরকারী সাহায্যে সম্পূর্ণভাবে পরিচালিত কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে কোন ধর্মসম্বন্ধীয় শিক্ষাদান করা চলিবে না। সরকারের বিনা অনুমতিতে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত অথবা সাহায্য-প্রাপ্ত কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ধর্মশিক্ষা ব্যাপারে যোগদান করিতে কাহাকেও বাধ্য করা যাইবে না।

৫। শিক্ষা ও সংস্কৃতিগত অধিকার (Cultural and Fducational Rights)

নূতন সংবিধান ভারতের যে-কোন স্থানে বসবাসকারী নাগরিকগণের বিভিন্ন অংশগুলির উপর তাহাদের নিজস্ব ভাষা, লিপি ও সংস্কৃতি সংরক্ষণ করিবার অধিকার প্রদান করিয়াছে। সরকার কর্তৃক পরিচালিত অথবা সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত সমুদয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সকল সম্প্রদায়ের সমান

প্রবেশাধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলি তাহাদের ইচ্ছামত বিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালনা করিতে পারিবে। ধর্ম ও ভাষা-নিরপেক্ষভাবে এই বিদ্যালয়গুলি সরকারী সাহায্য পাইবে।

৬। সম্পত্তির অধিকার (Right to Property)

আইনের অনুমোদন ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে তাহার সম্পত্তির অধিকার হইতে বঞ্চিত করা চলিবে না। ক্ষতিপূরণ প্রদান না করিয়া জনসাধারণের স্বার্থে কোন স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তি, শিল্প বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গ্রহণ করা চলিবে না এবং ক্ষতিপূরণের পরিমাণ বা নীতি আইন দ্বারা নির্ধারিত করিতে হইবে। রাজ্য আইনসভা কর্তৃক গৃহীত এই প্রকারের আইন রাষ্ট্রপতির দ্বারা অনুমোদিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হইবার পূর্বে উত্থাপিত এই জাতীয় কোন প্রস্তাব যদি পরে আইনসভা কর্তৃক আইনরূপে গৃহীত হয় ও রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লাভ করে, তাহা হইলে সে আইন উপরি-উক্ত আইনের ব্যতিক্রম হইলেও কার্যকরী থাকিবে। কিন্তু করধার্য বা অর্থদণ্ডের উদ্দেশ্যে, অথবা জনস্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে কিংবা জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা রক্ষাকল্পে, অথবা আশ্রয়প্রার্থীর সম্পত্তি গ্রহণসম্বন্ধে গৃহীত আইনে ক্ষতিপূরণধারা প্রযোজ্য হইবে না।

সংবিধানের উপরি উক্ত ধারাগুলি দেখিলে স্বভাবতই মনে হয় যে, ভারতের শাসনতন্ত্র নাগরিক অধিকার অপেক্ষা সম্পত্তির অধিকারের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি সংরক্ষণের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিবার ফলে ভূমিসংস্কারমূলক আইনগ্রহণে সরকারকে কতকগুলি বাধার সম্মুখীন হইতে হয়। এই বাধাগুলি দূর করিবার উদ্দেশ্যে ১৯৫১ সালে সংবিধানের কতকগুলি ধারার সংশোধন করিতে হয়। সংশোধিত আইনের বলে জনস্বার্থের উন্নতিকল্পে রাষ্ট্রের উপর ব্যক্তিগত সম্পত্তি, শিল্প ও ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান দখল বা পরিচালনা করিবার ব্যাপক ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে।

৭। শাসনতান্ত্রিক উপায়ে প্রতিকারের অধিকার (Right to Constitutional Remedies)

শাসনতন্ত্রে বিধিবদ্ধ থাকিলেই নাগরিক অধিকারগুলি সুরক্ষিত হইতে পারে না। অধিকারগুলি কোনমতে ব্যাহত হইলে তাহার প্রতিকারের উপায়

থাকা একান্ত আবশ্যক। ভারতের সংবিধানে উল্লিখিত মৌলিক অধিকারগুলি সংরক্ষণের জন্য নাগরিকগণ সুপ্রিম কোর্ট বা উচ্চ বিচারালয় বা পার্লামেণ্ট কর্তৃক অর্পিত ক্ষমতাসম্পন্ন অন্য কোন বিচারালয়ে বিচারপ্রার্থী হইতে পারে এবং বিচারালয়গুলি মৌলিক অধিকার রক্ষা করিবার জন্য হেবিয়াস কর্পাস, ম্যান্‌ডামাস্‌, প্রহিবিশন, কো-ওয়ারেনটো এবং সার্টিওরারি ধরণের আদেশ বা নির্দেশ জারী করিতে পারে। কিন্তু এই সম্পর্কে একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, নাগরিকগণের অধিকারগুলি রক্ষা করিবার শাসনতান্ত্রিক উপায় রাষ্ট্রপতির বিশেষ ক্ষমতা দ্বারা সংকুচিত করা হইয়াছে। জরুরী অবস্থায় রাষ্ট্রপতির উপর সংবিধান যে ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছে তাহার বলে তিনি নাগরিকগণের অধিকার রক্ষার জন্য কোন বিচারালয়ে আবেদন করিবার অধিকার স্থগিত রাখিতে পারেন। কিন্তু সশস্ত্র বাহিনীর জন্য পার্লামেণ্ট সভা এই আইনের পরিবর্তন সাধন করিতে পারে।

সুপ্রিম কোর্ট বা উচ্চ বিচারালয়গুলি নাগরিকগণের মৌলিক অধিকার রক্ষাকল্পে যে সমস্ত আদেশ বা নির্দেশ জারী করিতে পারে, তাহার ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন।

১। **হেবিয়াস্‌ কর্পাস্‌ (Habeas Corpus)**—সশরীরে কোন ব্যক্তিকে আদালতে হাজির করিবার জন্য আদেশ দেওয়াকে হেবিয়াস্‌ কর্পাস্‌ বলা হয়। কোন ব্যক্তি যদি বন্দী বা আটক হয় তাহা হইলে বন্দী ব্যক্তির আবেদনক্রমে সুপ্রিম কোর্ট বা উচ্চ আদালত আটককারী ব্যক্তির উপর এই আদেশ জারী করিয়া বন্দী ব্যক্তিকে আদালতে হাজির করিবার নির্দেশ দিতে পারে। আদালত বিচার করিয়া দেখিবে যে, আটক ব্যক্তি আটককারী কর্তৃক আইনানুমোদিত রূপে বন্দী হইয়াছে কিনা। আদালতের মতে বন্দী ব্যক্তিকে যদি আইনানুসারে আটক করা না হইয়া থাকে তাহা হইলে আদালত বন্দী ব্যক্তিকে মুক্তি দান করিতে পারে অথবা সত্বর তাহার বিচারের ব্যবস্থা করিতে পারে। এইরূপ আদেশ জারী করিয়া আদালতগুলি ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষা করে।

২। **ম্যান্‌ডামাস্‌ (Mandamas)**—ইহাও সুপ্রীম কোর্ট বা উচ্চ বিচারালয়গুলি কর্তৃক প্রদত্ত একজাতীয় আদেশ। এই আদেশের বলে বিচারালয়গুলি কোন সরকারী কর্মচারী, কোন প্রতিষ্ঠান বা কোন নিম্ন

আদালতকে সাধারণ স্বার্থ সম্পর্কে তাহার কর্তব্য সম্পাদন করিবার জন্য আদেশ দিতে পারে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, এইরূপ আদেশ জারী করা বিচারালয়গুলির অধিকারভুক্ত নহে। বিচারালয়গুলি তাহাদের বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া প্রয়োজনমত এইরূপ আদেশ জারী করে।

৩। **প্রহিবিশ্নন (Prohibition)**—এই জাতীয় আদেশ উচ্চতর বিচারালয়গুলি কর্তৃক নিম্নতর বিচারালয়গুলি উপর জারী করা হয়। এই আদেশ জারী করিবার উদ্দেশ্য হইল যাহাতে নিম্ন আদালতগুলি তাহাদের ক্ষমতা-বহির্ভূত বা বে-আইনী কোন কাজ করিতে না পারে। পৌর প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি জনসাধারণ সম্পর্কিত সংস্থাগুলি যখন বিচার-ব্যবস্থার অনুরূপভাবে কোন কাজ করে, তখন এই সংস্থাগুলির উপরেও এই আদেশ জারী হইতে পারে।

৪। **সার্টিওরারি (Certiorari)**—এই আদেশ দুইটি উদ্দেশ্যে স্থাপ্রম কোর্ট বা উচ্চ বিচারালয় কর্তৃক প্রবর্ৎ হইতে পারে। উচ্চ বিচারালয় কোন মামলার নিরপেক্ষ বিচার করিবার জন্য অথবা নিম্ন আদালতের ক্ষমতা-বহির্ভূত কাজে বাধা দিবার জন্য নিম্ন আদালতকে নির্দেশ দিতে পারে যে, মামলাটির শুনানীর জন্য উচ্চ আদালতে প্রেরণ করা হউক। এরূপ আদেশ পৌর প্রতিষ্ঠান-গুলির বিরুদ্ধেও জারী হইতে পারে।

৫। **কো-ওয়ারেন্টো (Quo-Warranto)**—কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কি ক্ষমতার বলে কোন বিশেষ কার্য সম্পাদন করিতেছে তাহার কারণ দর্শাইতে বলিয়া কোন বিচারালয় যে আদেশ জারী করে তাহাকে কো-ওয়ারেন্টো বলা হয়। এই আদেশ অনেকটা বিচারালয় কর্তৃক প্রদত্ত নিষেধাজ্ঞা-পত্রের (Injunction) অনুরূপ।

মৌলিক অধিকারগুলির বৈশিষ্ট্য (Features of the Fundamental Rights)

ভারতের শাসনতন্ত্রে বর্ণিত মৌলিক অধিকারগুলি পর্যালোচনা করিলে ইহাদের কতিপয় বৈশিষ্ট্য দেখা যায়।

প্রথমতঃ, এই অধিকারগুলির কোনটিই অবাধ বা শর্তশূন্য নহে। অধিকারগুলি কেবলমাত্র রাষ্ট্র-নির্ধারিত অবস্থায় ভোগ করা যাইতে পারে।

আবার এই অধিকারগুলি কতিপয় যুক্তিসম্মত বাধা দ্বারা সীমায়িত এবং এই বাধাগুলির যুক্তিযুক্ততা একমাত্র বিচারালয় কর্তৃক স্থিরীকৃত হইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, একমাত্র ভারতীয় নাগরিকগণই এই অধিকারগুলি ভোগ করিতে পারিবে। বিদেশীরা শুধু তাহাদের জীবন ও স্বাধীনতা রক্ষার অধিকার পাইবে।

তৃতীয়তঃ, এই অধিকারগুলি সাময়িকভাবে সংকুচিত অথবা অব্যবহার্য করা যাইতে পারে। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জরুরী অবস্থা ঘোষণাকালে জরুরী অবস্থা থাকাকালে এই অধিকারগুলির প্রয়োগ বলবৎ হইবে না। মার্কিন শাসনতন্ত্রে নাগরিক অধিকার সংকুচিত করিবার এরূপ কোন বিশেষ ব্যবস্থা স্থান পায় নাই।

চতুর্থতঃ, এই মৌলিক অধিকারগুলি ভারতের আইনসভা, শাসনকর্তৃপক্ষ ও কতিপয় ক্ষেত্রে বিচার বিভাগের কাজের বাধাস্বরূপ কাজ করে। কোন মৌলিক অধিকারের সহিত যদি আইনসভা-প্রণীত কোন আইনের বা শাসন-কর্তৃপক্ষের কোন নির্দেশের বিরোধ ঘটে তাহা হইলে সুপ্রিম কোর্ট এরূপ আইন বা নির্দেশ অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করিতে পারে।

সমালোচনা (Criticism)

শাসনতন্ত্রের বিধিবদ্ধ মৌলিক অধিকারগুলি পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, নাগরিক অধিকারগুলি সংরক্ষণের জন্য শাসনতন্ত্রে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে এবং প্রয়োজনক্ষেত্রে অধিকারগুলিকে বলবৎ করিবার জন্য সুপ্রীম কোর্ট বা উচ্চ বিচারালয়ে আবেদন করিবার ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত অতীত বা ভবিষ্যৎ কোন আইন যদি মৌলিক অধিকারগুলির পরিপন্থী হয়, তাহা হইলেও সেই আইনগুলি অসিদ্ধ বলিয়া স্বীকৃত হইবে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও অনেক সমালোচক বলেন যে, ভারতের শাসনতন্ত্রে উল্লিখিত মৌলিক অধিকারগুলি এরূপ সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে বিধিবদ্ধ হইয়াছে এবং রাষ্ট্রপতির বিশেষ ক্ষমতা দ্বারা এরূপভাবে সংকুচিত করা হইয়াছে যে, জনসাধারণ এই অধিকারগুলি ভোগ করিবার সুযোগ খুব কমই পাইবে। অধিকারগুলিকে যে সমস্ত বিধি-নিষেধ দ্বারা সংকুচিত করা হইয়াছে, সেগুলি পর্যালোচনা করিলে মনে হয় যে, কর্তৃপক্ষ জনসাধারণের সদিচ্ছা ও সহযোগিতার উপর বিশেষ আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই। সেইজন্য অন্যান্য দেশের

মৌলিক অধিকারগুলির অনুরূপ কতকগুলি অধিকার প্রদান করিয়া সেই অধিকারগুলি যাহাতে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত না হয়, সেইজন্য এরূপ চরম প্রতিকার-ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। সুতরাং দেখা যায় যে, ভারতের সংবিধান এক হস্তে নাগরিকগণকে যে সমুদয় মৌলিক অধিকার দিয়াছে, অপর হস্ত দ্বারা নাগরিকগণকে সেই অধিকারগুলি হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে। ভারতের সংবিধানে আরও কতকগুলি মৌলিক অধিকারের উল্লেখ থাকা উচিত ছিল। কিন্তু সেগুলি মৌলিক অধিকারের পর্যায়ভুক্ত না করিয়া রাষ্ট্রপরিচালনা ক্ষেত্রে কতকগুলি আদর্শ হিসাবে উপস্থাপিত করা হইয়াছে। এই আদর্শগুলি রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতি নামে সংবিধানে স্থান পাইয়াছে।

সংক্ষিপ্তসার

ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইলেও সমগ্র ভারতে মাত্র একদফা নাগরিক অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। ভারতের নাগরিক শুধুমাত্র ভারতীয় নাগরিক বলিয়া পরিচিত।

শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হইবার সময়ে বিভিন্ন প্রকার অধিবাসীর উপর নাগরিক অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে। ভারতের পার্লামেণ্ট নাগরিক অধিকার-সম্পর্কে যে-কোনরূপ পরিবর্তন আনয়ন করিতে ও নূতন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে। ভারত বিভাগের ফলে যে আশ্রয়প্রার্থীর সমাগম হইয়াছে, তাহাদের নাগরিক অধিকার দিবার জন্য নাগরিক অধিকার অত্যন্ত সহজলভ্য করা হইয়াছে।

ভারতীয় নাগরিক বলিয়া পরিগণিত হইতে হইলে যে-কোন ব্যক্তির পক্ষে নিম্নলিখিত সর্তগুলির যে কোন একটি পূরণ করিতে হইবে :—

১। যে-কোন ব্যক্তি ভারতের অধিবাসী হইলে এবং সে এখানে জন্মগ্রহণ করিলে অথবা তাহার পিতামাতা এখানে জন্মগ্রহণ করিলে, অথবা এই দেশে অন্ততঃ ৫ বৎসরাধিক কাল বসবাস করিলে সে ভারতীয় নাগরিক বলিয়া পরিগণিত হইবে।

২। (ক) যদি কোন ব্যক্তির মাতাপিতা বা পিতামহ-পিতামহী অবিভক্ত ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন এবং এইরূপ ব্যক্তি যদি ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে জুলাইয়ের পূর্বে পাকিস্তান হইতে দেশত্যাগ করিয়া ভারতে বসবাস করিতে থাকে,

(খ) এরূপ ব্যক্তি যদি উল্লিখিত তারিখের পরবর্তী কালে ভারতে আসিয়া নাগরিক অধিকার অর্জন করিবার জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা রেজেষ্ট্রীভুক্ত হয় এবং রেজিস্ট্রেশন দরখাস্ত করিবার পূর্বে কমপক্ষে ছয়মাস ভারতে বসবাস করে তাহা হইলে সে ভারতীয় নাগরিক হইবে।

৩। যে সমস্ত ব্যক্তি ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১লা মার্চের পর ভারত হইতে পাকিস্তানে চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু পরবর্তী কালে ভারতের ছাড়পত্র লইয়া স্থায়ি-ভাবে বসবাস করিবার জন্য ভারতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে, তাহারাও উপরি-উক্ত ২ (খ) সূত্রানুযায়ী আবেদন করিয়া ভারতীয় নাগরিক হইতে পারে।

ভারতে জন্ম অথবা ভারতীয় পিতামাতার সন্তান প্রবাসী হইলেও ভারতীয় নাগরিকত্ব অর্জন করিতে পারে। যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ভারতীয় নাগরিকত্ব বর্জন করিয়া ভিন্ন দেশের নাগরিকত্ব অর্জন করিয়াছে, সে কখনও ভারতীয় নাগরিক বলিয়া পরিগণিত হইবে না। ভারতীয় নাগরিক অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তি তাহার খুশীমত নাগরিকত্ব অস্বীকার করিতে পারিবে না।

১৯৫৫ সালে ভারতের পার্লামেণ্ট সভা নাগরিকত্ব আইন পাস করে। এই আইন অনুসারে পাঁচটি বিভিন্ন পদ্ধতিতে ভারতের নাগরিক হওয়া যায়; যথা, ১। জন্ম, ২। বংশ, ৩। অর্জন, ৪। রেজেস্ট্রিকরণ ও ৫। রাষ্ট্র-ভুক্তি। এই আইনে আরও বলা হইয়াছে যে, ভারতীয় নাগরিক কমনওয়েলথভুক্ত রাষ্ট্রগুলিতে এ বিষয়ে যে সুবিধা পাইবে, ভারতও ঐ সব দেশের নাগরিকগণকে অনুরূপ সুবিধা দিবে।

নাগরিকগণের মৌলিক অধিকার

মানুষের এমন কতকগুলি প্রাথমিক অধিকার আছে, যেগুলি ব্যক্তিত্ব বিকাশের অপরিহার্য অবস্থা বলিয়া সবদেশে স্বীকৃত হয়। এই অধিকারগুলিকে বিশেষ গুরুত্ব দিবার উদ্দেশ্যে অন্যান্য অধিকার হইতে পৃথক করিয়া শাসনতন্ত্রে স্থান দেওয়া হয়। এইজন্য এই অধিকারগুলিকে মৌলিক অধিকার বলা হয়। জীবনের অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার, সম্পত্তির অধিকার প্রভৃতি এই মৌলিক অধিকার পর্যায়ভুক্ত।

স্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্রে ভারতের নাগরিকগণের এইরূপ সাতটি মৌলিক অধিকার স্থান পাইয়াছে।

১। সাম্যের অধিকার—

জাতি, ধর্ম, সম্প্রদায়, স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে রাষ্ট্র সকল নাগরিকের প্রতি সমান ব্যবহার করিবে। রাষ্ট্র জাতি বা ধর্মের ভিত্তিতে নাগরিকগণের মধ্যে বৈষম্যমূলক ব্যবহার করিবে না। আইনের চক্ষে সকল নাগরিকই সমান এবং কার্যের উপযুক্ত বিবেচিত হইলে সব নাগরিকেরই সরকারী কাজে নিযুক্ত হইবার সমান অধিকার থাকিবে। যে কোন আকারে অস্পৃশ্যতা নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। কেবলমাত্র সামরিক ও শিক্ষা-সংক্রান্ত উপাধি ব্যতীত অন্য কোনরূপ উপাধি প্রদান করা হইবে না। তবে ভারত সরকার বর্তমানে 'ভারত রত্ন', 'পদ্ম বিভূষণ', 'পদ্মশ্রী' প্রভৃতি উপাধি বিতরণ করিতেছেন। সমাজব্যবস্থায় সাম্য প্রতিষ্ঠিত না হইলে প্রকৃত গণতন্ত্র সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে না। প্রকৃত সাম্য প্রতিষ্ঠাকল্পে উপাধি প্রদান প্রথা রহিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

২। স্বাধীনতার অধিকার—

ভারতের সকল নাগরিকেরই বাক্-স্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকিবে। ইহা ছাড়া সকল নাগরিকই নিরস্ত্রভাবে শান্তিপূর্ণ সমাবেশ, সংঘ প্রভৃতি গঠন করিতে পারিবে। ভারতে যে কোন অংশে স্বাধীনভাবে ভ্রমণ, বসবাস, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়, যে কোন বৃত্তি গ্রহণ বা ব্যবসায় করিবার স্বাধীনতা প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে। সরকার যদি কোন ব্যক্তিকে আটক করে তাহা হইলে তাহাকে যথাসম্ভব শীঘ্র আটক করিবার কারণ জানাইতে হইবে এবং ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাহাকে কোন ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট উপস্থিত করিতে হইবে। বন্দী ব্যক্তি যদি মনে করে যে, তাহাকে অন্যায়ভাবে আটক করা হইয়াছে তাহা হইলে তাহাকে আদালতে উপস্থিত করিবার জন্য হেবিয়াস্ কর্পাস্ রিট্ জারি করিবার জন্য সে আবেদন করিতে পারিবে। এই অবস্থায় আদালত যদি আটক ব্যক্তির নির্দোষিতা সম্পর্কে বিশ্বাসী হয়, তাহা হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তির মুক্তির আদেশ দিতে পারে।

৩। শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার—

দাস ব্যবসায়, বেগার খাটান ও অনুরূপভাবে বলপূর্বক শ্রম আদায় করা নিষিদ্ধ হইয়াছে। ১৪ বৎসরের কম বয়স্ক শিশুদের খনি, কারখানা বা অন্য কোন বিপজ্জনক কার্যে নিযুক্ত করা যাইবে না।

৪। ধর্মাচরণের অধিকার—

নূতন শাসনতন্ত্র অনুসারে ভারতকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলিয়া ঘোষণা

করা হইয়াছে। এইজন্য সকল নাগরিকেরই ধর্মাচরণের স্বাধীনতা থাকিবে। রাষ্ট্রের শান্তি-শৃংখলা বা জনস্বার্থ ও সাধারণ নীতিজ্ঞানের বিরোধী না হইলে প্রত্যেক ব্যক্তি স্বাধীনভাবে তাহার ধর্মাচরণ করিতে পারিবে। সরকারের সহিত সম্পর্কিত কোন বিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষা ব্যাপারে কাহাকেও যোগদান করিতে বাধ্য করা যাইবে না।

৫। শিক্ষা ও সংস্কৃতিগত অধিকার—

ভারতের বিভিন্ন নাগরিকগণের উপর তাহাদের নিজস্ব ভাষা, লিপি ও সংস্কৃতি সংরক্ষণ করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। সরকার-পরিচালিত বা সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহে সকল সম্প্রদায়ের সমান প্রবেশাধিকার স্বীকৃত হইয়াছে।

৬। সম্পত্তি রক্ষার অধিকার—

আইনের অনুমোদন ব্যতীত বা ক্ষতিপূরণ প্রদান না করিয়া কাহারও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা চলিবে না বা জনসাধারণের স্বার্থে কোন সম্পত্তি, শিল্প-ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গ্রহণ করা চলিবে না। ১৯৫১ সালে এই অধিকার সম্পর্কে কিছু পরিবর্তন করা হইয়াছে। ১৯৫১ সালের সংশোধনী আইনের ফলে জনস্বার্থের উন্নতিকল্পে রাষ্ট্রের উপর ব্যক্তিগত সম্পত্তি, শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান দখল বা পরিচালনা করিবার ব্যাপক ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে।

৭। শাসনতান্ত্রিক উপায়ে প্রতিকারের অধিকার—

ভারতের সংবিধানে উল্লিখিত মৌলিক অধিকারগুলি রক্ষার জন্য নাগরিকগণ সুপ্রিম কোর্ট বা উচ্চ বিচারালয়ে বিচার প্রার্থী হইতে পারে এবং বিচারালয়গুলি মৌলিক অধিকারগুলি রক্ষার জন্য নানা ধরণের আদেশ বা নির্দেশ জারী করিতে পারে।

এস্থলে একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হইলে সেই ঘোষণাকাল বলবৎ থাকাকালে রাষ্ট্রপতি নাগরিকগণের সুপ্রিম কোর্টে মৌলিক অধিকার রক্ষার আবেদন স্থগিত রাখিবার আদেশ দিতে পারেন। সুতরাং জরুরী অবস্থার ঘোষণাকালে শাসনকর্তৃপক্ষ এই মৌলিক অধিকারগুলি হরণ করিতে পারে। এই ব্যবস্থার দ্বারা বুঝা যায় যে, ভারতের শাসনতন্ত্র এক হস্তে যে মৌলিক অধিকারগুলি নাগরিকগণকে দিয়াছে, অপর হস্ত দিয়া নাগরিকগণকে সে অধিকারগুলি হইতে বঞ্চিত করিতে পারে।

প্রশ্নাবলী

1. Discuss fully (a) right to equality and (b) personal liberty under the Constitution of India. Point out the constitutional remedies against the violation of the above rights.

2. Explain fully the fundamental right as regards protection against arrest and detention under the Constitution of India. Is this right an unrestricted one ?

3. What are the Constitutional remedies for enforcement of the fundamental rights guaranteed by the Constitution of India ? When can these fundamental rights be suspended ?

4. Examine the view that the Fundamental Rights provided in the Indian Constitution are neither absolute nor adequate.

(North Bengal, Hons. 1966)

5. Explain fully the right to freedom of religion under the Constitution of India.

6. Discuss the provisions of the Constitution of India regarding citizenship.

ষষ্ঠ অধ্যায়

রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতি

(Directive Principles of State Policy)

নির্দেশাত্মক নীতি (Directive Principles)

স্বাধীন আয়ারল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্রের অনুকরণে ভারতের সংবিধানেও কতকগুলি রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি সংযোজিত হইয়াছে। ভারতের শাসনতন্ত্রের প্রস্তাবনায় রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য বর্ণনাপ্রসঙ্গে ভারতকে একটি জনকল্যাণকর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। এই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হইল গণতান্ত্রিক উপায়ে জনসাধারণের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল সাধন করা। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার পক্ষে রাজনৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। পূর্ণ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে এই গণতান্ত্রিক আদর্শ বলবৎ করা একান্ত আবশ্যক। এই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া শাসনতন্ত্রের রচয়িতাগণ শাসনতন্ত্রে কতকগুলি নির্দেশাত্মক নীতি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং শাসকবর্গ যাহাতে উক্ত নীতি অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করেন তাহার জন্যও যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। শাসনতন্ত্রে লিপিবদ্ধ মৌলিক অধিকার ও নির্দেশাত্মক নীতিগুলির মধ্যে প্রধান পার্থক্য হইল যে, কোন নির্দেশাত্মক নীতি সরকারী হস্তক্ষেপের ফলে ক্ষুণ্ণ হইলে বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত দ্বারা তাহার প্রতিবিধানের কোন সুযোগ নাগরিকগণকে দেওয়া হয় নাই। সুতরাং নির্দেশাত্মক নীতি অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করা বা না করা সম্পূর্ণরূপে শাসনকর্তৃপক্ষের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। এস্থলে আর একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কোন নির্দেশাত্মক নীতি বলবৎ করিতে গিয়া যদি কোন মৌলিক অধিকারের সহিত সংঘর্ষ বাধে তাহা হইলে নির্দেশাত্মক নীতি কার্যক্ষেত্রে আর প্রযুক্ত হইতে পারিবে না। এরূপক্ষেত্রে মৌলিক অধিকারগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইয়াছে।

শাসনতন্ত্রে বর্ণিত নীতিগুলিকে তিনটি পৃথক পর্যায়ে ভাগ করা যাইতে পারে।

প্রথমতঃ, কতকগুলি অর্থনৈতিক আদর্শ এই নীতিগুলির অন্তর্ভুক্ত

করা হইয়াছে এবং রাষ্ট্রের কর্তব্য হইবে এই নীতিগুলিকে কার্যকরী করিবার জন্য সচেষ্ট হওয়া।

দ্বিতীয়তঃ, শাসন বিভাগ ও আইন-প্রণয়ন বিভাগের ক্ষমতা পরিচালনা করিবার জন্য কতকগুলি নির্দেশ ও উপদেশ এই নীতিগুলির মধ্যে স্থান পাইয়াছে।

তৃতীয়তঃ, কতকগুলি নাগরিক অধিকার এই নীতিগুলির অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। এই অধিকারগুলি মৌলিক অধিকারগুলির মত আদালত কর্তৃক বলবৎ করা না গেলেও রাষ্ট্রের প্রতি নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, রাষ্ট্র এরূপভাবে ইহার শাসন-সংক্রান্ত ও আইন-প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্য পরিচালনা করিবে যাহাতে নাগরিকগণের পক্ষে এই অধিকারগুলি ভোগ করা সম্ভব হয়।

শাসনতন্ত্রে বর্ণিত নীতিগুলির সারমর্ম নিম্নে দেওয়া হইল।

মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবন যাহাতে ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, এরূপ জনকল্যাণকর একটি সমাজব্যবস্থা গঠন করিবার জন্য রাষ্ট্র সচেষ্ট থাকিবে। সমস্ত নাগরিকের জীবিকা অর্জনের উপযুক্ত ব্যবস্থা, জনসাধারণের স্বার্থে সম্পদের অধিকার নিয়ন্ত্রণ, সমান কার্যের জন্য স্ত্রী পুরুষ-নির্বিশেষে সমান পারিশ্রমিক প্রদান, শ্রমিক শ্রেণীর নিরাপত্তা রক্ষা, শিশু ও যুবকদের শোষণ ও অত্যাচারের হাত হইতে রক্ষা, সকল নাগরিকেরই কর্ম ও শিক্ষার ব্যবস্থা, বেকার অবস্থায়, বার্ধক্যে, অসুস্থতায় ও অক্ষমতার ক্ষেত্রে সাহায্য করা প্রভৃতি শাসনকর্তৃপক্ষের কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

চৌদ্দ বৎসরের অনধিক বালকবালিকাদের জন্য অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাব্যবস্থা, অনগ্রসর সম্প্রদায়গুলির অর্থনৈতিক ও শিক্ষাবিষয়ক উন্নতিসাধন, মাতৃমঙ্গল, জনস্বাস্থ্যের উন্নতি ও এই উদ্দেশ্যে মাদক দ্রব্যের ব্যবহার-বর্জন, কৃষির উন্নতি, পশুপালন, বিশেষতঃ উত্তম পশুপ্রজনন, গো-হত্যা-নিবারণ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ ব্যবস্থা সংগঠন প্রভৃতি কার্য নির্দেশাত্মক নীতিগুলির অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত আরও তিনটি বিষয় সম্পর্কে নির্দেশাত্মক নীতি শাসনতন্ত্রে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। প্রথমটি হইল পার্লামেণ্ট সভা কর্তৃক ঘোষিত জাতীয় গুরুত্বসম্পন্ন ঐতিহাসিক নিদর্শন, স্থান ও বস্তুসমূহ রক্ষা করা রাষ্ট্রের একটা দায়িত্ব বলিয়া বিবেচিত হইবে। দ্বিতীয়তঃ, শাসনবিভাগ হইতে বিচার-বিভাগের সম্পূর্ণ পৃথকীকরণ সম্পর্কেও রাষ্ট্রের কর্তব্য নির্ধারিত করা হইয়াছে।

তৃতীয়তঃ, দেশের আভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করা ব্যতীতও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারত রাষ্ট্রের এক গুরু দায়িত্ব রহিয়াছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নীতি-সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা, এবং পররাষ্ট্রের সহিত ন্যায়সঙ্গত ও সম্মানজনক সম্পর্ক বজায় রাখা, আন্তর্জাতিক আইন, সন্ধি প্রভৃতির প্রতি সম্মানপ্রদর্শন এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে সহযোগিতার মনোভাব লইয়া বিরোধসমূহের মীমাংসা করিতে রাষ্ট্র সচেষ্ট থাকিবে।

সমালোচনা (Criticism)

নির্দেশাত্মক নীতিগুলি সম্পর্কে বলা যায় যে, এই নীতিগুলি যখন বিচারালয় কর্তৃক বলবৎ করা যায় না তখন শাসনতন্ত্রে এগুলির উল্লেখ নিরর্থক হইয়াছে। অনেক সমালোচক বলিয়াছেন যে, অজ্ঞ সরল ভারতীয়গণকে বাক্যের দ্বারা সন্তুষ্ট রাখিবার উদ্দেশ্যেই এই নিরর্থক আদর্শের অবতারণা করা হইয়াছে। নির্দেশাত্মক নীতিগুলি হইল জনসাধারণের নিকট সরকারের কতকগুলি নৈতিক প্রতিশ্রুতি। কিন্তু যে প্রতিশ্রুতি পালন করিবার কোন আইনসম্মত বাধ্য-বাধকতা নাই, সে প্রতিশ্রুতির কোন মূল্যও থাকিতে পারে না, এবং সে প্রতিশ্রুতি যতই শ্রুতিমধুর হউক না কেন কাহাকেও সন্তুষ্ট করিতে পারে না। নির্দেশাত্মক নীতিগুলি সম্পর্কে আরও বলা যাইতে পারে যে, এই নির্দেশ কে কাহাকে দিতেছে। ভারতে শাসনক্ষমতার একমাত্র উৎস হইল—ভারতের জনগণ। সুতরাং জনগণ তাহাদের নিজেদের উদ্দেশ্যে এই নীতিগুলি প্রচার করিতে পারে না।

নির্দেশাত্মক নীতিগুলির তাৎপর্য (Significance of the Directives)

নির্দেশাত্মক নীতিগুলি সম্পর্কে শেষ বিশ্লেষণে বলা যায় যে, প্রস্তাবনায় উল্লিখিত আদর্শগুলির পুনরাবৃত্তি করা হইয়াছে। কিন্তু একটু প্রণিধানপূর্বক দেখিলেই এই নীতিগুলির তাৎপর্য দেখা যায়। প্রথমতঃ, গণতন্ত্র হইল দলীয় শাসন। কোন সময় দক্ষিণপন্থী, কোন সময় বামপন্থী, আবার কোন সময় বা মধ্যপন্থী দল শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইতে পারে। যে দলই ক্ষমতাসীন হউক না কেন, এই নীতিগুলির সামাজিক, অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক উদ্দেশ্যগুলিকে একেবারে অবজ্ঞা করিতে পারিবে না।

দ্বিতীয়তঃ, এই নীতিগুলির পশ্চাতে আইনসম্মত কোন সমর্থন না থাকিলেও ইহার একটি রাজনৈতিক ও নৈতিক সমর্থন আছে। নির্বাচন কালে ভোটদাতার নিকট এই নীতিগুলি অবহেলা করিবার জন্য ভোটপ্রার্থী দায়ী হইবে।

তৃতীয়তঃ, ভারতের শাসনতন্ত্রে নাগরিকগণের কোন অর্থনৈতিক অধিকার স্বীকৃত হয় নাই। কিন্তু নির্দেশাত্মক নীতিগুলির অন্তর্ভুক্ত কতিপয় নীতি এই অর্থনৈতিক অধিকারের স্থান পূরণ করিয়া ধনী ও দরিদ্রকে সমপর্যায়ভুক্ত করিবার প্রয়াস পাইয়াছে।

পরিশেষে বলা যায় যে, এই নীতিগুলিই হইল শাসন পরিচালনার মূলনীতি। এই আদর্শগুলি শাসনকার্যে ও আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে বলবৎ হইলে দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির পথ যে অনেক পরিমাণে সুগম হইবে এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না। জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের ভিত্তি হইল পূর্ণ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা, যে শাসনব্যবস্থা নাগরিকগণের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও সাম্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া মৈত্রীভাব আনয়ন করিতে পারে। প্রকৃত গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাকল্পে ভারতের সংবিধানে এই নীতিগুলি স্থান পাইয়াছে। এই নীতিগুলি এখনও পর্যন্ত শাসনক্ষেত্রের সর্বত্র সম্পূর্ণভাবে প্রযুক্ত না হইলেও বলা যাইতে পারে যে, অনেকক্ষেত্রে শাসন কর্তৃপক্ষ এই নীতি কার্যক্ষেত্রে বলবৎ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন।

মৌলিক অধিকার ও নির্দেশাত্মক নীতি (Fundamental Rights and the Directives)

নির্দেশাত্মক নীতিগুলির সহিত মৌলিক অধিকারসমূহের মূলগত পার্থক্য দেখা যায়। উভয়ের প্রকৃতি, বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্য বিভিন্ন।

প্রথমতঃ, নির্দেশাত্মক নীতিগুলি এরূপ কতিপয় বিষয়ের উল্লেখ করে যাহা রাষ্ট্র সর্বদা কার্যে রূপায়িত করিবার প্রয়াস পাইবে, অপরপক্ষে মৌলিক অধিকারের উল্লেখ দ্বারা রাষ্ট্রকে নির্দিষ্ট কতিপয় কার্য করিতে বিরত থাকিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং মৌলিক অধিকারগুলি হইল রাষ্ট্রের অবাধ ক্ষমতার বাধাস্বরূপ, আর নির্দেশাত্মক নীতিগুলি দ্বারা রাষ্ট্র সরকারকে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের উপায়স্বরূপ ইহার নীতি ও কার্য পরিচালনার জন্য নির্দেশ দান করিতেছে।

দ্বিতীয়তঃ, কিন্তু এই নীতিগুলির ত্রুটি হইল যে, মৌলিক অধিকারগুলির মত ইহারা এককভাবে কার্যকরী নহে। এই নীতিগুলির বলে কোন প্রচলিত আইন বা আইনসম্মত অধিকার ক্ষুণ্ণ করা যায় না। এই নীতিগুলি কার্যক্ষেত্রে বলবৎ করিতে হইলে এ সম্পর্কে উপযুক্ত আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন হয়।

তৃতীয়তঃ, নির্দেশাত্মক নীতিগুলি আদালত কর্তৃক বলবৎ করা যায় না, কিন্তু মৌলিক অধিকারগুলি আদালত কর্তৃক যথোপযুক্ত নির্দেশ দ্বারা বলবৎ করা যায়। সুতরাং মৌলিক অধিকারগুলির তুলনায় নির্দেশাত্মক নীতিগুলি শুধু মর্যাদাহীন নহে, এগুলি ফলপ্রসূও নহে।

চতুর্থতঃ, মৌলিক অধিকারের সহিত কোন আইনের বিরোধ ঘটিলে আদালতসমূহ মৌলিক অধিকারকে অগ্রাধিকার দিবে, কিন্তু নির্দেশাত্মক নীতি ও প্রচলিত কোন আইনের সংঘাতক্ষেত্রে নির্দেশাত্মক নীতি অবৈধ, সুতরাং নিষ্ফল ঘোষিত হইবে।

পঞ্চমতঃ, নির্দেশাত্মক নীতিগুলিকে বলবৎ করিবার জন্য সরকারকে বাধ্য করা যায় না। উদাহরণে, বলা যায় যে, বেকারগণ সরকারকে চাকুরি দিতে বাধ্য করিতে পারেন না।

পরিশেষে বলা যায় যে, নির্দেশাত্মক নীতিগুলির তুলনায় মৌলিক অধিকার-গুলিকে অগ্রাধিকার ও অধিক মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে। উভয়ের মধ্যে বিরোধ ঘটিলে মৌলিক অধিকারগুলি বলবৎ রহিবে।

সংক্ষিপ্তসার

ভারতের শাসনতন্ত্রে স্বাধীন আয়ারল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্রের অনুকরণে রাষ্ট্রপরিচালনার কতকগুলি মূলনীতি সংযোজিত হইয়াছে। ভারতের শাসন-তন্ত্রের প্রস্তাবনায় রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য বর্ণনাপ্রসঙ্গে ভারতকে একটি জনকল্যাণকর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। এই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হইল গণতান্ত্রিক উপায়ে জনসাধারণের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল সাধন করা। গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা সাফল্যমণ্ডিত করিবার পক্ষে রাজনৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। পূর্ণ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে এই গণতান্ত্রিক আদর্শ বলবৎ করা একান্ত আবশ্যক। এই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া শাসনতন্ত্রের রচয়িতাগণ শাসনতন্ত্রে কতকগুলি

নির্দেশাত্মক নীতি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং শাসকবর্গ যাহাতে উক্ত নীতি অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করেন তাহার জন্যও যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। শাসনতন্ত্রে বর্ণিত নির্দেশাত্মক নীতিসমূহের সংক্ষিপ্তসার নিম্নে দেওয়া হইল।

মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবন যাহাতে ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, এরূপ জনকল্যাণকর একটি সমাজব্যবস্থা গঠন করিবার জন্য রাষ্ট্র সচেষ্ট থাকিবে। সমস্ত নাগরিকের জীবিকা অর্জনের উপযুক্ত ব্যবস্থা, জনসাধারণের স্বার্থে সম্পদের অধিকার নিয়ন্ত্রণ, সমান কার্যের জন্য স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে সমান পারিশ্রমিক প্রদান, শ্রমিক শ্রেণীর নিরাপত্তা রক্ষা, শিশু ও যুবকদের শোষণ ও অত্যাচারের হাত হইতে রক্ষা, সকল নাগরিকেরই কর্ম ও শিক্ষার ব্যবস্থা, বেকার অবস্থায়, বার্ধক্যে, অসুস্থতায় ও অক্ষমতার ক্ষেত্রে সাহায্য করা প্রভৃতি শাসন-কর্তৃপক্ষের কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

চৌদ্দ বৎসরের অনধিক বালকবালিকাদের জন্য অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা-ব্যবস্থা, অনগ্রসর সম্প্রদায়গুলির অর্থনৈতিক ও শিক্ষাবিষয়ক উন্নতিসাধন, মাতৃমঙ্গল, জনস্বাস্থ্যের উন্নতি ও এই উদ্দেশ্যে মাদক দ্রব্যের ব্যবহার-বর্জন, কৃষির উন্নতি, পশুপালন, বিশেষতঃ উত্তম পশুপ্রজনন, গো-হত্যা নিবারণ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ ব্যবস্থা-সংগঠন প্রভৃতি কার্য নির্দেশাত্মক নীতিগুলির অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

ইহা ছাড়া আরও তিনটি বিষয় সম্পর্কে নির্দেশাত্মক নীতি শাসনতন্ত্রে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। প্রথমতঃ, পার্লামেণ্ট সভা কর্তৃক ঘোষিত জাতীয় গুরুত্বসম্পন্ন ঐতিহাসিক নিদর্শন, স্থান ও বস্তুসমূহ রক্ষা করা রাষ্ট্রের একটা দায়িত্ব বলিয়া বিবেচিত হইবে। দ্বিতীয়তঃ, শাসনবিভাগ হইতে বিচারবিভাগের সম্পূর্ণ পৃথকীকরণ সম্পর্কেও রাষ্ট্রের কর্তব্য নির্ধারিত হইয়াছে। তৃতীয়তঃ, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নীতি-সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা, এবং পররাষ্ট্রের সহিত ন্যায়সঙ্গত ও সম্মানজনক সম্পর্ক বজায় রাখা, আন্তর্জাতিক আইন, সন্ধি প্রভৃতির প্রতি সম্মান-প্রদর্শন এবং শান্তি-পূর্ণ উপায়ে সহযোগিতার মনোভাব লইয়া বিরোধসমূহের মীমাংসা করিতে রাষ্ট্র সচেষ্ট থাকিবে।

নির্দেশাত্মক নীতি সম্পর্কে বলা যায় যে, প্রস্তাবনায় উল্লিখিত উচ্চ আদর্শগুলির পুনরাবৃত্তি করা হইয়াছে মাত্র। এই আদর্শগুলি শাসনকার্যে ও

আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে বলবৎ হইলে দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির পথ যে অনেক পরিমাণে সুগম হইবে, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না।

মৌলিক অধিকার ও নির্দেশাত্মক নীতির পার্থক্য—প্রথমতঃ, মৌলিক অধিকারের দ্বারা রাষ্ট্রকে কতকগুলি কায হইতে বিরত থাকিতে বলা হইয়াছে, আর নির্দেশাত্মক নীতির দ্বারা রাষ্ট্রকে কতকগুলি কার্য সম্পাদন করিতে বলা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হইলে বিচারালয়ের সাহায্যে বলবৎ করা যায়, কিন্তু নির্দেশাত্মক নীতিগুলি বলবৎ করা যায় না। তৃতীয়তঃ, কোন আইন নির্দেশাত্মক নীতিবিরোধী হইলেও আইনটিকে অবৈধ ঘোষণা করা যায় না—কিন্তু মৌলিক অধিকার বিরোধী আইন অবৈধ বলিয়া ঘোষিত হইতে পারে। চতুর্থতঃ, উভয়ের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে মৌলিক অধিকারই অক্ষুণ্ণ থাকে, আর নীতিগুলি বাতিল হয়।

প্রশ্নাবলী

1. Summarise the Directive Principles of State Policy and indicate their significance in the Constitution of India.

2. Distinguish between the nature and character of Fundamental Rights and those of Directive Principles of State Policy. Explain why they had to be stated in separate parts in the Constitution of India.

3. Discuss the salient features of the Directive Principles of the State Policy.

4. Contrast the nature and substance of the Fundamental Right with those of the Directive Principles of State Policy under the Constitution of India. What would happen in case of a conflict between the two ?

সপ্তম অধ্যায়

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা

(Union Executive)

রাষ্ট্রপতি (The President)

শাসনতন্ত্রে সুস্পষ্টভাবে লিখিত হইয়াছে যে, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা একজন রাষ্ট্রপতির হস্তে ন্যস্ত থাকিবে। রাষ্ট্রপতি স্বয়ং অথবা তাঁহার অধস্তন কর্মচারিগণের সাহায্যে শাসনক্ষমতা পরিচালিত হইবে।

রাষ্ট্রপতি নিয়োগ (Election of the President)

রাষ্ট্রপতিপদে নিয়োগের জন্য পরোক্ষ নির্বাচনপদ্ধতির ব্যবস্থা হইয়াছে। (ক) ভারতীয় পার্লামেণ্ট সভার উভয় কক্ষের নির্বাচিত সদস্যগণ ও (খ) রাজ্যসমূহের নিম্নপরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণ কর্তৃক একক হস্তান্তরযোগ্য গোপন ভোট দ্বারা রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইবেন। সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যাহাতে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিতে পারে তদুদ্দেশ্যে এই জটিল নির্বাচনপদ্ধতি অবলম্বন করা হইয়াছে। ভারতে রাষ্ট্রপতি শাসনক্ষমতার উচ্চতম কর্তৃপক্ষ হইলেও কার্যতঃ তাঁহাকে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে পরিচালিত মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ অনুসারে শাসনক্ষমতা প্রয়োগ করিতে হইবে। রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্ব কার্যতঃ মন্ত্রিপরিষদসহ প্রধানমন্ত্রীর উপর ন্যস্ত হইয়াছে। সুতরাং জনগণ কর্তৃক রাষ্ট্রপতির প্রত্যক্ষ নির্বাচনব্যবস্থার প্রয়োজন অনুভূত হয় নাই।

রাষ্ট্রপতি সাধারণতঃ পাঁচ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইবেন এবং তিনি পুনর্নির্বাচিত হইতে পারিবেন। রাষ্ট্রপতি-নির্বাচনের জন্য শাসনতন্ত্র কর্তৃক নিম্নলিখিত যোগ্যতাগুলি স্থিরীকৃত হইয়াছে: (১) রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থীকে ভারতীয় নাগরিক হইতে হইবে। (২) তাঁহার পঁয়ত্রিশ বৎসরাধিক বয়স হইবে। (৩) পার্লামেণ্টের নিম্নপরিষদের সদস্য হওয়ার যোগ্যতা থাকিবে। (৪) এরূপ ব্যক্তি কোন লাভজনক কার্যে নিযুক্ত থাকিতে পারিবেন না। (৫) তিনি পার্লামেণ্ট সভা অথবা রাজ্য আইনসভার সদস্য থাকিতে পারিবেন না। রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইলে তিনি মাসিক দশ হাজার টাকা বেতন ও বিনা ভাড়ায় আবাসগৃহ এবং পার্লামেণ্ট দ্বারা নির্ধারিত অন্য রাহা-খরচা ইত্যাদি পাইবেন। শাসন-

তন্ত্রের বিরুদ্ধাচরণের জন্য রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে পার্লামেণ্টের যে-কোন কক্ষ অভিযোগ আনয়ন করিতে পারে এবং অভিযোগের প্রস্তাব যদি সেই কক্ষের ⅔ সংখ্যক সদস্যের দ্বারা গৃহীত ও অন্য কক্ষের ⅔ সংখ্যক সদস্যের দ্বারা যথাযথ-ভাবে পরীক্ষার পর গৃহীত হয়, তাহা হইলে রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ করা চলিবে। রাষ্ট্রপতি নিজে উপ-রাষ্ট্রপতির নিকট আবেদনপত্র দ্বারা পদত্যাগ করিতে পারেন। রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা বৃদ্ধির জন্য তাঁহাকে সাধারণ বিচারালয়ের বিচারাধীন করা হয় নাই।

রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা (Powers of the President)

শাসনতন্ত্র কর্তৃক রাষ্ট্রপতির উপর আরোপিত ক্ষমতাসমূহকে সাধারণতঃ পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়, যথা,—

(১) শাসন-পরিচালনার ক্ষমতা (Executive Powers)

রাষ্ট্রপতি হইলেন ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের শাসনকর্তৃপক্ষের শীর্ষস্থানীয় অধিকর্তা এবং তাঁহার নামেই সমগ্র শাসনক্ষমতা প্রযুক্ত হয়। রাষ্ট্রপতি বিভিন্ন রাজ্যের গভর্ণরদের মনোনয়ন করা ব্যতীতও সুপ্রিম কোর্ট ও উচ্চ বিচারালয়ের বিচার-পতিগণ, ভারতের অডিটর-জেনারেল ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারিগণের নিয়োগ করিয়া থাকেন। প্রথম তপশীলভুক্ত দ্বিতীয় ভাগে বর্ণিত রাজ্যগুলির শাসনকার্যের উপর আগামী দশ বৎসরকাল পর্যন্ত তিনি তদারক করিতে পারিতেন। চীফ কমিশনার-শাসিত রাজ্যগুলি ও আন্দামান-নিকোবর দ্বীপ-পুঞ্জের শাসন-পরিচালনার জন্য তিনি দায়ী ছিলেন। কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির আর্থিক সম্পর্কের সামঞ্জস্যবিধান করিবার দায়িত্ব হইল রাষ্ট্রপতির এবং এই উদ্দেশ্যে শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হইবার দুই বৎসরের মধ্যে তাঁহাকে একটি ফাইনান্স কমিশন নিয়োগ করিতে হইবে। বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে জলসরবরাহ ব্যাপারে বিরোধ ঘটিলে বিরোধ-নিরসনের জন্য রাষ্ট্রপতিকে একটি কমিশন গঠন করিতে হইবে। কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে অথবা রাজ্যগুলির মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য তিনি একটি আন্তঃ-রাজ্যসভা নিযুক্ত করিতে পারেন। এতদ্ব্যতীত জরুরী অবস্থায় এবং শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হওয়ার সময় হইতে সাধারণ নির্বাচন সমাপ্তি পর্যন্ত অন্তর্বর্তী কালে বহুবিধ ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতিকে দেওয়া হইয়াছে। রাষ্ট্রপতি হইলেন সমগ্র সশস্ত্র বাহিনীর অধিকর্তা। তিনি যুদ্ধঘোষণা ও শান্তিস্থাপন করিতে পারেন।

(২) আইনপ্রণয়ন-ক্ষমতা (Legislative Powers)

রাষ্ট্রপতি আইনসভার অবিচ্ছেদ্য অংশ। রাষ্ট্রপতি ও আইনসভার উভয় পরিষদ্ লইয়া ভারতীয় পার্লামেণ্ট সভা গঠিত। রাষ্ট্রপতি উভয় পরিষদ্ অথবা একটি পরিষদকে অধিবেশনের জন্য আহ্বান করিতে পারেন, উভয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখিতে পারেন এবং লোকসভা অর্থাৎ নিম্ন পরিষদ্ ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন। প্রত্যেক অধিবেশন আরম্ভের প্রাক্কালে রাষ্ট্রপতি উভয় পরিষদের যুক্ত অধিবেশনে বক্তৃতা করিতে পারিবেন এবং অধিবেশন আহ্বান করিবার কারণ ব্যাখ্যা করিবেন। তিনি কোন নির্দিষ্ট আইনের প্রস্তাব সম্পর্কে অথবা অন্য ব্যাপারে উভয় পরিষদের নিকট বাণী (Message) প্রেরণ করিতে পারেন।

উভয় পরিষদ্ কর্তৃক অনুমোদিত আইনের প্রস্তাবে রাষ্ট্রপতির সম্মতি একান্ত প্রয়োজন। অনুমোদিত আইনের প্রস্তাবে তিনি সম্মতিপ্রদান করিতে পারেন অথবা সম্মতিপ্রদানে বিরত থাকিতে পারেন। যে প্রস্তাব রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অনুমোদিত হয় না, তাহা সংশোধিত আকারে অথবা বিনা সংশোধনে যদি উভয় পরিষদ্ কর্তৃক পুনরায় গৃহীত হয়, তাহা হইলে উক্ত প্রস্তাব দ্বিতীয়বার রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপিত হইলে তাহাকে উক্ত প্রস্তাবে সম্মতিপ্রদান করিতেই হইবে। পার্লামেণ্টের অবকাশকালে রাষ্ট্রপতি জরুরী আইন (Ordinance) প্রণয়ন করিতে পারেন এবং এই আইনগুলি পার্লামেণ্ট-প্রণীত আইনের মত কার্যকরী হয়। কিন্তু রাষ্ট্রপতি প্রণীত জরুরী আইনগুলি পার্লামেণ্ট সভার পরবর্তী অধিবেশনে উত্থাপন করিতে হইবে এবং পার্লামেণ্ট কর্তৃক অনুমোদিত হইলে পার্লামেণ্টের অধিবেশন আরম্ভ হইতে ছয় সপ্তাহ পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে। নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই যদি পার্লামেণ্ট এই জরুরী আইনের বিরুদ্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করে তাহা হইলে জরুরী আইন আর কার্যকরী থাকিবে না।

(৩) অর্থ-সংক্রান্ত ক্ষমতা (Financial Powers)

প্রত্যেক আর্থিক বৎসরে রাষ্ট্রপতি পার্লামেণ্টের উভয় পরিষদের নিকট যুক্ত-রাষ্ট্রীয় সরকারের সম্ভাব্য আয় এবং ব্যয়ের এক হিসাব উত্থাপন করাইবেন। রাষ্ট্রপতির অনুমোদন ব্যতীত অর্থমঞ্জুরীর কোন দাবী উত্থাপিত হইতে পারে না। নিম্ন পরিষদে অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাব উত্থাপন করিতে গেলেও তাঁহার অনুমোদন প্রয়োজন। রাষ্ট্রপতির অনুমোদন ব্যতীত পার্লামেণ্ট সভায় আয়

এবং ব্যয়বরাদ্দ-সম্পর্কিত কোন প্রস্তাবই গৃহীত হইতে পারে না। বিভিন্ন রাজ্যগুলির মধ্যে আদায়ীকৃত আয়কর বণ্টন করিয়া দেওয়া এবং পাটশুল্কের পরিবর্তে আসাম, বিহার, উড়িষ্যা ও পশ্চিমবঙ্গকে সাহায্য প্রদান করিবার ক্ষমতাও রাষ্ট্রপতির হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে।

(৪) বিচার-বিষয়ক ক্ষমতা (Judicial Powers)

সুপ্রিম কোর্ট ও উচ্চ বিচারালয়ের বিচারপতিগণকে নিয়োগ করা ব্যতীতও রাষ্ট্রপতির অন্য বিচার-বিষয়ক ক্ষমতা আছে। দণ্ডিত ব্যক্তিতে দণ্ডপ্রাপ্তির সময়ে অথবা দণ্ডভোগকালে তিনি মার্জনা করিতে পারেন। শাস্তিভোগকালে কোন ব্যক্তিকে তিনি সাময়িকভাবে মুক্তির আদেশ দিতে পারেন। গুরুতর শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তির শাস্তি লঘুতর করিবার ক্ষমতাও তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছে। উল্লিখিত বিচার-বিষয়ক ক্ষমতাগুলি তিনি নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে পারেন: (১) কোর্ট-মার্শাল দ্বারা প্রদত্ত শাস্তিতে। (২) যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনের বিরোধিতা করিবার জন্য প্রাপ্ত শাস্তির ক্ষেত্রে। (৩) মৃত্যুদণ্ডে। এস্থলে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, রাজ্য সরকারগুলির আইনের বিরোধিতা করিবার জন্য মৃত্যুদণ্ডের ক্ষেত্র ব্যতীত অন্য প্রকার শাস্তির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদর্শন করিবার ক্ষমতা নাই।

(৫) জরুরী ক্ষমতা (Emergency Powers)

শাসনতন্ত্র কর্তৃক রাষ্ট্রপতির উপর কতকগুলি জরুরী ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে। এই ক্ষমতাগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

(ক) জরুরী অবস্থার ঘোষণা (Proclamation of Emergency)

শাসনতন্ত্রের ৩৫২ নং সূত্রে বলা হইয়াছে যে, কোন সময়ে রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন যে, দেশের নিরাপত্তা যুদ্ধ বা আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার জন্য বিঘ্নিত হইতে পারে, তাহা হইলে তিনি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিতে পারেন। উপরি-উক্ত কারণগুলি কার্যতঃ উপস্থিত না হইলেও যদি প্রত্যাসন্ন বলিয়া রাষ্ট্রপতি মনে করেন, তাহা হইলেও তিনি জরুরী অবস্থার ঘোষণা করিতে পারেন। এইরূপ ঘোষণা পার্লামেন্টের উভয় পরিষদ্ দ্বারা অনুমোদিত না হইলে দুই মাসের অধিককাল স্থায়ী হইতে পারে না। উভয় পরিষদ্ কর্তৃক

সমর্থিত হইলে এরূপ জরুরী ঘোষণা দুই মাসের অধিক কাল বলবৎ থাকিতে পারে।

জরুরী অবস্থা ঘোষণার ফলে শাসনব্যবস্থায় সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন সাধিত হয়। এই ঘোষণা বলবৎ থাকা কালে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা এককেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থায় পরিবর্তিত হয়। এই সময়ে পার্লামেন্ট সভা রাজ্যতালিকাভুক্ত যে-কোন বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে পারে। লোকসভার কার্যকাল এক-সময়ে এক বৎসর বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার-গুলির মধ্যে রাজস্ব বণ্টনের যে ব্যবস্থা আছে, জরুরী অবস্থায় রাষ্ট্রপতি তাহা পরিবর্তন করিতে পারেন। এতদ্ব্যতীত এ অবস্থায় বাক্‌-স্বাধীনতা সভাসমিতি করিবার স্বাধীনতা প্রভৃতি মৌলিক অধিকারগুলি হইতে নাগরিকগণকে বঞ্চিত করিবার ক্ষমতাও রাষ্ট্রপতির উপর অর্পিত হইয়াছে। অধিকন্তু এরূপ অবস্থায় রাষ্ট্রপতির নির্দেশ বলে মৌলিক অধিকারগুলিকে বিচারালয়ের সাহায্যে বলবৎ করিবার নাগরিক অধিকার স্থগিত থাকিতে পারে।

(খ) রাজ্যগুলির শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থা-সংক্রান্ত ঘোষণা (Emergency arising out of the failure of the Constitutional Machinery in the States)

দ্বিতীয়তঃ, যদি কোন সময়ে কোন রাজ্যের রাজ্যপালের নিকট হইতে সংবাদ পাইয়া অথবা অন্যভাবে রাষ্ট্রপতি নিঃসন্দেহ হন যে, সেই রাজ্যের শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থার উদ্ভব হইয়া, শাসনতন্ত্র অনুযায়ী, শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করা অসম্ভব হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি জরুরী ঘোষণা করিতে পারেন। এইরূপ ঘোষণার দ্বারা রাষ্ট্রপতি উক্ত রাজ্যের সমুদয় শাসনক্ষমতা নিজহস্তে গ্রহণ করিতে পারেন এবং সেই রাজ্যের আইন-প্রণয়নের ক্ষমতা পার্লামেন্ট কর্তৃক গৃহীত হইবে। কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রে উক্ত রাজ্যের উচ্চ বিচারালয়ের ক্ষমতা কোনক্রমেই ক্ষুণ্ণ হইবে না। এইরূপ ঘোষণা সাধারণতঃ দুই মাসের জন্য বলবৎ থাকিবে এবং পার্লামেন্টের উভয় পরিষদ্ কর্তৃক অনুমোদিত হইলে আরও ছয় মাসকাল বলবৎ থাকিতে পারে। কিন্তু পার্লা-মেন্টের অনুমোদনে ছয় মাস করিয়া ঘোষণাটির মেয়াদ বৃদ্ধি করিয়া তিন বৎসরের অধিক কাল পর্যন্ত ইহাকে বলবৎ রাখা চলিবে না।

(গ) অর্থ-সংক্রান্ত জরুরী অবস্থা ঘোষণা (Proclamation of Financial Emergency)

যদি কোন সময় রাষ্ট্রপতির ধারণা হয় যে, ভারত অথবা ভারতের কোন অংশের আর্থিক স্থায়িত্ব বা সুনাম নষ্ট হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি অর্থ-সংক্রান্ত জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিতে পারেন। উপরি উক্ত দুইটি ঘোষণার অনুরূপভাবেই এই ঘোষণাটিকেও পার্লামেন্টের উভয় পরিষদে উপস্থিত করিতে হইবে এবং এই ঘোষণার স্থায়িত্ব প্রথমোক্ত ঘোষণার নিয়মানুযায়ী নির্ধারিত হইবে। এই ঘোষণা বলবৎ থাকা-কালে রাজ্য সরকারের আয় ও ব্যয়বরাদ্দ প্রস্তাবসমূহ রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য সংরক্ষিত থাকিবে এবং রাজ্য সরকারগুলির সকল শ্রেণীর কর্মচারীর বেতন হ্রাস করা যাইবে।

রাষ্ট্রপতির ভিটো প্রয়োগ ক্ষমতা (Presidential Veto)

ভিটো শব্দটির অর্থ হইল শাসনবিভাগীয় [illegible] ব্যক্তি কর্তৃক আইন-সভা কর্তৃক অনুমোদিত আইন নাকচ করা। ইংলণ্ডের রাজা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি উভয়েরই এই ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী। তবে ইংলণ্ডের রাজার এই ভিটো প্রয়োগ ক্ষমতা ১৭০৭ খৃষ্টাব্দের পর হইতে পরিত্যক্ত হইয়াছে। বর্তমানে রাজার [illegible] ক্ষমতা আর প্রয়োগ হয় না। মার্কিন [illegible] এই ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারেন। ভারতের রাষ্ট্রপতি দুই প্রকারে এই ভিটো ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারেন। প্রথমতঃ, আইনসভা কর্তৃক গৃহীত আইনে তিনি সম্মতি প্রদান না করিয়া ১০ দিনের মধ্যে উক্ত প্রস্তাব আইনসভার পুনর্বিবেচনার জন্য ফেরত পাঠাইতে পারেন। কিন্তু আইনসভা যদি উক্ত প্রস্তাব দ্বিতীয়বার ২/৩ সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে পাশ করে, তাহা হইলে রাষ্ট্রপতির আপত্তি অথবা ভিটো সত্ত্বেও প্রস্তাবটি আইনে পরিণত হয়। আর ২/৩ সংখ্যাধিক্য না হইলে রাষ্ট্রপতির ভিটো বলবৎ থাকে। ইহাকে [illegible] ভিটো (qualified veto) বলা হয়। দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রপতি আইনসভা কর্তৃক আনীত কোন প্রস্তাবে সম্মতি বা অসম্মতি জ্ঞাপন না করিয়া ১০ দিনের অধিককাল পর্যন্ত প্রস্তাবটিকে নিজের কাছে রাখিয়া দিতে পারেন। ইতিমধ্যে কংগ্রেসের অধিবেশন যদি সমাপ্ত হয়, তাহা হইলে প্রস্তাবটি আর পুনরুত্থাপিত হইতে পারে না এবং এইরূপে রাষ্ট্রপতির

পরোক্ষ অসম্মতি বাধাহীন ভিটো রূপে (absolute veto) কার্যকরী হয়। এই ভিটোকে সাধারণতঃ পকেট ভিটো বলা হয়।

ভারতে রাষ্ট্রপতিকে নীতিগতভাবে বাধাহীন ভিটো ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী করা হইয়াছে। তবে এ কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভা কর্তৃক আনীত কোন্ প্রস্তাব তিনি সরাসরি বাতিল করিতে পারিবেন না, কিন্তু বে-সরকারী সদস্য কর্তৃক আনীত প্রস্তাব তিনি নাকচ করিতে পারেন।

দ্বিতীয়তঃ, ভারতের রাষ্ট্রপতি আইনসভা কর্তৃক আনীত কোন প্রস্তাব সরাসরি নাকচ না করিয়া পুনর্বিবেচনার জন্য ফেরৎ পাঠাইতে পারেন। কিন্তু আইনসভা যদি সেই প্রস্তাব পুনরায় সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে পাশ করে তাহা হইলে রাষ্ট্রপতিকে সেই প্রস্তাবে সম্মতি দান করিতেই হইবে। সুতরাং এক্ষেত্রে ভারতের রাষ্ট্রপতির ভিটো ক্ষমতা হইল স্থগিতকারী ভিটো (suspensive veto)।

তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্রপতি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির ন্যায় প্রস্তাবটিকে পুনর্বিবেচনার জন্য আইনসভায় প্রেরণ না করিয়া অনির্দিষ্ট কালের জন্য নিজের কাছে রাখিয়া দিতে পারেন। এরূপ ক্ষেত্রে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির ন্যায় ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষেও 'পকেট ভিটো' প্রয়োগের একটা সম্ভাবনা রহিয়াছে।

চতুর্থতঃ, যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন নাকচ করা ব্যতীতও ভারতের রাষ্ট্রপতিকে রাজ্য আইনসভা প্রণীত আইন নাকচ করিবার ক্ষমতার অধিকারী করা হইয়াছে। কোন রাজ্যের রাজ্যপাল কর্তৃক রাষ্ট্রপতির সম্মতি-সাপেক্ষে রক্ষিত কোন আইনের প্রস্তাব তিনি নাকচ করিতে পারেন অথবা পুনর্বিবেচনার জন্য ফেরৎ পাঠাইতে পারেন। এক ক্যানাডা ব্যতীত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে বা অষ্ট্রেলিয়ায় রাষ্ট্রপতি বা গভর্ণর-জেনারেল এই ক্ষমতার অধিকারী নহেন।

সুতরাং ভারতে পার্লামেন্টারী শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হইলেও রাষ্ট্রপতির উপর ভিটো ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার দেওয়া হইয়াছে এবং এই ভিটো ক্ষমতা বিভিন্ন ধরনের ভিটো ক্ষমতার সংমিশ্রণে পরিকল্পিত হইয়াছে।

রাষ্ট্রপতি-পদের কয়েকটি শাসনতান্ত্রিক ত্রুটি (Some Constitutional anomalies of the Position of the President)

ভারতের সংবিধান কর্তৃক ভারতের রাষ্ট্রপতি-পদে যে সমুদয় ক্ষমতা

আরোপিত হইয়াছে, সে সমুদয় ক্ষমতা প্রয়োগ সম্পর্কে সংবিধানে কোন সুনির্দিষ্ট নির্দেশ নাই। ফলে রাষ্ট্রপতির পক্ষে নিজের খুসীমত এই ক্ষমতাগুলি প্রয়োগে কোন শাসনতান্ত্রিক বাধা নাই। শাসনতন্ত্রের ৫৩ ধারা অনুসারে ভারত যুক্তরাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে এবং এই ক্ষমতা তিনি স্বয়ং প্রত্যক্ষভাবে প্রয়োগ করিবেন অথবা তাঁহার অধস্তন কর্মচারিগণের দ্বারা পরিচালিত হইবে। এই ধারার শব্দগত অর্থের দিক দিয়া দেখিলে বলা যায় যে, রাষ্ট্রপতি শুধু নামেমাত্র শাসকপ্রধান নহেন, তাঁহার পক্ষে কার্যতঃ শাসনক্ষমতার সর্বেসর্বা হইবার পথে কোন শাসনতান্ত্রিক অন্তরায় নাই। অনুরূপভাবে সংবিধানের ৭৪ ধারায় বলা হইয়াছে যে, রাষ্ট্রপতিকে শাসনকার্যে পরামর্শ ও সাহায্য দান করিবার জন্য প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি মন্ত্রিসভা থাকিতে হইবে। কিন্তু শাসনতন্ত্রের কোথায়ও উল্লেখ নাই যে, প্রধানমন্ত্রী-সহ মন্ত্রিসভার পরামর্শ ও সাহায্য গ্রহণ করিতে রাষ্ট্রপতি আইনতঃ বাধ্য। মন্ত্রিসভা থাকিতে পারে এবং শাসনকার্যে এই মন্ত্রিসভার সহিত রাষ্ট্রপতি পরামর্শও করিতে পারেন। কিন্তু মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত রাষ্ট্রপতি গ্রহণ না-ও করিতে পারেন। মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুসারে রাষ্ট্রপতি শাসনকার্য পরিচালনা না করিলেও তাহার কোন শাসনতান্ত্রিক প্রতিকার নাই।

সংবিধানগত ত্রুটির জন্য যে রাষ্ট্রপতি স্বৈরাচারী শাসকপ্রধানে পরিণত হইতে পারেন, শাসনতন্ত্রের অনেক বিজ্ঞ সমালোচক এই সম্ভাবনার উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন, যদি কোন ক্ষমতাপ্রিয় ব্যক্তি দুরভিসন্ধি লইয়া কৌশলে রাষ্ট্রপতি-পদে নির্বাচিত হইতে পারেন, তাহা হইলে শাসনতান্ত্রিক আইনের গলদের সুযোগ লইয়া তিনি স্বৈরাচারী হইতে পারেন। তাহার অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া যদি আইনসভার কোন কক্ষ এক-চতুর্থাংশ সদস্যের ভোটে তাহাকে অপসারিত করিবার উদ্দেশ্যে কোন প্রস্তাব গ্রহণ করিতে উদ্যত হয়, তাহা হইলেও ১৪ দিন সময় প্রয়োজন হয়। এই ১৪ দিন শেষ হইবার পূর্বে রাষ্ট্রপতি লোকসভা ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন। লোকসভা পুনর্নির্বাচিত হইলেও নূতন লোকসভার নির্বাচনের ছয় মাসের মধ্যে ইহার অধিবেশন না বসিলেও চলিতে পারে।

মন্ত্রিসভা রাষ্ট্রপতির খুসীমত কার্যে বহাল থাকে, সুতরাং রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিসভাও ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন। তৎপরে তিনি তাঁহার ইচ্ছামত মন্ত্রিসভা গঠন করিতে পারেন—কারণ ভারতের সংবিধান অনুসারে মন্ত্রিগণ আইনসভার সদস্য না

হইয়াও ছয় মাস পর্যন্ত মন্ত্রী থাকিতে পারেন। তারপর রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থার ঘোষণা করিয়া বিশেষ আইন (Ordinance) পাস করিতে পারেন এবং রাষ্ট্রপতি-প্রণীত এই আইনগুলি ছয় মাস বলবৎ থাকে এবং পার্লামেণ্ট প্রণীত আইনের মতই কার্যকরী হয়। জরুরী অবস্থায় রাষ্ট্রপতি বিচারালয়গুলির ক্ষমতাও সংকুচিত করিতে পারেন। এই সময়ে তিনি মৌলিক অধিকারগুলির ভোগ স্থগিত রাখিতে পারেন। রাজ্যসরকারগুলির ক্ষমতা অপহরণ করিতে পারেন এবং রাজ্যসরকারগুলিকে প্রদেয় আয়কর ও অন্যান্য কর হইতে বঞ্চিত করিয়া তাহাদের আর্থিক ক্ষমতা সংকুচিত করিতে পারেন। রাষ্ট্রপতি তাঁহার বিপক্ষ দলের সদস্যগণকে আটক রাখিবার জন্য রাজ্যসরকারগুলিকে নির্দেশ দান করিতে পারেন এবং তাঁহার এই নির্দেশ উপেক্ষিত হইলে তিনি শাসনতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী রাজ্যসরকারগুলির শাসনতন্ত্র বাতিল করিতে পারেন। রাষ্ট্রের প্রধান সেনাপতি হিসাবে তিনি সামরিক শক্তির সাহায্যে বে-সামরিক কর্তৃপক্ষকে অবদমিত রাখিতে পারেন।

উপরে রাষ্ট্রপতি-পদের ক্ষমতার অপব্যবহারের যে সম্ভাবনার উল্লেখ করা হইল বাস্তবতঃ সে সম্ভাবনা সুদূরপরাহত হইলেও শাসনতন্ত্রে রাষ্ট্রপতির এই ক্ষমতাগুলির কতকগুলি শাসনতান্ত্রিক বাধা বিধিবদ্ধ করা উচিত ছিল। এরূপ উচ্চাভিলাষী কোন দেশদ্রোহী হয়ত রাষ্ট্রপতি-পদে নির্বাচিত হইতে পারিবেন না বা কোন রাজনৈতিক দলই এইরূপ লোককে রাষ্ট্রপতি-পদের জন্য মনোনয়ন করিবে না। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও যদি কোন ক্ষমতাপ্রিয় ব্যক্তি কৌশলে নির্বাচন দ্বন্দ্বে জয়ী হন তাহা হইলে তিনি অন্ততঃ কিছু দিন পর্যন্ত শাসনব্যবস্থায় স্বৈরাচার প্রবর্তন করিতে পারেন।

উপরি-উক্ত সম্ভাবনার কথাগুলি গ্রহণ না করিলেও ভারতের রাষ্ট্রপতিকে শুধুমাত্র নামসর্বস্ব শাসকপ্রধান বলা সমীচীন নহে। শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধাচরণ না করিয়াও রাষ্ট্রপতি স্বাধীনভাবে কয়েকটি কার্য করিবার অধিকারী। রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীকে নিযুক্ত করেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজনৈতিক দলের নেতাকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত না করিয়া তাঁহার গত্যন্তর না থাকিলেও লোকসভায় কোন দলেরই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকার ক্ষেত্রে তিনি নিজ ইচ্ছামত যে-কোন দলের একজনকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করিতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ, প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারে তিনি লোকসভা ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন, কিন্তু বিশেষ ক্ষেত্রে তিনি যদি মনে করেন যে, লোকসভা ভাঙ্গিয়া দিবার মত অবস্থা হয় নাই তাহা

হইলে এ বিষয়ে তিনি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ গ্রহণ নাও করিতে পারেন। তৃতীয়তঃ, শাসনতন্ত্র অনুসারে ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে রাষ্ট্রপরিচালনা সম্পর্কে সমস্ত বিষয়ই রাষ্ট্রপতির গোচরীভূত করিতে হইবে। রাষ্ট্রপতি স্বয়ং শাসন-পরিচালনা ও আইনপ্রণয়ন-সংক্রান্ত ব্যাপারগুলি জানিতে চাহিতে পারেন এবং এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কর্তব্য হইল রাষ্ট্রপতিকে সমুদয় তথ্য সরবরাহ করা। শাসনতন্ত্রের বিধানানুযায়ী রাষ্ট্রপতি ইচ্ছা করিলে কোন একজন মন্ত্রীর সিদ্ধান্ত বিশেষরূপে বিবেচনার জন্য মন্ত্রিপরিষদের সভায় উপস্থাপিত করিতে প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করিতে পারেন। সুতরাং রাষ্ট্রপতি ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হইলে শাসন পরিচালনা ক্ষেত্রে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন।

ইংলণ্ডের রাজা ও ভারতের রাষ্ট্রপতি (King of England and the Indian President)

ভারতের রাষ্ট্রপতির সহিত ইংলণ্ডের রাজার তুলনা করা যাইতে পারে। উভয়েই রাষ্ট্রের প্রধান এবং রাষ্ট্রের আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে তাঁহারা প্রতিনিধিত্ব করিয়া থাকেন। উভয়েই রাষ্ট্রক্ষমতা, সম্মান ও পদমর্যাদার অধিকারী হইলেও শাসনতান্ত্রিক ও প্রথাগত বিধান দ্বারা উভয়ের ক্ষমতা বহুলাংশে সংকুচিত হইয়াছে এবং এই কারণে উভয়েই নামসর্বস্ব শাসনতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধানরূপে পরিগণিত হইয়া থাকেন। ইংলণ্ডের রাজা ও ভারতের রাষ্ট্রপতির এইরূপ শাসনতান্ত্রিক অবস্থার কারণ হইল যে, উভয় দেশেই পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থা প্রচলিত আছে এবং এই ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হইল যে, একজন নামসর্বস্ব রাষ্ট্রপ্রধান থাকিলেও প্রকৃত ক্ষমতা একটি মন্ত্রিপরিষদের উপর ন্যস্ত থাকে এবং মন্ত্রিপরিষদ্ ইহার কাজের জন্য নির্বাচিত আইনসভার নিকট দায়ী থাকে।

তবে কয়েকটি বিষয়ে ইংলণ্ডের রাজার সহিত ভারতের রাষ্ট্রপতির কিছু পার্থক্য দেখা যায়। ইংলণ্ডের রাজপদ হইল বংশানুক্রমিক, ভারতের রাষ্ট্রপতি হইলেন নির্বাচিত। ইংলণ্ডের রাজা কতকগুলি নির্দিষ্ট শর্ত মানিয়া লইলে আজীবন রাজপদে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারেন, কিন্তু রাষ্ট্রপতি পাঁচ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইয়া থাকেন এবং পুনরায় নির্বাচিত হইতে পারেন।

ক্ষমতার দিক দিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, ইংলণ্ডের রাজার ক্ষমতা দীর্ঘদিন ধরিয়া শাসনতন্ত্র পরিবর্তনের ফলে ক্রমশই রাজার হস্ত হইতে পার্লামেণ্ট সভায় হস্তান্তরিত হওয়ার ফলে রাজা এখন রাজতন্ত্রে পরিণত হইয়াছেন;

তাই বলা হয়, রাজা রাজত্ব করেন—শাসন করেন না ; রাজার কোন দায়িত্ব নাই বা রাজার মৃত্যু নাই। এই সমস্ত শাসনতান্ত্রিক প্রবাদবচনের অর্থ হইল যে, রাজা স্ব-ইচ্ছায় আর শাসন-সংক্রান্ত কোন কাজই করিতে পারেন না। মন্ত্রিগণই রাজার নামে শাসন পরিচালনা করিয়া থাকেন। কিন্তু ভারতের শাসনতন্ত্রের ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্রের ন্যায় দীর্ঘদিনের কোন শাসনতান্ত্রিক ঐতিহ্য নাই। রাষ্ট্রপতি-পদেরও ইংলণ্ডের রাজপদের ন্যায় কোন ঐতিহ্য এখনও গঠিত হয় নাই। তবে শাসনতান্ত্রিক আইনের দিক দিয়া দেখিতে গেলে বলা যায় যে, ভারতের রাষ্ট্রপতির কয়েকটি সংবিধান-প্রদত্ত বিশেষ ক্ষমতা আছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, আইনসভায় কোন দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকিলে তিনি ইচ্ছামত প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করিতে পারেন এবং বিশেষ ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া লোকসভা ভাঙ্গিয়া দিতে অস্বীকার করিতে পারেন। ইংলণ্ডের রাজতন্ত্র বহু প্রাচীন প্রতিষ্ঠান বলিয়া ইংলণ্ডের বংশানুক্রমিক রাজা জনসাধারণের উপর যেরূপ অলৌকিক প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন ভারতের অস্থায়ী নির্বাচিত রাষ্ট্রপতির পক্ষে সেরূপ প্রভাব সৃষ্টি করা সম্ভব নহে।

রাষ্ট্রপরিচালনা ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা ও প্রভাব (Position and Influence of the President of India)

সংবিধান কর্তৃক রাষ্ট্রপতির উপর যে ব্যাপক ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে, তাহার তালিকা দেখিলে রাষ্ট্রপতিকে স্বভাবতঃই স্বৈরাচারী শাসক বলিয়া অনুমিত হয়। কিন্তু একটু প্রণিধানপূর্বক দেখিলেই রাষ্ট্রপতির এই ব্যাপক ক্ষমতার তাৎপর্য বুঝিতে পারা যায়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির ন্যায় পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হইলেও ভারতের রাষ্ট্রপতির নির্বাচনপদ্ধতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি প্রাথমিক ভোটদাতৃগণ কর্তৃক নির্বাচিত মাধ্যমিক ভোটদাতৃগণ কর্তৃক সংখ্যাধিক্য ভোটে নির্বাচিত হইয়া থাকেন। ফরাসী দেশের ও বর্মার রাষ্ট্রপতিদ্বয় আইনসভার উভয় পরিষদের যুক্ত অধিবেশনে সংখ্যাধিক্য ভোটে নির্বাচিত হইয়া থাকেন। কিন্তু ভারতে একক হস্তান্তরযোগ্য ভোটদানপদ্ধতিতে পার্লামেণ্ট সভার উভয় কক্ষে নির্বাচিত সদস্যগণের ও রাজ্যগুলির ব্যবস্থাপক সভার সদস্যগণের গোপন ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইয়া থাকেন। ভারতের রাষ্ট্রপতির কার্যকাল পাঁচ বৎসর

এবং এই মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলে তিনি পুনর্নির্বাচিত হইতে পারেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির ন্যায় ভারতের রাষ্ট্রপতিকেও একমাত্র বিশেষ বিচারপদ্ধতি (Impeachment) অবলম্বন না করিয়া পদচ্যুত করা যায় না। তবে ভারতের পার্লামেণ্ট সভার যে-কোন পরিষদই রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করিতে পারে এবং একটি পরিষদ্ কর্তৃক আনীত অভিযোগ অপর পরিষদ্ কর্তৃক পরীক্ষিত হইয়া ⅔ সংখ্যক সদস্য দ্বারা যদি গৃহীত হয় তাহা হইলে রাষ্ট্রপতিকে পদত্যাগ করিতে হয়। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিচার একমাত্র সিনেট সভা কর্তৃক পরিচালিত হয়।

নূতন সংবিধান অনুসারে ভারতের রাষ্ট্রপতিকে শাসনব্যাপারে, আইন-প্রণয়নে, অর্থ-সংক্রান্ত ব্যাপারে ও জরুরী অবস্থায় ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী করা হইয়াছে। জরুরী অবস্থার ঘোষণাকালে রাষ্ট্রপতিকে এরূপ ব্যাপক ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে যাহার বলে তিনি যে শুধু রাজ্যসরকারগুলির উপর অবাধ কর্তৃত্ব করিতে সক্ষম হইবেন তাহা নয়, এই ক্ষমতাবলে তিনি বাক্-স্বাধীনতা, সভাসমিতি করিবার স্বাধীনতা প্রভৃতি মৌলিক অধিকারগুলি হরণ করিয়া লইতে পারেন। এমন কি নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে মৌলিক অধিকার-গুলিকে রক্ষা করিবার যে অধিকার শাসনতন্ত্র কর্তৃক নাগরিকগণের উপর অর্পিত হইয়াছে, সে অধিকার পর্যন্ত রাষ্ট্রপতির নির্দেশে জরুরী অবস্থার ঘোষণাকালে স্থগিত রাখা যায়। ভারতের শাসনতন্ত্রের এই সূত্রটির লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হইল যে, রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিবার আদৌ কোন কারণ ঘটিয়াছে কিনা তাহা কোন বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত দ্বারা স্থিরীকৃত হইতে পারিবে না। জরুরী অবস্থার ঘোষণা সম্পর্কে রাষ্ট্রপতির সিদ্ধান্তই হইল চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। সত্য বটে যে, রাষ্ট্রপতির জরুরী অবস্থার প্রত্যেক ঘোষণাই পার্লামেণ্ট সভা কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে, কিন্তু দুই মাস কাল পর্যন্ত এই ঘোষণা পার্লামেণ্টের বিনা অনুমোদনে বলবৎ থাকিতে পারে। সুতরাং আপাত-দৃষ্টিতে মনে হয় যে, শাসনতন্ত্র এক হস্তে রাজ্য সরকারগুলি ও নাগরিকগণকে যে অধিকার দিয়াছে, অপর হস্তে সে অধিকারগুলিকে হরণ করা হইয়াছে।

ভারতের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার সহিত যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার তুলনা করা যায়, তাহা হইলে ভারতের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা-সম্পর্কে নির্ভুল ধারণা জন্মিতে পারে। মার্কিন দেশের রাষ্ট্রপতি শাসনতন্ত্র হইতে তাঁহার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার কার্যকালে তিনি ভোটদাতৃগণ, আইনসভা ও মন্ত্রিপরিষদ-

নিরপেক্ষ হইয়া শাসনকার্য পরিচালনা করিতে পারেন। তিনি প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী। স্বাধীন আয়ারল্যাণ্ডের রাষ্ট্রপতিও দুইটি বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী। তিনি মন্ত্রিপরিষদের সহিত পরামর্শ না করিয়া স্বাধীনভাবে আইনসভা ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন এবং প্রস্তাবিত আইন গণভোটে প্রেরণ করিতে পারেন। কিন্তু ভারতের রাষ্ট্রপতি উপরি-উক্ত কোন বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী নহেন। এতদ্ব্যতীত ভারতের রাষ্ট্রপতি হইলেন নিয়মতান্ত্রিক শাসকপ্রধান। গ্রেট বৃটেনের ন্যায় ভারতেরও দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, শাসকপ্রধান, তিনি রাজাই হউন আর নির্বাচিত রাষ্ট্রপতিই হউন, মন্ত্রিপরিষদের উপদেশ ও পরামর্শ অনুসারে শাসনকার্য পরিচালনা করিবেন। রাষ্ট্রপতিকে যে সর্বক্ষেত্রে মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ অনুযায়ী কার্য করিতে হইবে—একথা স্পষ্টভাবে ভারতের সংবিধানে লিখিত না থাকিলেও সংবিধানে বর্ণিত অন্য কতকগুলি বিধানানুযায়ী রাষ্ট্রপতিকে মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শানুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা না করিয়া উপায় নাই। রাষ্ট্রপতি যদি মন্ত্রিপরিষদসহ প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে মন্ত্রিপরিষদ্ পদত্যাগ করিবে। এরূপ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিকে নিম্ন পরিষদ্ ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন নির্বাচনের আদেশ দিতে হইবে। নূতন নির্বাচনের ফলে যদি বিদায়ী মন্ত্রিপরিষদ্ যে রাজনৈতিক দলভুক্ত ছিলেন, সেই দলই সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে, তাহা হইলে নূতন নির্বাচনের ফল রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে জনগণের আস্থার অভাব সূচিত করিবে। সুতরাং মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ গ্রহণ না করিলে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও পদমর্যাদা বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা আছে। এতদ্ব্যতীত আরও একটি কারণে রাষ্ট্রপতির সহিত মন্ত্রিপরিষদের মতানৈক্য ঘটিতে পারে না। মার্কিন দেশের মত ভারতেও রাষ্ট্রপতি-নির্বাচন দলীয় ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হয়। পার্লামেণ্ট সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দল ইহার মনোনীত প্রার্থীকে রাষ্ট্রপতি-পদে নির্বাচন করিয়া থাকে। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের ভোটে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতৃগণ কর্তৃক গঠিত মন্ত্রিপরিষদের উপদেশ ও পরামর্শ উপেক্ষা করিতে পারেন না। সুতরাং শেষ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, শাসনতন্ত্র কর্তৃক রাষ্ট্রপতির উপর অর্পিত ব্যাপক ক্ষমতা সমন্ত্রিপরিষদ্ প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশেই পরিচালিত হইয়া থাকে। অপরপক্ষে, মন্ত্রিপরিষদ পার্লামেণ্ট সভার নিম্ন কক্ষ লোকসভার নিকট তাহাদের শাসননীতি ও কার্যক্রমের জন্য দায়ী। লোকসভার সদস্যগণ সার্বজনীন ভোটাধিকার ভিত্তিতে ভারতের নাগরিকগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধি।

সুতরাং শেষ পর্যায়ে দেখা যায় যে, রাষ্ট্রপতির হস্তে যে ব্যাপক ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা জনগণের প্রতিনিধিবৃন্দের অনুমোদন ব্যতীত প্রযুক্ত হইতে পারে না। রাষ্ট্রপতি নিজের খুসীমত এই ব্যাপক ক্ষমতার অপব্যবহার করিতে পারেন না। এ-দিক দিয়া দেখিতে গেলে ভারতের রাষ্ট্রপতি ইংলণ্ডের রাজার ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির অনুরূপ ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির অধিকারী। ভারতের শাসনতন্ত্রে উল্লিখিত আছে যে, প্রধানমন্ত্রীকে রাষ্ট্রপরিচালনা সম্পর্কে সমস্ত বিষয়ই রাষ্ট্রপতির গোচরীভূত করিতে হইবে। রাষ্ট্রপতি স্বয়ং শাসন-পরিচালনা ও আইনপ্রণয়ন-সংক্রান্ত ব্যাপারগুলি জানিতে চাহিতে পারেন এবং এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কর্তব্য হইল রাষ্ট্রপতিকে সমুদয় সংবাদ সরবরাহ করা। শাসনতন্ত্রের বিধানানুযায়ী রাষ্ট্রপতি ইচ্ছা করিলে কোন একজন মন্ত্রীর সিদ্ধান্ত বিশেষরূপে বিবেচনার জন্য মন্ত্রিপরিষদের সভায় উপস্থাপিত করিতে প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করিতে পারেন।

সুতরাং রাষ্ট্রপতিকে মন্ত্রিপরিষদের ক্রীড়নক বলিয়া মনে করিলে ভুল হইবে। ইংলণ্ডের রাজার ন্যায় তাঁহার ব্যক্তিগত ক্ষমতা না থাকিলেও যথেষ্ট প্রতিপত্তি ও পদমর্যাদা আছে। ইংলণ্ডের রাজার ন্যায় তিনি মন্ত্রিসংসদকে পরামর্শদান ও কাজে উৎসাহিত করিতে পারেন। তিনি শাসন না করিলেও শাসনকার্যের উপর তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন। রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও পদমর্যাদার পরিধি ভবিষ্যতে কি হইবে তাহা প্রথম দু' চারজন রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী যে শাসনতান্ত্রিক রীতি গড়িয়া তুলিবেন তাহার উপর বহুলাংশে নির্ভর করে।

ভারতের রাষ্ট্রপতি ও মার্কিণ রাষ্ট্রপতি (The President of India and the American President)

ভারত ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র উভয় দেশের শাসনব্যবস্থার শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি হইলেন রাষ্ট্রপতি। কিন্তু ভারতের রাষ্ট্রপতি ও মার্কিণ রাষ্ট্রপতি এই উভয় পদের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য দেখা যায় এবং পার্থক্যের মূল কারণ হইল যে, ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হইলেও ভারত বৃটিশ আদর্শের অনুরূপ পার্লামেন্টারী শাসনব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে, আর মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র রাষ্ট্রপতি প্রধান শাসনব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে।

এই কারণে ভারতের রাষ্ট্রপতির নিয়োগ, ক্ষমতা ও পদমর্যাদা মার্কিণ রাষ্ট্রপতির নিয়োগ ব্যবস্থা, ক্ষমতা ও পদমর্যাদা অপেক্ষা পৃথক।

প্রথমতঃ, ভারতে ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতিদ্বয় পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হইয়া থাকেন। কিন্তু এই উভয় দেশের পরোক্ষ নির্বাচন-পদ্ধতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ভারতের রাষ্ট্রপতি কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্ট সভা ও রাজ্য আইনসভাগুলির নির্বাচিত সদস্যগণ কর্তৃক গঠিত নির্বাচন কেন্দ্র দ্বারা নির্বাচিত হইয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহার নির্বাচন প্রকৃতপক্ষে পরোক্ষভাবে অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি প্রাথমিক ভোটদাতাগণ কর্তৃক নির্বাচিত দ্বিতীয় পর্যায়ের ভোটদাতাগণ কর্তৃক গঠিত নির্বাচন কেন্দ্র দ্বারা নির্বাচিত হইয়া থাকেন। কার্যতঃ এই দ্বিতীয় পর্যায়ের ভোটদাতাগণ প্রাথমিক ভোটদাতাগণের নির্দেশ অনুসারে রাষ্ট্রপতির নির্বাচন করেন। সুতরাং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে নির্বাচনপদ্ধতি পরোক্ষ হইলেও কার্যতঃ এই পদ্ধতিকে প্রত্যক্ষ বলা যাইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, ভারতের রাষ্ট্রপতি পাঁচ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন এবং তাঁহার পুনর্নির্বাচনে কোন শাসনতান্ত্রিক বাধা নাই। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি চার বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন এবং ১৯৫১ সালের শাসনতান্ত্রিক ২২নং সংশোধন দ্বারা স্থির হইয়াছে যে, কোন ব্যক্তি পরপর দুইবারের অধিক রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইতে পারিবেন না।

তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্রপতিদ্বয়ের অপসারণের ক্ষেত্রেও উভয় দেশে একই পদ্ধতি অবলম্বিত হইলেও কিছু পার্থক্য দেখা যায়। উভয় দেশেই বিশেষ বিচার-ব্যবস্থার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া (Impeachment) রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ করা যায়। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ম হইল যে, নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদ রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করিবে ও উচ্চ কক্ষ সিনেট সভা সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির সভাপতিত্বে আনীত অভিযোগের বিচার করিয়া ⅔ সংখ্যা-গরিষ্ঠের ভোটে রাষ্ট্রপতিকে পদচ্যুত করিতে পারে। ভারতের ক্ষেত্রেও সংবিধান ভঙ্গের অভিযোগে রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা যায়। কিন্তু ভারতে পার্লামেণ্ট সভার যে কোন কক্ষ অভিযোগ আনিতে পারে এবং এই আনীত অভিযোগ যদি অন্য কক্ষে ⅔ সংখ্যাধিক্য সদস্যের উপস্থিতিতে ও ভোটে গৃহীত হয় তাহা হইলে রাষ্ট্রপতিকে পদত্যাগ করিতে হয়।

চতুর্থতঃ, ভারতের রাষ্ট্রপতি হইলেন কেন্দ্রীয় আইনসভার অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং সকল প্রকার আইন রাষ্ট্রপতি-সহ পার্লামেণ্ট সভা কর্তৃক গৃহীত হয়। কিন্তু

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতা পৃথকীকরণের ফলে রাষ্ট্রপতি ও আইনসভা—উভয়েই পরস্পরের প্রভাব-মুক্ত।

পঞ্চমতঃ, ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হইলেও কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাধান্য ও অগ্রাধিকার সুস্পষ্টরূপে দেখা যায়। ভারতের রাষ্ট্রপতি হইলেন একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি হইলেন অপেক্ষাকৃত দুর্বল কেন্দ্রীয় সরকারের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি। রাজ্যগুলির শাসন সম্পর্কে ভারতের রাষ্ট্রপতির যে সমুদয় ক্ষমতা আছে, মার্কিণ রাষ্ট্রপতির সে ক্ষমতা নাই।

ষষ্ঠতঃ, আর একটি বিষয়ে উভয় দেশের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার বিশেষ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ভারতের রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থা ঘোষণা দ্বারা এরূপ অবস্থা সৃষ্টি করিতে পারেন যখন তিনি বিশেষ ক্ষমতা পরিচালনা করিবার অধিকারী হন। এরূপ জরুরী অবস্থা ঘোষণাকালে তিনি নাগরিকগণের মৌলিক অধিকার ভোগ স্থগিত রাখিতে পারেন, রাজ্যগুলির শাসনতন্ত্র বাতিল করিতে পারেন এবং এমনকি সুপ্রিম কোর্ট ও উচ্চ বিচারালয়ের বিচারপতিগণের বেতন পরিমাণ হ্রাস করিতে পারেন। এতদ্ব্যতীত রাষ্ট্রপতিকে আরও কতকগুলি বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী করা হইয়াছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির ন্যায় তিনি সীমাবদ্ধ ভিটো ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারেন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে রাজ্য আইনসভা-প্রণীত আইনগুলির উপরও ভিটো ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারেন।

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে স্বভাবতই মনে হয় যে, ভারতের রাষ্ট্রপতি মার্কিণ রাষ্ট্রপতি অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতাশালী। কিন্তু কার্যতঃ তাহা নহে। ভারতে পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত থাকার ফলে রাষ্ট্রপতির হস্তে ন্যস্ত এই বিশাল ক্ষমতা মন্ত্রিপরিষদ-সহ প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারে পরিচালিত হয়। রাষ্ট্রপতি বহুলাংশে ইংলণ্ডের রাজার ন্যায় রাষ্ট্রের শাসনতান্ত্রিক প্রধানের ভূমিকা গ্রহণ করেন।

অপর পক্ষে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি নামমাত্র শাসনব্যবস্থার প্রধান নহেন, কার্যত তিনি হইলেন রাষ্ট্রের প্রধান কর্ণধার। শাসনতন্ত্র হইল তাহার ক্ষমতার উৎস এবং তিনি যে চার বৎসরকাল শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকেন, সেই চার বৎসর কার্যকালের মধ্যে তাঁহার কার্যাবলী শাসনতন্ত্র বিরোধী না হইলে তিনি কাহারও নিকট দায়ী নহেন। তিনি ভোটদাতা, আইনসভা ও তাঁহার কেবিনেট সভা নিরপেক্ষভাবে কার্য পরিচালনা করিতে পারেন। এক কথায় বলা যায়

যে, মার্কিণ রাষ্ট্রপতি একাধারে ইংলণ্ডের রাজার সম্মান ও প্রতিপত্তির অধিকারী ও ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার অধিকারী। অন্য কোন দেশের রাষ্ট্র-প্রধানের এরূপ সম্মান, প্রভাব ও ক্ষমতা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

ক্ষমতার দিক দিয়া ভারতের রাষ্ট্রপতি মার্কিণ রাষ্ট্রপতির তুলনীয় না হইলেও তাঁহার একটি বিশেষ পদমর্যাদা ও প্রভাব আছে। আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যাপারে তিনি মন্ত্রীসভাকে উপদেশ, নির্দেশ, সৎসাহস দান বা নিষেধ করিতে পারেন। প্রধানমন্ত্রী তাঁহার সহিত পরামর্শ না করিয়া কোন কার্য করিতে পারেন না। আইনসভায় যদি সরকারী দল ও বিরোধী দলের সংখ্যাধিক্যের পার্থক্য কম হয়, তাহা হইলে রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিগত ইচ্ছা প্রয়োগের ক্ষেত্র প্রশস্ত হয়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও ভারতের রাষ্ট্রপতি এ পর্যন্ত বিশেষ সম্মান ও প্রতিপত্তির অধিকারী হইয়াছেন। সুতরাং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির ন্যায় ভারতের রাষ্ট্রপতি দেশের একচ্ছত্র সম্রাট না হইলেও ভারতের শাসনব্যবস্থায় তিনি যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন তাহা অস্বীকার করা যায় না।

উপ-রাষ্ট্রপতি (The Vice-President)

শাসনতন্ত্রের বিধানানুযায়ী ভারত রাষ্ট্রের একজন উপ-রাষ্ট্রপতি থাকিবেন। উপ-রাষ্ট্রপতি পার্লামেণ্ট সভার উভয় পরিষদের যুক্ত অধিবেশনে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে একক হস্তান্তরযোগ্য ভোটপদ্ধতিতে গোপন ভোটে নির্বাচিত হইবেন। তাঁহার কার্যকালের স্থায়িত্ব পাঁচ বৎসরকাল। যদি উচ্চ পরিষদ্ কর্তৃক তাঁহার অপসারণের প্রস্তাব ভোটাধিক্যে গৃহীত হইয়া নিম্ন পরিষদ্ কর্তৃক অনুমোদিত হয়, তাহা হইলে উপ-রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ করা যাইতে পারে। উপ-রাষ্ট্রপতি-পদপ্রার্থীর প্রায় রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থীর অনুরূপ যোগ্যতা থাকা চাই। এতদ্ব্যতীত তাঁহাকে উচ্চ পরিষদের সদস্য পদপ্রার্থীর সমুদয় যোগ্যতার অধিকারী হইতে হইবে। উপ-রাষ্ট্রপতি স্বেচ্ছায় রাষ্ট্রপতির নিকট পদত্যাগপত্র দাখিল করিয়া কার্যভার ত্যাগ করিতে পারেন।

উপ-রাষ্ট্রপতি কোনরূপ লাভজনক কার্যে নিযুক্ত থাকিতে পারিবেন না। রাষ্ট্রপতির মৃত্যু ঘটিলে অথবা রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করিলে কিংবা অপসারিত হইলে, নূতন রাষ্ট্রপতির নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত উপ-রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতির স্থলাভিষিক্ত হইবেন। দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রপতির সাময়িক অবসর গ্রহণকালে অথবা অসুস্থতা-নিবন্ধন অথবা অন্য কারণে অনুপস্থিতিকালে উপ-রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতির স্থলাভিষিক্ত হইয়া রাষ্ট্রপতির পুনরুপস্থিতিকাল পর্যন্ত কার্য সম্পাদন করিবেন। সুতরাং রাষ্ট্রপতির সাময়িক অনুপস্থিতি অথবা রাষ্ট্রপতির মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করা ব্যতীত উপ-রাষ্ট্রপতির আর অন্য কোন কর্তব্য নাই। এইজন্য শাসনতন্ত্রের রচয়িতাগণ উপ-রাষ্ট্রপতির উপর রাজ্যসভার সভাপতিত্ব (Chairman of the Council of States) করিবার ভার অর্পণ করিয়াছেন। রাষ্ট্রপতির স্থলাভিষিক্ত হইলে তিনি রাষ্ট্রপতির জন্য নির্ধারিত বেতন পাইবেন। অন্য সময়ে রাজ্য পরিষদের সভাপতির বেতন পাইবেন।

মন্ত্রিপরিষদ্ (Council of Ministers)

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, নূতন সংবিধান ভারতে দায়িত্বশীল সরকার প্রবর্তিত করিয়াছে। এদিক দিয়া দেখিতে গেলে ইংলণ্ডের শাসনব্যবস্থার সহিত ভারতের শাসনব্যবস্থার নিকট-সম্পর্ক বিদ্যমান। এই শাসনব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, শাসনবিভাগ ও আইনবিভাগের মধ্যে ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান নীতি আদৌ প্রযুক্ত হয় নাই, পরন্তু এই উভয় বিভাগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক পরিদৃষ্ট হয়। এই শাসনব্যবস্থায় শাসনক্ষমতার প্রকৃত অধিকারী হইল মন্ত্রিপরিষদ্। আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হইয়া থাকেন এবং তাঁহার পরামর্শ অনুসারে রাজা বা রাষ্ট্রপতি সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হইতে মন্ত্রিপরিষদের অন্যান্য সদস্যগণকে নিযুক্ত করেন। মন্ত্রিপরিষদ্ যৌথভাবে আইনসভার বিশেষ করিয়া নিম্ন পরিষদের নিকট দায়ী থাকেন।

শাসনতন্ত্রের ৭৪ ধারা অনুসারে রাষ্ট্রপতিকে তাঁহার ক্ষমতা ও কার্য-পরিচালনা কার্যে পরামর্শ ও সাহায্য দান করিবার জন্য প্রধানমন্ত্রী সহ একটি মন্ত্রিপরিষদ বা কেবিনেট থাকিবে। পরবর্তী ধারায় বলা হইয়াছে যে, প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং অন্যান্য মন্ত্রিগণ প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন। মন্ত্রিগণ রাষ্ট্রপতির খুশীমত কালে বহাল থাকিবেন। মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিবার পূর্বে প্রত্যেক মন্ত্রীকে রাষ্ট্রপতির নিকট শপথ গ্রহণ করিতে হইবে। নিয়োগের সময় কোন মন্ত্রী আইনসভার সদস্য না থাকিতে পারেন, কিন্তু নিয়োগকালের ৬ মাসের মধ্যে আইনসভার সদস্য নির্বাচিত না হইতে পারিলে ৬ মাস অন্তে পদত্যাগ করিতে হইবে। মন্ত্রিগণ যৌথভাবে লোকসভার নিকট দায়ী থাকিবেন।

ভারতে তিন শ্রেণীর মন্ত্রী দেখিতে পাওয়া যায় এবং ইহাদের মধ্যে

যে পদমর্যাদা ও ক্ষমতার পার্থক্য আছে তাহা আইনানুমোদিত। প্রথম শ্রেণীর মন্ত্রিগণ হইলেন কেবিনেট মন্ত্রী (Cabinet Ministers)—মন্ত্রিগণের মধ্যে ইঁহারাই হইলেন কুলীন। দ্বিতীয় শ্রেণীতে আছেন রাষ্ট্রমন্ত্রিগণ (Ministers of State)—পদমর্যাদায় ইঁহারা কেবিনেট মন্ত্রিগণ অপেক্ষা হীন। সর্বনিম্ন শ্রেণীতে আছেন উপ-মন্ত্রিগণ (Deputy Ministers)। শেষোক্ত দুই শ্রেণীর মন্ত্রীর কেবিনেটে স্থান নাই। রাষ্ট্রমন্ত্রিগণ অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বসম্পন্ন দপ্তরগুলির ভার পাইয়া থাকেন এবং যোগ্যতা প্রমাণিত করিতে পারিলে কালক্রমে হয়ত কেবিনেট মন্ত্রিপদে উন্নীত হইতে পারেন। উপ-মন্ত্রীর কোন দপ্তর নাই। তিনি সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় মন্ত্রীর সহকারী হিসাবে কাজ করেন, কিন্তু তাঁহার কোন দায়িত্ব নাই।

১৯৫০ সালে মন্ত্রি-বেতন আইন সংশোধন হওয়ার ফলে মন্ত্রিগণের বেতন নিম্নলিখিত হারে ধার্য হইয়াছে। কেবিনেট মন্ত্রিগণ মাসিক ৩,০০০৲ টাকা বেতন ও ৫০০৲ টাকা অতিরিক্ত ভাতা পাইবেন। রাষ্ট্রমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রিগণ মাসিক যথাক্রমে ৩,০০০৲ টাকা ও ২,০০০৲ টাকা পাইবেন। ইহা ছাড়া, মন্ত্রিগণ বিনা ভাড়ায় আসবাবপত্র-সহ সুসজ্জিত আবাসগৃহ, পরিবার-সহ ভ্রমণ, চিকিৎসা প্রভৃতি নানাবিধ সুবিধা সরকারী খরচে পাইয়া থাকেন। তবে পার্লামেণ্টের সদস্য হিসাবে তাঁহারা আর পৃথক্ বেতন বা ভাতা পাইতে পারেন না।

ভারত সরকারের বিভিন্ন দপ্তর (Departments of the India Government)

ভারত সরকারের কার্য বর্তমানে ১৬টি বিভিন্ন বিভাগ দ্বারা সম্পাদিত হয়। প্রত্যেক বিভাগ একজন কেবিনেট মন্ত্রীর দ্বারা পরিচালিত হয়। বিভাগগুলি হইল : ১। প্রধানমন্ত্রীর অধীন বৈদেশিক ব্যাপার ও আণবিক শক্তি, ২। আভ্যন্তরীণ, ৩। অর্থ, ৪। তথ্য ও বেতার, ৫। শিল্প, ৬। রেলপথ, ৭। আইন ও সামাজিক নিরাপত্তা, ৮। প্রতিরক্ষা, ৯। ইস্পাত ও খনি, ১০। খাদ্য ও কৃষি, ১১। পেট্রোল ও রাসায়নিক দ্রব্য, ১২। পার্লামেণ্ট-সংক্রান্ত বিষয় ও যোগাযোগ, ১৩। সেচ ও শক্তি, ১৪। শিক্ষা, ১৫। শ্রম ও কর্মসংস্থান, ১৬। পুনর্বাসন।

শাসন পরিচালনা ব্যবস্থা (Administrative Organisation)

সকল দেশেই শাসন পরিচালনা কার্য করিবার জন্য মন্ত্রিগণ ব্যতীত অসংখ্য কর্মচারী থাকেন। মন্ত্রিগণ নির্ধারিত কার্যকালের জন্য স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকেন এবং তাঁহাদের প্রধান কর্তব্য হইল নীতি নির্ধারণ করা এবং এই কার্যের জন্য পার্লামেন্টারী শাসন ব্যবস্থায় তাঁহারা আইন সভার নিম্নকক্ষের নিকট দায়ী থাকেন। মন্ত্রিগণ-নির্ধারিত নীতি ও কার্যক্রম বাস্তবে রূপায়িত করিবার জন্য স্থায়ী কর্মচারীবৃন্দ থাকেন। ইহারা অভিজ্ঞ ও যোগ্যতার ভিত্তিতে নিযুক্ত হন। এই অভিজ্ঞ ও দক্ষ কর্মচারীবৃন্দের সাহায্যে মন্ত্রিগণ তাঁহাদের বিভাগীয় কার্য সম্পাদন করেন।

অন্যান্য দেশের শাসন ব্যবস্থার অনুরূপভাবে ভারত সরকারের কার্যও কম-বেশী কুড়িটি বিভাগ দ্বারা পরিচালিত হয়। প্রত্যেক বিভাগের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি হইলেন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী। মন্ত্রীকে সাহায্য করিবার জন্য অনেক ক্ষেত্রে একজন ডেপুটি মন্ত্রী থাকেন।

সুষ্ঠুভাবে সরকারী কার্য পরিচালনার উদ্দেশ্যে কার্য পরিচালনার কতকগুলি নিয়ম প্রস্তুত হয়। প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারে রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিগণের মধ্যে দপ্তর বণ্টন করেন। প্রত্যেক বিভাগের প্রধান হইলেন একজন কর্মসচিব Secretary)। বিভাগীয় কার্য বৃদ্ধি পাইলে বিভাগটিকে দুই বা ততোধিক উপবিভাগে ভাগ করিয়া প্রত্যেক উপবিভাগ একজন যুগ্ম কর্মসচিবের (Joint Secretary) অধীনে ন্যস্ত করা হয়। একটি দপ্তর নানা বিভাগ, উপবিভাগ ও শাখায় বিভক্ত হয় এবং প্রত্যেকটি শাখা একজন আণ্ডার সেক্রেটারি, ডেপুটি সেক্রেটারি প্রভৃতির হস্তে ন্যস্ত হয়।

মন্ত্রিপরিষদের কার্য ও ক্ষমতা (Powers and Functions of the Council of Ministers)

প্রধানমন্ত্রী হইলেন মন্ত্রিপরিষদের নেতা। তাঁহার সুপারিশক্রমেই রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অন্যান্য মন্ত্রিগণ নিযুক্ত হইয়া থাকেন। ভারতের মন্ত্রিপরিষদ্ সাধারণতঃ ১৫-২০ জন সদস্য লইয়া গঠিত হয়। মন্ত্রি-নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রীকে বিভিন্ন রাজ্য, বিভিন্ন সম্প্রদায় এবং সর্বোপরি দলীয় সংহতির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কাজ করিতে হয়। এ বিষয়ে তিনি যে সম্পূর্ণরূপে নিজ ইচ্ছামত কাজ করিতে পারেন তাহা বলা যায় না।

শাসনকার্য বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত থাকে এবং এক একজন মন্ত্রী একটি বা একাধিক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত থাকেন। প্রধানমন্ত্রী গুণ, যোগ্যতা, পূর্ব-অভিজ্ঞতা এবং দলীয় সংহতির ভিত্তিতে মন্ত্রিগণের মধ্যে দপ্তর বণ্টন করিয়া থাকেন।

মন্ত্রিপরিষদ্ই হইল দেশের সর্বোচ্চ শাসনসংস্থা। এই পরিষদ্ই শাসনব্যবস্থার সাধারণ নীতি নির্ধারণ করে। আভ্যন্তরীণ শাসন-নীতি ও বৈদেশিক সম্পর্ক স্থির করা মন্ত্রিপরিষদের গুরু দায়িত্ব। কোন্ বিদেশী রাষ্ট্রের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে হইবে, কোন্ রাষ্ট্রের নিকট হইতে সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে বা কোন্ রাষ্ট্রকে সাহায্য দিতে হইবে, কোন্ রাষ্ট্রের সহিত দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হইতে হইবে তাহা মন্ত্রিপরিষদ্ই স্থির করে। মন্ত্রিপরিষদ্ কর্তৃক এই আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি-নির্ধারণের উপর ভারতের সুখ-শান্তি ও ভবিষ্যৎ অনেক পরিমাণে নির্ভর করে।

জাতীয় জীবনের আর্থিক ক্ষেত্রেও মন্ত্রিপরিষদের প্রভাব অসীম। কর ধার্য করা, জাতীয় আয় যথাযথভাবে ব্যয় করা, ঋণ গ্রহণ ও ঋণ পরিশোধ প্রভৃতি আয়-ব্যয়-সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য মন্ত্রিপরিষদ্ পরিচালনা করে। অর্থ-সংক্রান্ত কোন প্রস্তাব কোন মন্ত্রী ব্যতীত পার্লামেণ্ট সভার কোন বে-সরকারী সদস্য উত্থাপন করিতে পারেন না। এইরূপে জাতীয় আয়-ব্যয় ক্ষেত্রে মন্ত্রিপরিষদ্ একচ্ছত্র কর্তৃত্বের অধিকারী।

এতদ্ব্যতীত মন্ত্রিপরিষদ্ আইন-প্রণয়নকার্য নিয়ন্ত্রণ করেন। পার্লামেণ্ট সভায় যে সমস্ত আইনের খসড়া উত্থাপিত হয়, তাহার অধিকাংশই মন্ত্রিগণ কর্তৃক পেশ করা হয়। মন্ত্রিগণ দলীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার বলে তাঁহাদের প্রস্তাবিত খসড়া আইনগুলি পাস করাইতে পারেন। মন্ত্রি-পরিষদের সমর্থন না থাকিলে কোন বে-সরকারী সদস্য-প্রস্তাবিত খসড়া আইন পাস হইতে পারে না। সুতরাং আইনপ্রণয়ন ব্যাপারেও মন্ত্রিপরিষদের ক্ষমতা অসীম বলা যাইতে পারে। এইরূপে ভারতের মন্ত্রিপরিষদ্ শাসননীতি নির্ধারণে, আয় ব্যয়-সংক্রান্ত ব্যাপারে ও আইনপ্রণয়ন ব্যাপারে বৃটিশ কেবিনেটের সম-ক্ষমতাসম্পন্ন।

মন্ত্রিপরিষদের বিভিন্ন সংস্থা (Committees of the Council of Ministers)

ভারতের মন্ত্রিসভা কয়েকটি বিভিন্ন সংস্থায় বিভক্ত এবং মন্ত্রিপরিষদের

কার্য এই সংস্থাগুলির পরামর্শ অনুসারে পরিচালিত হয়।" মন্ত্রিপরিষদে এইরূপ দশটি সংস্থা আছে, কিন্তু বিভিন্ন সংস্থার সদস্য-সংখ্যা সমান নহে। নিয়োগ সংস্থার-সংখ্যা হইল মাত্র তিন জন, অপরপক্ষে ভারী শিল্প সংস্থা ১২ জন সদস্য লইয়া গঠিত। সংস্থাগুলি হইল : ১। নিয়োগ সংস্থা (Appointment Committee), ২। ভারী শিল্প সংস্থা (Heavy Industry Committee), ৩। অর্থনৈতিক সংস্থা (Economic Committee), ৪। পুনর্বাসন সংস্থা (Rehabilitation Committee), ৫। জনশক্তি সংস্থা (Man Power Committee), ৬। তথ্য ও বেতার সংস্থা (Information and Broadcasting Committee), ৭। বিজ্ঞান-সংক্রান্ত সংস্থা (Scientific Committee), ৮। বৈদেশিক সম্পর্ক সংস্থা (Foreign Affairs Committee), ৯। প্রতিরক্ষা সংস্থা (Defence Committee) ও ১০। পার্লামেণ্ট ও আইন-সংক্রান্ত সংস্থা (Parliamentary and Legal Affairs Committee)। মন্ত্রিপরিষদের এই বিভিন্ন সংস্থাগুলি কার্যসূচী প্রণয়ন করে এবং মন্ত্রিপরিষদের বিবেচনার জন্য প্রস্তাব গঠন করে। অনেক সময় সংস্থাগুলি তাহাদের প্রস্তাব সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া মন্ত্রিপরিষদের নিকট প্রেরণ করে। সাধারণতঃ সংস্থাগুলি কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাব মন্ত্রিপরিষদ্ গ্রহণ করিয়া লয়। ইহার কারণ হইল যে, অধিকাংশ সংস্থাগুলির সভাপতি হইলেন প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং। প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী প্রভৃতি হইলেন এই সংস্থাগুলির সদস্য। সুতরাং নেতৃগণ কর্তৃক সংস্থার সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত মন্ত্রিপরিষদ্ একরূপ নির্বিচারে গ্রহণ করিয়া থাকে। এইরূপে মন্ত্রিপরিষদের এই বিভিন্ন সংস্থাগুলির ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়াছে, ফলে মন্ত্রিপরিষদের ক্ষমতা হ্রাস পাইয়াছে।

মন্ত্রিপরিষদের সহিত রাষ্ট্রপতির সম্পর্ক (Relation of the Council of Ministers to the President)

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, ভারতের নূতন সংবিধান রাষ্ট্রপতির হস্তে ব্যাপক ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছে। ক্ষমতাগুলির তালিকা দেখিলে স্বভাবতঃই রাষ্ট্রপতিকে স্বেচ্ছাচারী শাসকপ্রধান বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতির এই বিশাল ও বিস্তৃত ক্ষমতা মন্ত্রিপরিষদ্‌সহ প্রধানমন্ত্রীর উপদেশ ও পরামর্শ অনুযায়ী পরিচালিত হয়। সংবিধান অনুসারে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং অন্যান্য মন্ত্রীকে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শমত রাষ্ট্রপতিই

নিয়োগ করিবেন। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইলেও প্রধানমন্ত্রী ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রীর মতই স্ব-নির্বাচিত ব্যক্তি। কারণ, পার্লামেণ্ট সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের যিনি নেতা হইবেন তিনি ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি স্থায়ী মন্ত্রিসভা গঠন করিতে পারেন না। সুতরাং প্রধানমন্ত্রীর নিয়োগে ভারতের রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশের আদৌ কোন স্থান নাই। অন্যান্য মন্ত্রীর নিয়োগ ব্যাপারেও রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারেই পরিচালিত হইয়া থাকেন।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হইলেন রাষ্ট্রপতি। সংবিধান অনুসারে এই ক্ষমতাগুলি রাষ্ট্রপতিকে একটি মন্ত্রিপরিষদের সাহায্য ও পরামর্শ (Aid and Advice) অনুসারে পরিচালিত করিতে হয়। সুতরাং শাসন-সংক্রান্ত ব্যাপারে রাষ্ট্রপতিকে একটি মন্ত্রিপরিষদ্ রাখিতেই হইবে, এবং মন্ত্রিপরিষদ্ রাষ্ট্রপতির খুশীমত কার্যে বহাল থাকিবেন। সংবিধানে আরও বলা হইয়াছে যে, মন্ত্রিপরিষদ তাঁহাদের কার্যের জন্য যৌথভাবে লোকসভার নিকট দায়ী থাকিবেন। সুতরাং সংবিধানের এই ধারা হইতে সহজেই অনুমান করা যায় যে, ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনক্ষেত্রে একটি দায়িত্বশীল সরকার গঠন করাই হইল সংবিধানের মূল উদ্দেশ্য। এদিক দিয়া দেখিতে গেলে মন্ত্রিপরিষদ্‌কেই প্রকৃত শাসন-কর্তৃপক্ষ বলা ছাড়া উপায় নাই। রাষ্ট্রপতি হইলেন ইংলণ্ডের রাজার ন্যায় নিয়মতান্ত্রিক শাসকপ্রধান। তাঁহাব প্রভূত প্রভাব ও প্রতিপত্তি থাকিতে পারে, কিন্তু তিনি প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী নহেন। এতদ্ব্যতীত সংবিধানে রাষ্ট্রপতির কর্তব্য-সম্পর্কে উক্ত হইয়াছে যে, সংবিধানের সংরক্ষণ এবং সংবিধান অনুযায়ী কর্তব্যপালন করা হইল তাঁহার গুরু ও পবিত্র দায়িত্ব। রাষ্ট্রপতি যদি সংবিধান ভঙ্গ করেন অর্থাৎ সংবিধান অনুযায়ী তাঁহার ক্ষমতা প্রয়োগ না করেন, তাহা হইলে সংবিধান-ভঙ্গের অপরাধে পার্লামেণ্ট সভা কর্তৃক বিচারের পর তাঁহাকে পদচ্যুত করা যাইতে পারে।

উপরি-উক্ত আলোচনা হইলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, সংবিধান কর্তৃক নির্দিষ্টরূপে উল্লিখিত না হইলেও শাসন-পরিচালনার প্রায় সর্বক্ষেত্রেই রাষ্ট্রপতিকে মন্ত্রিপরিষদের সাহায্য ও পরামর্শ অনুসারে চলিতে হয়। আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতৃবর্গ দ্বারা গঠিত ও সংখ্যাগরিষ্ঠ দল কর্তৃক সমর্থিত মন্ত্রিপরিষদের সাহায্য ও পরামর্শ উপেক্ষা করা রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও পদমর্যাদার অনুকূল নহে।

মন্ত্রিপরিষদের সহিত প্রধানমন্ত্রীর সম্পর্ক (Relation of the Council of Ministers to the Prime Minister)

সাধারণ নির্বাচনের পর যে রাজনৈতিক দল আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে, সেই দলের নেতা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হইয়া থাকেন এবং প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশক্রমেই অন্যান্য মন্ত্রিগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে নিযুক্ত হন। সুতরাং মন্ত্রিগণের প্রকৃত নিয়োগকর্তা হইলেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রীর সমর্থন ব্যতীত কোন সদস্য মন্ত্রী নিযুক্ত হইতে পারেন না—সুতরাং প্রধানমন্ত্রীর উপর অন্যান্য মন্ত্রিগণ নির্ভরশীল। প্রধানমন্ত্রীই অন্যান্য মন্ত্রিগণের মধ্যে দপ্তর বণ্টন করিয়া দেন। বিভিন্ন মন্ত্রীর মধ্যে মতানৈক্য ঘটিলে প্রধানমন্ত্রীই মধ্যস্থতা করেন। তিনি শুধু দলের নেতা নহেন—মন্ত্রিপরিষদেরও নেতা। মন্ত্রিপরিষদের ঐক্য ও সংহতি তাঁহার নেতৃত্বেই রক্ষিত হয়। তিনি মন্ত্রিপরিষদের সভাপতি এবং সভাপতি হিসাবে বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করেন। পার্লামেণ্ট সভায় তিনি মন্ত্রিপরিষদ্ কর্তৃক নির্ধারিত নীতি সমর্থন করেন। কোন মন্ত্রী যদি প্রধানমন্ত্রীর সহিত একমত না হইতে পারেন তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে পদত্যাগ করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। তিনি পদত্যাগ করিতে অসম্মত হইলে প্রধানমন্ত্রী নিজে পদত্যাগ করিয়া মন্ত্রিপরিষদের পদত্যাগ ঘটাইতে পারেন এবং পরে বিরোধী মন্ত্রীকে বাদ দিয়া নূতন মন্ত্রিপরিষদ্ গঠন করিতে পারেন। সুতরাং অন্যান্য মন্ত্রিগণ প্রধানমন্ত্রীর উপর শুধু নির্ভরশীল নহেন, তাঁহারা প্রধানমন্ত্রীর নিকট দায়ীও বটে। অন্যান্য মন্ত্রিগণ প্রধানমন্ত্রীর সহকর্মী হইলেও প্রধানমন্ত্রীর শ্রেষ্ঠত্ব ও অগ্রাধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত।

মন্ত্রিপরিষদের সহিত সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর এই শ্রেষ্ঠত্ব ও অগ্রাধিকার অনেক পরিমাণে প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিত্বের উপর নির্ভর করে। ভারতের ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিত্ব দেশে ও বিদেশে এতই স্বীকৃত ছিল যে, তিনি মন্ত্রিপরিষদের অবিসংবাদী নেতা রূপে পরিগণিত হইতেন।

মন্ত্রিপরিষদের সহিত আইনসভার সম্পর্ক ও মন্ত্রিগণের দায়িত্ব (Relation of the Council of Ministers to the Legislature and Ministerial Responsibility)

মন্ত্রিপরিষদের সহিত আইনসভার সম্পর্কনির্ণয়ে ভারতের সংবিধানে বহুল পরিমাণে বৃটিশ শাসনব্যবস্থার অনুকরণ করা হইয়াছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে

যে, বৃটিশ শাসনব্যবস্থার অনুরূপভাবেই ভারতের শাসনব্যবস্থায় শাসনবিভাগ ও আইনবিভাগের মধ্যে ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান নীতি অবলম্বন করা হয় নাই। শাসনবিভাগ আইনসভার অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে গঠিত হইয়াছে। গ্রেট বৃটেনের মতই ভারতেও মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণকে আইনসভার যে-কোন কক্ষের সদস্য হইতে হয়, তবে ভারতে মনোনীত সদস্যের মন্ত্রিপরিষদের সদস্য হওয়ার একটি সম্ভাবনা আছে। আইনসভার সদস্য হিসাবে মন্ত্রিগণ সাধারণ ও অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাব উত্থাপন করিতে পারেন এবং দলীয় সমর্থনের সাহায্যে প্রস্তাবগুলিকে আইনে পরিণত করিতে পারেন। মন্ত্রিগণ পার্লামেন্টের উভয় পরিষদে উপস্থিত থাকিয়া পরিষদের কার্যে অংশ গ্রহণ করিতে পারেন, তবে তাঁহারা যে পরিষদের সদস্য সেই পরিষদ্ ব্যতীত অন্য পরিষদে ভোট দিতে পারেন না।

বৃটিশ শাসনব্যবস্থার মতই ভারতেও মন্ত্রিপরিষদ্ তাঁহাদের নীতি ও কার্যের জন্য যৌথভাবে আইনসভার নিকট দায়ী। যৌথ দায়িত্বের তাৎপর্য হইল যে, মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণকে অকুণ্ঠভাবে সমগ্র পরিষদ্ কর্তৃক নির্ধারিত নীতি ও কার্যসূচী সমর্থন করিতে হইবে। মন্ত্রিপরিষদের অভ্যন্তরে ব্যক্তিগতভাবে হয়ত একজন সদস্য মন্ত্রিপরিষদ্ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তের সহিত একমত না হইতে পারেন, কিন্তু পার্লামেন্টের সহিত বা জনমতের সহিত সম্পর্কে বিরুদ্ধ-মতাবলম্বী মন্ত্রী তাঁহার বক্তৃতা বা ভোট দ্বারা কখনই সমগ্র মন্ত্রিপরিষদ্ কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাবের বিরোধিতা করিতে পারিবেন না। আইন-সভার সহিত সম্পর্কে মন্ত্রিপরিষদ্ একটি একক ও অবিভাজ্য সংস্থা হিসাবে কার্য পরিচালনা করে। আইনসভা যদি কোন একজন মন্ত্রীর কার্যে অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাস করে, অথবা কোন মন্ত্রী কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাব আইনসভায় সংখ্যাধিক্যের ভোটে অনুমোদিত না হয়, তাহা হইলে এই একজন মন্ত্রীর পরাজয় সমগ্র মন্ত্রিপরিষদের পরাজয় বলিয়া বিবেচিত হয় ও মন্ত্রিপরিষদ একসঙ্গে পদত্যাগ করে। আইনসভার সদস্যগণ প্রশ্নোত্তরের দ্বারা, মন্ত্রিসভার কার্যের সমালোচনা দ্বারা ও শেষ পর্যন্ত মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাস করিয়া মন্ত্রিসভার কার্য নিয়ন্ত্রণ করিতে পারেন।

আইনসভার নিকট বিশেষ করিয়া নিম্ন পরিষদের নিকট মন্ত্রিপরিষদের এই যৌথ দায়িত্ব, বৃটিশ শাসনব্যবস্থা হইতে গৃহীত হইলেও একটি বিষয়ে ভারতে মন্ত্রিপরিষদের এই যৌথ দায়িত্বনীতি বৃটিশ ব্যবস্থা হইতে পৃথক। গ্রেট বৃটেনে কমন্স সভার নিকট কেবিনেটের দায়িত্ব প্রথাগত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, আর

ভারতে মন্ত্রিপরিষদের লোকসভার নিকট এই দায়িত্ব সংবিধান্ কর্তৃক বলবৎ করা হইয়াছে। কিন্তু এস্থলে একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যদি কোন মন্ত্রী তাঁহার ব্যক্তিগত অযোগ্যতা, অসদাচরণ বা কু-শাসনের ফলে অপ্রিয় হন তাহা হইলে এই মন্ত্রিবিশেষের ব্যক্তিগত ত্রুটির জন্য সমগ্র মন্ত্রিসভা দায়ী হইতে পারে না। এরূপ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহাশয়কেই এককভাবে পদত্যাগ করিতে হয়। সংবিধান কর্তৃক দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হইলেও গ্রেট বৃটেনের অনুরূপভাবেই ভারতেও মন্ত্রিপরিষদের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। কি সাধারণ আইনপ্রণয়ন ব্যাপারে, কি অর্থ-সংক্রান্ত ব্যাপারে মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণের উদ্যোগেই শাসনকার্য পরিচালিত হয়। সত্য বটে যে, পার্লামেণ্ট সভার বে-সরকারী সদস্যগণও আইন প্রণয়নের প্রস্তাব উত্থাপন করিতে পারেন, কিন্তু মন্ত্রিপরিষদের সমর্থন না থাকিলে বে-সরকারী সদস্য কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাব আইনে পরিণত হওয়া একান্ত দুরূহ ব্যাপার। আয়ব্যয়-সংক্রান্ত ব্যাপারে আইনসভা বিশেষ করিয়া লোকসভা মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্তগুলি নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে বলিয়া মনে হয়, কিন্তু একটু প্রণিধানপূর্বক দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, আয়-ব্যয়ের উপর লোকসভার এই নিয়ন্ত্রণক্ষমতাও নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ।

শাসনব্যবস্থ উপর মন্ত্রিপরিষদের এই অখণ্ড ও অবিমিশ্র আধিপত্যের মূল কারণ হইল দলীয় শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন। আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রধানগণ মন্ত্রিপরিষদ্ গঠন করিয়া তাঁহাদের নির্ধারিত নীতি ও কার্যসূচী আইনসভায় তাঁহাদের সমর্থকগণের দ্বারা অনুমোদিত করিয়া লইয়া থাকেন। দলের সমর্থকগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিশেষ বিচার-বিবেচনা না করিয়া একরূপ অন্ধভাবেই দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের নির্দেশ পালন করেন। ভারতে মন্ত্রিপরিষদের এ-বিষয়ে একটি বিশেষ সুবিধা আছে। আইনসভার উভয় কক্ষেই সরকারী দলের আপেক্ষিক সংখ্যাধিক্য এত অধিক যে, আইনসভায় পরাজয় বরণ করা দূরের কথা—একমাত্র মৌখিক বিরোধিতা ব্যতীত মন্ত্রিপরিষদের কোন সক্রিয় বিরোধিতার সম্মুখীন হইবার আশঙ্কাও নাই। এরূপ অবস্থায় মন্ত্রিপরিষদ্ অনায়াসেই দলীয় সমর্থন-পুষ্ট হইয়া অবাধে তাঁহাদের কার্যসূচীকে রূপদান করিতে পারেন। দলীয় সমর্থন পাইতেও মন্ত্রিপরিষদের কোন অসুবিধা হয় না। দলীয় নিয়ম অনুযায়ী দলের কোন সমর্থক যদি দলীয় নীতি ও কার্যসূচীর বিরোধিতা করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে দল হইতে বহিষ্কৃত হইতে হয়।

দল হইতে বহিষ্কৃত হইবার ফলে তাহার সদস্যপদ-চ্যুতির সম্ভাবনা থাকে। সেইসঙ্গে সদস্যপদের বেতন ও ভাতা হইতে তিনি বঞ্চিত হন। দলীয় নীতির বিরোধিতা করিলে প্রধানমন্ত্রী আইনসভা ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দান করিতে পারেন। আইনসভা ভাঙ্গিয়া দিলে সদস্যগণের উপর তাহার সুদূরপ্রসারী ফল দেখিতে পাওয়া যায়। সদস্যগণ তাঁহাদের সদস্যপদচ্যুত হইয়া বেতন ও ভাতা হইতে বঞ্চিত হন। পরবর্তী নির্বাচনকালে দলীয় মনোনয়ন, প্রচারকার্য ও দলীয় অর্থদ্বারা সাহায্য প্রাপ্ত না হইলে বর্তমানে সার্বজনীন ভোটাধিকার ভিত্তিতে গঠিত অতিকায় নির্বাচন-কেন্দ্র হইতে একক-ভাবে নির্বাচিত হওয়া একরূপ অসম্ভব। উল্লিখিত কারণগুলির সমবায়ে ভারতেও গ্রেট বৃটেনের মত মন্ত্রিপরিষদের প্রাধান্য শাসনক্ষেত্রের সর্বত্রই পরিলক্ষিত হয়। আইনসম্মত ক্ষমতার অধিকারী হইয়াও আইনসভা মন্ত্রিপরিষদ্ কর্তৃক পরিচালিত হয়।

প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা ও পদমর্যাদা (Position and Influence of the Prime Minister)

ভারতের প্রধানমন্ত্রীর পদ শাসনতান্ত্রিক আইনের উপর প্রতিষ্ঠিত। শাসন-তন্ত্রে স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ আছে যে, রাষ্ট্রপতিকে শাসনকার্যে সাহায্য ও পরামর্শ দান করিবার জন্য একজন প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি মন্ত্রিপরিষদ্ থাকিবে। প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন। পার্লামেণ্ট সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে রাষ্ট্রপতির পক্ষে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। এ বিষয়ে রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা অনিচ্ছা কার্যকরী করা সম্ভব নয়। সুতরাং প্রধানমন্ত্রী সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতৃত্বের বলেই নিযুক্ত হইয়া থাকেন। সাধারণতঃ পার্লামেণ্ট সভার নির্বাচিত সদস্যগণের মধ্য হইতে একজন প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হইয়া থাকেন। তবে ভারতের সংবিধানে পার্লামেণ্ট সভায় রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত সদস্য নিযুক্ত করিবার বিধান থাকার ফলে মনোনীত সদস্যের প্রধানমন্ত্রী-পদে নিযুক্ত হইবার একটা সুদূর সম্ভাবনা দেখিতে পাওয়া যায়।

নূতন শাসনতন্ত্রের বিধানানুযায়ী কার্যতঃ ভারতের প্রধানমন্ত্রী হইলেন শাসকপ্রধান " ভারতের প্রধানমন্ত্রী-পদের গুরুত্ব ও মর্যাদা সম্পর্কে ধারণা করিতে হইলে প্রধানমন্ত্রী শাসনব্যবস্থার বিভিন্ন ক্ষেত্রে কি ভূমিকা গ্রহণ করেন তাহা জানা আবশ্যক।

প্রথমতঃ, ভারতের প্রধানমন্ত্রী হইলেন মন্ত্রিপরিষদের সভাপতি ও পরিচালক। অন্যান্য মন্ত্রিগণ প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া থাকেন। অন্যান্য মন্ত্রিগণের নিয়োগব্যাপারে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর যতটা স্বাধীনতা আছে, বৃটেনের প্রধানমন্ত্রীর ততটা স্বাধীনতা নাই। বৃটেনের প্রধানমন্ত্রীর মন্ত্রিনিয়োগ ব্যাপারে অনেক বিষয় চিন্তা করিতে হয়, কিন্তু ভারতের প্রধানমন্ত্রী এ বিষয়ে অনেকটা ব্যক্তিগত ইচ্ছা দ্বারা পরিচালিত হইতে পারেন। তিনি শুধু মন্ত্রি-পরিষদের সভাপতি নহেন, মন্ত্রিপরিষদ্‌কে পরিচালিত করা তাঁহার অন্যতম দায়িত্ব। সহকর্মিগণকে তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও যুক্তির প্রভাবে স্বমতে আনয়ন করিতে হয়। যদি কোন মন্ত্রী তাঁহার মত গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হন, তাহা হইলে তিনি তাঁহাকে পদত্যাগে বাধ্য করিতে পারেন। প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তাঁহার দায়িত্ব বৃটেনের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব অপেক্ষাও গুরুতর। বৃটেনের প্রধান-মন্ত্রী কোন নির্দিষ্ট সরকারী দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত নহেন। তিনি সাধারণতঃ সকল দপ্তরের কার্যের মধ্যে সমন্বয়সাধন করেন এবং সকল দপ্তরগুলির কার্যের তদারক করেন। কিন্তু ভারতের প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন দপ্তরগুলির কার্যের তদারক করা ব্যতীতও একটি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসাবে তিনি আইনসভারও নেতা। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসাবে তাঁহাকে দলের সংহতি ও মর্যাদা রক্ষা করিতে হয়। এইজন্য তাঁহাকে জনসাধারণের সংস্পর্শে আসিয়া জনমতকে নিয়ন্ত্রণ করিতে হয়। তাঁহার প্রধানমন্ত্রীত্ব, দলীয় নেতৃত্ব প্রভৃতি সকল কিছুই তাঁহার জনপ্রিয়তার উপর নির্ভর করে। পার্লামেণ্ট সভায় তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নীতি সমর্থন করেন এবং বিরোধী দলগুলির সমালোচনার উত্তর প্রদান করেন। তবে এ বিষয়েও ভারতের প্রধানমন্ত্রী বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী অপেক্ষা অধিকতর সুবিধার অধিকারী। ভারতে এখনও পর্যন্ত শক্তিশালী বিরোধী কোন দল নাই বলিলেও চলে। যে দলগুলি বিরোধিতা করে তাহারা সংখ্যায় এত অল্প যে, ক্ষমতায় আসীন দলের কখনই সংখ্যাধিক্যের বিরুদ্ধে ভোটে ক্ষমতাচ্যুত হইবার আদৌ কোন আশঙ্কা নাই।

রাষ্ট্রপতির প্রধান পরামর্শদাতা হইলেন প্রধানমন্ত্রী এবং তিনিই হইলেন রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রিপরিষদের মধ্যে যোগসূত্র। ভারতের সংবিধান রাষ্ট্রপতির হস্তে যে ব্যাপক ক্ষমতা প্রদান করিয়াছে, কার্যতঃ সে সমুদয় ক্ষমতাই প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী পরিচালিত হয়। সুতরাং কি যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনপরিচালনা, কি রাজ্যশাসন-পরিচালনা—সর্বক্ষেত্রেই প্রধানমন্ত্রীর প্রাধান্য সূচিত হয়। এক

কথায় বলা চলে যে, শিশুরাষ্ট্র ভারতের ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণরূপে তাহার প্রধানমন্ত্রীর বিচারবুদ্ধি ও কর্মক্ষমতার উপর নির্ভর করে। ভারতের প্রধানমন্ত্রিগণ তাঁহাদের পদের যে ঐতিহ্য গড়িয়া তুলিবেন, প্রধানমন্ত্রী-পদের ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণরূপে তাহার উপর নির্ভর করে।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী (The Prime Minister of India and the British Prime Minister)

ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সহিত একমাত্র বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর তুলনা করা যাইতে পারে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী হইলেন বিভিন্ন ভাষা-ভাষী ও বিভিন্ন ধর্মমতাবলম্বী বহুজাতি-অধ্যুষিত এই বিশাল রাষ্ট্রের কর্ণধার। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ভারতের মত বিশাল দেশের কর্ণধার না হইলেও কমনওয়েল্‌থভুক্ত দেশগুলির প্রকৃত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন এবং এইজন্য বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী-পদের একটা বিশিষ্ট পদমর্যাদা ও প্রতিপত্তি আছে। এই উভয় পদের সাদৃশ্যের মূলগত কারণ হইল যে, উভয় রাষ্ট্রে পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত আছে। নূতন শাসনতন্ত্র অনুসারে ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হইলেও ভারতে বৃটেনের অনুরূপ দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং উভয় দেশে একজন করিয়া নিয়মতান্ত্রিক শাসকপ্রধান (রাজা ও নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি) থাকিলেও উভয় দেশের প্রকৃত শাসক ও জনগণের নেতা হইলেন মন্ত্রীপরিষদসহ প্রধানমন্ত্রী।

উভয় দেশের প্রধানমন্ত্রী সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজনৈতিক দলের প্রধান নেতা হিসাবে রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক প্রধানমন্ত্রী-পদে নিযুক্ত হইয়া থাকেন এবং যতদিন পর্যন্ত আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের আস্থাভাজন থাকেন ততদিন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকিয়া শাসনকার্য পরিচালনা করেন। প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশক্রমে বৃটেনের রাজা ও ভারতের রাষ্ট্রপতি অন্যান্য মন্ত্রিগণকে নিযুক্ত করেন।

বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী হইলেন রাজার প্রধান পরামর্শদাতা। তিনিই মন্ত্রী-সংসদের মুখপাত্র হিসাবে রাজাকে শাসন-সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় জ্ঞাত করান। রাজা প্রধানমন্ত্রীর মারফত মন্ত্রিসংসদকে উপদেশ দিতে পারেন বা কার্যে উৎসাহিত করিতে পারেন বা নিষেধ করিতে পারেন। কিন্তু রাজার আদেশ ও নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর উপর বাধ্যতামূলক নহে। প্রধানমন্ত্রী নামমাত্র রাজার নিকট দায়ী। ভারতের প্রধানমন্ত্রীও অনুরূপভাবে ভারতের রাষ্ট্রপতির প্রধান পরামর্শদাতা। তিনিই রাষ্ট্রপতিকে মন্ত্রীসংসদের সিদ্ধান্ত জ্ঞাত করান এবং রাষ্ট্র-

পতি শাসন-সংক্রান্ত ও আইন-প্রণয়ন বিষয়ে যে সমস্ত তথ্য জ্ঞাত হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রীকে সেই সমস্ত তথ্য এবং কোনও মন্ত্রিবিশেষের একক সিদ্ধান্ত রাষ্ট্রপতির গোচরীভূত করিতে হয়। সুতরাং ভারতেও শাসন-সংক্রান্ত ব্যাপারে রাষ্ট্রপতির সহিত সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিসংসদের একমাত্র মুখপাত্র না হইলেও প্রধান মুখপাত্র হিসাবে পরিগণিত হইয়া থাকেন। কিন্তু এস্থলে একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ভারতে রাষ্ট্রপতির সহিত প্রধানমন্ত্রীর তথা মন্ত্রিসংসদের সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে শাসনতন্ত্র দ্বারা নির্ধারিত হইয়াছে—বৃটেনে রাজার সহিত প্রধানমন্ত্রীর তথা মন্ত্রীসংসদের সম্পর্ক প্রধানতঃ প্রথাগত বিধানের উপর (Convention) প্রতিষ্ঠিত।

বৃটেনের প্রধানমন্ত্রীর ন্যায় ভারতের প্রধানমন্ত্রীও দলের নেতা হিসাবে তাঁহার অন্যান্য কেবিনেট সহকর্মিগণকে মনোনীত করেন এবং তিনিই মন্ত্রিসংসদের সভায় সভাপতিত্ব করেন। বৃটেনের প্রধানমন্ত্রীর ন্যায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী তাঁহার অন্যান্য সহকর্মিগণের সমপর্যায়ভুক্ত হইলেও তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব ও অগ্রাধিকার সর্বত্র স্বীকৃত হয়। দলের নেতা হিসাবে উভয় রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিসংসদের ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখেন। বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী কোন নির্দিষ্ট দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত নহেন। তিনি সমস্ত শাসনবিভাগের কাযের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করেন ও সমস্ত বিভাগের কাযের তদারক করেন। পার্লামেণ্ট সভায় তিনি দলের মুখপাত্র হিসাবে দলীয় নীতি সমর্থন করেন। তাঁহার কোন সহকর্মীর সহিত মতানৈক্য ঘটিলে প্রধানমন্ত্রী তাঁহার ব্যক্তিগত প্রভাব দ্বারা বিরুদ্ধ মতাবলম্বী মন্ত্রীকে স্বমতে আনয়ন করিতে পারেন অথবা তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে বাধ্য করিতে পারেন। কেবিনেট ও পার্লামেণ্ট সভার সহিত সম্পর্কে ভারতের প্রধানমন্ত্রীও অনুরূপ ক্ষমতার অধিকারী। তবে পার্থক্য হইল যে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী সমস্ত বিভাগগুলির তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করা ব্যতীতও একটি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী।

উভয় দেশের প্রধানমন্ত্রীকেই ভোটদাতৃগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া আইন-সভার সদস্য হইতে হয়। বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী'র ক্ষেত্রে নিম্ন কক্ষ অর্থাৎ কমন্স সভার সদস্য হইতেই হইবে, কিন্তু ভারতের শাসনতন্ত্রে এরূপ কোন নির্দিষ্ট নিয়ম না থাকিলেও বলা যাইতে পারে যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের তথা সমগ্র দেশের নেতা হিসাবে ভারতের প্রধানমন্ত্রীও লোকসভার সদস্য হইবেন। ইহার কারণ হইল যে, শাসনতন্ত্র অনুসারে মন্ত্রীসংসদ্ লোকসভার নিকট দায়ী, সুতরাং লোকসভার

সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা ও কেবিনেট সভার সভাপতি হিসাবে প্রধানমন্ত্রীকে প্রধানতঃ লোকসভায় তাঁহার দলীয় নীতি ও কার্যক্রম সমর্থন করিতে হয়। ইহা হইতে সহজে অনুমান করা যায় যে, উভয় দেশের প্রধানমন্ত্রী শুধু নিম্ন-কক্ষ দ্বারা তাঁহাদের দলীয় নীতি সমর্থিত হইলে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকিতে পারেন না, এইজন্য তাঁহাদের জনমতের সমর্থনপুষ্ট হওয়া একান্ত আবশ্যক। আইনসভার সহিত মতানৈক্য ঘটিলে বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী যেরূপ রাজাকে কমন্স সভা ভাঙ্গিয়া দিয়া পুনর্নির্বাচনের পরামর্শ দান করিতে পারেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রীও তদ্রূপ রাষ্ট্রপতিকে লোকসভা ভাঙ্গিয়া দিবার পরামর্শ দিতে পারেন। এরূপক্ষেত্রে উভয়েরই নেতৃত্ব পুনর্নির্বাচনের ফলের উপর নির্ভর করে। সুতরাং উভয়কেই আইনসভার সমর্থন ব্যতীতও জনমতের উপর নির্ভর করিতে হয়। জনমতের সংস্পর্শে আসিয়া জনমত নিয়ন্ত্রণ করাও উভয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যকালের স্থায়িত্বের অন্যতম প্রধান কারণ। আইনসভার সহিত সম্পর্কে উভয় প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে একটি পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ভারতের প্রধানমন্ত্রী লোকসভার সদস্য হইলেও রাজ্যসভায় উপস্থিত থাকিয়া বিতর্কে যোগদান করিতে পারেন, কিন্তু বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী লর্ড সভায় উপস্থিত থাকিতে পারেন না।

কয়েকটি বিষয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী বিশেষ সুবিধার অধিকারী। মন্ত্রি-সংসদের অন্যান্য সদস্য মনোনয়ন ব্যাপারে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর অনেক কিছু চিন্তা করিতে হয়। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ও বিভিন্ন স্বার্থের এবং স্ব-দলীয় নেতৃবর্গের অগ্রাধিকার বিবেচনা করিয়া কেবিনেট সদস্য মনোনীত করিতে হয়। ভারতের প্রধানমন্ত্রী এ-বিষয়ে অপেক্ষাকৃত স্বাধীন। তাহার কারণ ভারতের দলীয় সংগঠনগুলি সম্পূর্ণরূপে নেতার উপর নির্ভরশীল এবং দেশের বিভিন্ন ভৌগোলিক বিভাগগুলি সম-রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন নহে। এইজন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী অধিকতর স্বাধীনভাবে তাঁহার সহকর্মী মনোনয়ন করিতে পারেন।

দ্বিতীয়তঃ, বৃটেনে প্রধানতঃ দুইটি রাজনৈতিক দল থাকার ফলে সংখ্যা-গরিষ্ঠ দল ও সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের মধ্যে ভোটের ব্যবধান অতি সামান্য থাকে। এইজন্য প্রধানমন্ত্রীকে সর্বদাই বিরোধী দলের সহিত সহযোগিতামূলক মনোভাব লইয়া কাজ করিতে হয়। বিরোধী দলের মতামত তিনি সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিতে পারেন না। কিন্তু ভারতে ক্ষমতায় আসীন কংগ্রেসদল আইনসভায় অন্যান্য দল অপেক্ষা সংখ্যায় এত গরিষ্ঠ যে, প্রধানমন্ত্রী সংখ্যালঘিষ্ঠ দলগুলির

মতামতের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ না করিতেও পারেন। সংখ্যালঘিষ্ঠ দলগুলির একত্রিত ভোটেও কংগ্রেসদলের পরাজয় ঘটিতে পারে না।

তৃতীয়তঃ, বৃটেনের জনমত অধিকতর রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন, সদাজাগ্রত ও সচেতন বলিয়া প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে জনমত উপেক্ষা করা সম্ভব নয়, কিন্তু ভারতের ন্যায় অনগ্রসর রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন দেশে প্রধানমন্ত্রী তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রভাব বিস্তার করিয়া জনমতকে সহজেই স্বমতে আনয়ন করিতে পারেন। ভারতের জনমত প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশের উপর নির্ভরশীল।

পরিশেষে বলা যায় যে, উভয় দেশের প্রধানমন্ত্রী হইলেন দেশের ভাগ্য-নিয়ন্তা। আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধন প্রধানমন্ত্রীর আভ্যন্তরীণ শাসননীতি নির্ধারণের উপর নির্ভর করে। উভয় দেশের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা এবং প্রভাব-প্রতিপত্তির প্রধান ক্ষেত্র হইল পররাষ্ট্র-নীতি নির্ধারণে। পররাষ্ট্র-নীতি ও বিশেষ করিয়া জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের সহিত সম্পর্ক নির্ধারণ করিয়া প্রধানমন্ত্রী দেশের ভবিষ্যৎ গড়িতে পারেন অথবা দেশের ভবিষ্যৎ নষ্ট করিতে পারেন। এদিক দিয়া দেখিতে গেলে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং কর্মঠ না হইলেও তিনি একটি অতি-প্রাচীন রাজনৈতিক ঐতিহ্যের অধিকারী। বৃটেনের এই গৌরবময় ঐতিহ্যই তাহার প্রধানমন্ত্রীকে কার্যে অনুপ্রেরণা যোগায় —কিন্তু ভারত শিশুরাষ্ট্র, তাহার আধুনিককালের কোন রাজনৈতিক ঐতিহ্য না থাকিলেও অতি অল্পকালের মধ্যে পররাষ্ট্র-নীতি নির্ধারণে ভারতের জনগণের অবিসংবাদী নেতা ও প্রধানমন্ত্রী যে ঐতিহ্য গড়িয়া তুলিয়াছেন তাহা দ্বারা ভারত আজ সমগ্র জগতের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

ভারতের মহা-ব্যবহারিক—The Attorney-General for India

প্রত্যেক সরকারেরই আইন সম্পর্কে একজন শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ উপদেষ্টা থাকেন। ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইন অনুসারে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের জন্য একজন এ্যাড্ভোকেট-জেনারেল (Advocate-General) নিযুক্ত হন। ভারতের নূতন শাসনতন্ত্র অনুসারে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের জন্য একজন এ্যাটর্নি-জেনারেলের পদ সৃষ্ট হইয়াছে। এ্যাটর্নি-জেনারেল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন এবং রাষ্ট্রপতির খুশীমত কার্যে বহাল থাকেন। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতির যোগ্যতা-সম্পন্ন ব্যক্তিকেই এ্যাটর্নি-জেনারেল নিযুক্ত করা হয়। এ্যাটর্নি-জেনারেলের

যোগ্যতা হইল যে, তাঁহাকে অবশ্যই ভারতীয় নাগরিক হইতে হইবে এবং অন্ততঃ পাঁচ বৎসরকাল কোন ভারতীয় হাইকোর্টে বিচারপতির কাজ করিয়াছেন, অথবা দশ বৎসরকাল কোন হাইকোর্টে এ্যাড্‌ভোকেটরূপে কাজ করিয়াছেন অথবা রাষ্ট্রপতির মতে বিশিষ্ট আইনজ্ঞ হইতে হইবে। এই পদের নিয়োগ ব্যাপারে বয়স সম্পর্কে কোন নির্ধারিত সীমা নাই। রাষ্ট্রপতির নির্ধারিত নিয়ম অনুসারে বর্তমানে তিনি মাসিক ৪ হাজার টাকা বেতন পাইয়া থাকেন।

এ্যাটর্নি-জেনারেলের প্রধান কার্য হইল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্ধারিত বিষয়-সমূহ সম্পর্কে ও অন্যান্য আইন সম্পর্কে ভারত সরকারকে পরামর্শ দান করা। এতদ্ব্যতীত সংবিধানে বর্ণিত ও অন্যান্য আইন দ্বারা স্থিরীকৃত কতকগুলি কর্তব্য তাঁহাকে সম্পাদন করিতে হয়।

এ্যাটর্নি-জেনারেলের কার্য সাধারণতঃ চারভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমতঃ, সুপ্রিম কোর্টে ভারত সরকারের যে সমস্ত মামলা হয়, সেই মামলাগুলি তাঁহাকেই পরিচালনা করিতে হয়। এদিক দিয়া দেখিতে গেলে তাঁহাকে ভারতের প্রধান উকিল সরকার বলা যাইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রপতি যে সমস্ত বিষয় বা তথ্য সম্পর্কে সুপ্রিম কোর্টের মতামত জানিতে ইচ্ছুক হন, সে সমস্ত ক্ষেত্রে তিনি ভারত সরকারের মুখপাত্র হিসাবে কাজ করেন। তৃতীয়তঃ, সংবিধান বা অন্য আইন কর্তৃক তাঁহার উপর ন্যস্ত কর্তব্য তাঁহাকে সম্পাদন করিতে হয়। চতুর্থতঃ, যে ক্ষেত্রে ভারত সরকার আইনসংক্রান্ত বিষয়ে তাঁহার অভিমত চাহিয়া পাঠান, সেই সমস্ত বিষয় সম্পর্কে তাঁহাকে পরামর্শ দিতে হয়।

এ্যাটর্নি-জেনারেল ভারতে আইন-সংক্রান্ত বিষয়ে সর্বোচ্চ কর্মচারী হিসাবে ভারতের যে কোন রাজ্য বিচারালয়ে উপস্থিত হইয়া তাঁহার বক্তব্য পেশ করিতে পারেন এবং সকল বিচারালয়গুলিই তাঁহার বক্তব্য শুনিতে বাধ্য। তিনি পার্লামেণ্ট সভার কোন পরিষদের সদস্য না হইলেও যে কোন পরিষদে বা উভয়ের যুক্ত অধিবেশনে যোগদান করিয়া তাঁহার বক্তব্য পেশ করিতে পারেন, কিন্তু ভোট দিতে পারেন না।

ভারতের এ্যাটর্নি-জেনারেল পদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। এই পদে নিয়োগ রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত। ইংলণ্ডে এ্যাটর্নি-জেনারেলের পদে নির্বাচনে জয়ী সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের অভিজ্ঞ আইনজীবীদের মধ্য হইতে একজন নিযুক্ত হন। তিনি কমন্স সভার সদস্য এবং অনেক সময় তাঁহাকে কেবিনেটের সদস্যও করা

হয়। এই কারণে দলীয় সরকারের পরিবর্তন ঘটিলেই এ্যাটর্নি-জেনারেলও পরিবর্তিত হন। কিন্তু ভারতের এ্যাটর্নি-জেনারেল দল-নিরপেক্ষ কর্মচারী। তিনি পার্লামেণ্টের কোন কক্ষের বা কেবিনেটের সদস্য হইতে পারেন না। আর একটি বিষয়েও উভয় পদের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। ইংলণ্ডের এ্যাটর্নি-জেনারেল সরকারী কাজের অবসরে ব্যক্তিগতভাবে ওকালতি করিতে পারেন না, কিন্তু ভারতের এ্যাটর্নি-জেনারেলের পক্ষে এক সরকারী স্বার্থের বিরুদ্ধে ব্যতীত অন্য ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে ওকালতি করিবার কোন বাধা নাই।

ভারতের প্রধান হিসাব-পরীক্ষক—Comptroller and Auditor-General of India

শাসনতন্ত্রের ১৪৮ ধারায় বলা হইয়াছে যে, রাষ্ট্রপতি একজন প্রধান হিসাব-পরীক্ষক নিযুক্ত করিবেন। তাঁহার বেতন ও কার্যের শর্ত পার্লামেণ্ট আইন প্রণয়ন করিয়া স্থির করিবে। নিয়োগের পর তাঁহার বেতন, ছুটি, পেন্সন বা অবসর গ্রহণের বয়স তাঁহার অসুবিধা করিয়া পরিবর্তন করা যাইবে না। তাঁহার নিজের বেতন, অন্যান্য খরচ এবং তাঁহার দপ্তর পরিচালনার খরচ পার্লামেণ্টের সভার বাৎসরিক অনুমোদনসাপেক্ষ নহে। পার্লামেণ্ট কর্তৃক নির্ধারিত ভারত সরকারের, রাজ্য সরকারগুলির এবং অন্য কোন সংস্থার আয়-ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা করা হইল তাঁহার কর্তব্য এবং এজন্য রাষ্ট্রপতির সম্মতিক্রমে প্রধান হিসাব-পরীক্ষক কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির হিসাব একটি নির্ধারিত পদ্ধতিতে রাখিবার নিদেশ দান করিতে পারেন। প্রধান হিসাব-পরীক্ষক কেন্দ্রীয় সরকারের হিসাব সম্পর্কে রাষ্ট্রপতির নিকট বিবরণী পেশ করেন এবং সেই বিবরণী রাষ্ট্রপতি পার্লামেণ্টের প্রত্যেক কক্ষে উপস্থাপিত করান। প্রত্যেক রাজ্য সরকারের হিসাবও রাজ্যপালের নিকট পেশ করা হয় এবং রাজ্যপাল তাহা রাজ্যে আইনসভায় পেশ করাইবার ব্যবস্থা করেন।

প্রধান হিসাব-পরীক্ষকের কার্য নিম্নলিখিতভাবে বর্ণনা করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, যুক্তরাষ্ট্রীয় ও রাজ্য সরকার সম্পর্কিত হিসাব কিভাবে রক্ষিত হইবে তাহা তিনি স্থির করেন। দ্বিতীয়তঃ, তিনিই বাৎসরিক সরকারী হিসাব প্রস্তুত করিয়া সংশ্লিষ্ট সরকারের নিকট উহা পেশ করেন। তৃতীয়তঃ, পার্লামেণ্ট সভার সরকারী আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করিবার যে ক্ষমতা আছে, তাহা প্রধান হিসাবপরীক্ষকের কার্যের মাধ্যমেই পরিচালিত হয়। পার্লামেণ্ট সভা

সরকারী ব্যয় মঞ্জুর করে। পার্লামেন্টসভা কর্তৃক অনুমোদিত ব্যয়-বরাদ্দ যথাযথভাবে খরচ করা হইয়াছে কিনা তাহা প্রধান হিসাব-পরীক্ষক পরীক্ষা করিয়া তাঁহার বিবরণী পেশ করেন। কোন কারণে অপব্যয় ঘটিলে হিসাব-পরীক্ষক সে বিষয়ে পার্লামেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারেন। শাসনতন্ত্র অনুসারে প্রধান হিসাব-পরীক্ষককে যুক্তরাষ্ট্রের হিসাব সম্পর্কে রাষ্ট্রপতির নিকট এবং রাজ্যের হিসাব সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট রাজ্যপালের নিকট বিবরণী পেশ করিতে হয়। এই বিবরণীর উপর ভিত্তি করিয়াই সরকারী হিসাব-পরীক্ষক কমিটি (Public Accounts Committee) ইহার বিবরণী লোকসভায় দাখিল করে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, প্রধান হিসাব-পরীক্ষকের কার্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ইংলণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশেও এই পদ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া বিবেচিত হয়। প্রধান হিসাব-পরীক্ষক যাহাতে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে তাঁহার কর্তব্য সম্পাদন করিতে পারেন, সেজন্য তাঁহার নিয়োগ, কার্যকাল ও কার্যকালের শর্তাদি শাসনবিভাগের নিয়ন্ত্রণমুক্ত করা হইয়াছে। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিগণকে যে পদ্ধতিতে অপসারণ করা যায়, একমাত্র সেই পদ্ধতিতে প্রধান হিসাব-পরীক্ষককে অপসারণ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। তবে ভারতের প্রধান হিসাব-পরীক্ষক পদ সম্পর্কে একটি ত্রুটির উল্লেখ করা যায়। ভারতের প্রধান হিসাব-পরীক্ষক একদিকে সরকারের হিসাব প্রস্তুত করেন, অন্যদিকে ঐ হিসাব আবার নিজে পরীক্ষা করিয়া বিবরণী দাখিল করেন। একই ব্যক্তির হস্তে এই উভয় ক্ষমতা ন্যস্ত হওয়া যুক্তিযুক্ত নহে। এইজন্য হিসাব প্রস্তুতের কার্য বর্তমানে ক্রমশঃ শাসনবিভাগের নিকট হস্তান্তরিত করা হইতেছে।

সংক্ষিপ্তসার

ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রি-সংসদ, পার্লামেন্ট সভা ও সুপ্রিম কোর্ট লইয়া গঠিত।

রাষ্ট্রপতি—

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা একজন রাষ্ট্রপতির হস্তে ন্যস্ত আছে। রাষ্ট্রপতি স্বয়ং অথবা তাঁহার অধস্তন কর্মচারীর সাহায্যে শাসনক্ষমতা পরিচালিত হইবে।

রাষ্ট্রপতির নির্বাচন—

রাষ্ট্রপতি-পদে নিয়োগের জন্য পরোক্ষ নির্বাচন-পদ্ধতির ব্যবস্থা হইয়াছে। ভারতীয় পার্লামেন্ট সভায় উভয় কক্ষের নির্বাচিত সদস্যগণ ও রাজ্যসমূহের নিম্নপরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণ কর্তৃক একক হস্তান্তরযোগ্য গোপন ভোট দ্বারা রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইবেন। ভারতে রাষ্ট্রপতি শাসনক্ষমতার উচ্চতম কর্তৃপক্ষ হইলেও কার্যতঃ তাঁহাকে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে পরিচালিত মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ অনুসারে শাসনক্ষমতা প্রয়োগ করিতে হইবে। রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্ব কার্যতঃ মন্ত্রিপরিষদসহ প্রধানমন্ত্রীর উপর ন্যস্ত হইয়াছে।

রাষ্ট্রপতি ৫ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইবেন এবং তিনি পুনর্নির্বাচিত হইতে পারিবেন। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য শাসনতন্ত্র কর্তৃক নিম্নলিখিত যোগ্যতাগুলি স্থিরীকৃত হইয়াছে: (ক) রাষ্ট্রপতির পদপ্রার্থীকে ভারতীয় নাগরিক হইতে হইবে। (খ) তাঁহার বয়স ৩৫ বৎসরাধিক হইবে। (গ) পার্লামেন্টের নিম্নপরিষদের সদস্য হওয়ার যোগ্যতা তাঁহার থাকিবে। (ঘ) এরূপ ব্যক্তি কোনও লাভজনক কার্যে নিযুক্ত থাকিতে পারিবেন না। (ঙ) তিনি পার্লামেন্ট সভা অথবা রাজ্য আইনসভার সদস্য থাকিতে পারিবেন না। রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইলে তিনি মাসিক ১০,০০০ টাকা বেতন ও বিনা ভাড়ায় আবাসগৃহ এবং পার্লামেন্ট দ্বারা নির্ধারিত অন্য বাহা খরচা ইত্যাদি পাইবেন। শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধাচরণের জন্য রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে পার্লামেন্টের যে-কোনও কক্ষ অভিযোগ আনয়ন করিতে পারে এবং অভিযোগের প্রস্তাব যদি সেই কক্ষের $\frac{2}{3}$ সংখ্যক সদস্যের দ্বারা গৃহীত ও অন্য কক্ষের $\frac{2}{3}$ সংখ্যক সদস্যের দ্বারা যথাযথভাবে পরীক্ষার পর গৃহীত হয়, তাহা হইলে রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ করা চলিবে। রাষ্ট্রপতি নিজে উপ-রাষ্ট্রপতির নিকট আবেদনপত্র দ্বারা পদত্যাগ করিতে পারেন। রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদাবৃদ্ধির জন্য তাঁহাকে সাধারণ বিচারালয়ের বিচারাধীন করা হয় নাই।

রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা—

শাসনতন্ত্র কর্তৃক রাষ্ট্রপতির উপর আরোপিত ক্ষমতাসমূহকে সাধারণতঃ কয়েক ভাগে ভাগ করা হয়, যথা—

(১) শাসন-পরিচালনার ক্ষমতা—

রাষ্ট্রপতি হইলেন ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের শাসনকর্তৃপক্ষের শীর্ষস্থানীয় অধিকর্তা।

এবং তাঁহার নামেই সমগ্র শাসনক্ষমতা প্রযুক্ত হয়। রাষ্ট্রপতি বিভিন্ন রাজ্যের গভর্ণরদের মনোনয়ন করা ব্যতীতও সুপ্রিম কোর্ট ও উচ্চ বিদ্যালয়ের বিচারপতিগণ, ভারতের অডিটর-জেনারেল ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারিগণের নিয়োগ করিয়া থাকেন। শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হওয়ার সময় হইতে সাধারণ নির্বাচন সমাপ্তি পর্যন্ত অন্তর্বর্তী কালে বহুবিধ বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতিকে দেওয়া হইয়াছে। রাষ্ট্রপতি হইলেন সমগ্র সশস্ত্র বাহিনীর অধিকর্তা। তিনি যুদ্ধঘোষণা ও শান্তিস্থাপন করিতে পারেন।

(২) আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা—

রাষ্ট্রপতি আইনসভার অবিচ্ছেদ্য অংশ। রাষ্ট্রপতি ও আইনসভার উভয় পরিষদ লইয়া ভারতীয় পার্লামেণ্ট সভা গঠিত। রাষ্ট্রপতি উভয় পরিষদ অথবা একটি পরিষদকে অধিবেশনের জন্য আহ্বান করিতে পারেন, উভয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখিতে পারেন এবং লোকসভা অর্থাৎ নিম্নপরিষদ ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন। তিনি রাজ্যসভার ১২ জন সদস্য মনোনীত করেন। প্রত্যেক অধিবেশন আরম্ভের প্রাক্কালে রাষ্ট্রপতি উভয় পরিষদের যুক্ত অধিবেশনে বক্তৃতা করিতে পারিবেন এবং অধিবেশনে উহা আহ্বান করিবার কারণ ব্যাখ্যা করিবেন। তিনি কোন নির্দিষ্ট আইনের প্রস্তাব সম্পর্কে অথবা অন্য ব্যাপারে উভয় পরিষদের নিকট বাণী প্রেরণ করিতে পারেন।

উভয় পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত আইনের প্রস্তাবে রাষ্ট্রপতির সম্মতি একান্ত প্রয়োজন। অনুমোদিত আইনের প্রস্তাবে তিনি সম্মতি প্রদান করিতে পারেন অথবা সম্মতি প্রদানে বিরত থাকিতে পারেন। যে প্রস্তাব রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অনুমোদিত হয় না, তাহা সংশোধিত আকারে অথবা বিনা সংশোধনে যদি উভয় পরিষদ কর্তৃক পুনরায় গৃহীত হয়, তাহা হইলে উক্ত প্রস্তাব দ্বিতীয়বার রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপিত হইলে তাঁহাকে উক্ত প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিতেই হইবে। পার্লামেণ্টের অবকাশকালে রাষ্ট্রপাত জরুরী আইন প্রণয়ন করিতে পারেন এবং এই আইনগুলি পার্লামেণ্ট-প্রণীত আইনের মত কার্যকরী হয়। কিন্তু রাষ্ট্রপতি-প্রবর্তিত জরুরী আইনগুলি পার্লামেণ্ট সভার পরবর্তী অধিবেশনে উত্থাপন করিতে হইবে এবং পার্লামেণ্ট কর্তৃক অনুমোদিত হইলে পার্লামেণ্টের অধিবেশনের প্রারম্ভ হইতে ছয় সপ্তাহ পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে। নির্দিষ্ট সময়ের

পূর্বেই যদি পার্লামেণ্ট এই জরুরী আইনের বিরুদ্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করে, তাহা হইলে জরুরী আইন আর কার্যকরী থাকিবে না।

(৩) অর্থ-সংক্রান্ত ক্ষমতা

প্রত্যেক আর্থিক বৎসরে রাষ্ট্রপতি পার্লামেণ্টের উভয় পরিষদের নিকট যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের সম্ভাব্য আয় এবং ব্যয়ের এক হিসাব উত্থাপন করাইবেন। রাষ্ট্রপতির অনুমোদন ব্যতীত অর্থমঞ্জুরীর কোন দাবী উত্থাপিত হইতে পারে না। নিম্নপরিষদে অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাব উত্থাপিত করিতে গেলেও তাঁহার অনুমোদন প্রয়োজন। রাষ্ট্রপতির অনুমোদন ব্যতীত পার্লামেণ্ট সভায় আয় এবং ব্যয়বরাদ্দ সম্পর্কিত কোন প্রস্তাবই গৃহীত হইতে পারে না। বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে আদায়ীকৃত আয়কর বণ্টন করিয়া দেওয়া এবং পাটশুল্কের পরিবর্তে আসাম, বিহার, উড়িষ্যা ও পশ্চিমবঙ্গকে সাহায্য প্রদান করিবার ক্ষমতাও রাষ্ট্রপতির হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে।

(৪) বিচারবিষয়ক ক্ষমতা

সুপ্রিম কোর্ট ও উচ্চ বিচারালয়ের বিচারপতিগণকে নিয়োগ করা ব্যতীতও রাষ্ট্রপতির অন্য বিচারবিষয়ক ক্ষমতা আছে। দণ্ডিত ব্যক্তিকে দণ্ডপ্রাপ্তির সময়ে অথবা দণ্ডভোগকালে তিনি মার্জনা করিতে পারেন। শাস্তিভোগকালে কোন ব্যক্তিকে তিনি সাময়িকভাবে মুক্তির আদেশ দিতে পারেন। গুরুতর শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তির শাস্তি লঘুতর করিবার ক্ষমতাও তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছে।

(৫) জরুরী ক্ষমতা

শাসনতন্ত্র কর্তৃক রাষ্ট্রপতির উপর কতকগুলি জরুরী ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে। এই ক্ষমতাগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

(ক) জরুরী অবস্থার ঘোষণা

শাসনতন্ত্রে বলা হইয়াছে যে, কোন সময়ে রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন যে, দেশের নিরাপত্তা যুদ্ধ বা আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলতার জন্য বিঘ্নিত হইতে পারে, তাহা হইলে তিনি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিতে পারেন। উপরি-উক্ত কারণগুলি কার্যতঃ উপস্থিত না হইলেও যদি প্রত্যাসন্ন বলিয়া রাষ্ট্রপতি মনে করেন,

তাহা হইলেও তিনি জরুরী অবস্থার ঘোষণা করিতে পারেন। এইরূপ ঘোষণা পার্লামেন্টের উভয় পরিষদ দ্বারা অনুমোদিত না হইলে দুই মাসের অধিককাল স্থায়ী হইতে পারে না। উভয় পরিষদ কর্তৃক সমর্থিত হইলে এইরূপ জরুরী ঘোষণা দুই মাসের অধিককাল বলবৎ থাকিতে পারে।

জরুরী অবস্থা ঘোষণার ফলে শাসন-ব্যবস্থায় সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন সাধিত হয়। এই ঘোষণা বলবৎ থাকা কালে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা এককেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় পর্যবসিত হয়। এই সময়ে পার্লামেন্ট সভা রাজ্য তালিকাভুক্ত যে-কোন বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে পারে। লোকসভার কার্যকাল একসময়ে একবৎসর বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে রাজস্ব-বণ্টনের যে ব্যবস্থা আছে, জরুরী অবস্থায় রাষ্ট্রপতি তাহা পরিবর্তন করিতে পারেন। এতদ্ব্যতীত এ অবস্থায় বাক্-স্বাধীনতা, সভাসমিতি করিবার স্বাধীনতা, প্রভৃতি মৌলিক অধিকারগুলি হইতে নাগরিকগণকে বঞ্চিত করিবার ক্ষমতাও রাষ্ট্রপতির উপর অর্পিত হইয়াছে। অধিকন্তু এরূপ অবস্থায় রাষ্ট্রপতির নির্দেশক্রমে মৌলিক অধিকারগুলিকে বিচারালয়ের সাহায্যে বলবৎ করিবার নাগরিক অধিকার স্থগিত থাকিতে পারে।

(খ) রাজ্যগুলির শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থা-সংক্রান্ত ঘোষণা

দ্বিতীয়তঃ, যদি কোন সময়ে কোন রাজ্যের রাজ্যপালের নিকট হইতে সংবাদ পাইয়া অথবা অন্য প্রকারে রাষ্ট্রপতি বুঝিতে পারেন যে, সেই রাজ্যের শাসনব্যবস্থায় অচল পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়া শাসনতন্ত্র অনুযায়ী শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনা করা অসম্ভব হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি তদ্রূপ ঘোষণা করিতে পারেন। এইরূপ ঘোষণার দ্বারা রাষ্ট্রপতি উক্ত রাজ্যের সমুদয় শাসন ক্ষমতা নিজহস্তে গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং সেই রাজ্যের আইন পরিষদের ক্ষমতা পার্লামেন্ট কর্তৃক গৃহীত হইবে। কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রে উক্ত রাজ্যের উচ্চ বিচারালয়ের ক্ষমতা কোনমতে ক্ষুণ্ণ হইবে না। এইরূপ ঘোষণা সাধারণতঃ দুই মাসের জন্য বলবৎ থাকিবে এবং পার্লামেন্টের উভয় পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হইলে আরও ছয়মাস কাল বলবৎ থাকিতে পারে। কিন্তু পার্লামেন্টের অনুমোদনে ছয়মাস করিয়া ঘোষণাটির মেয়াদ বৃদ্ধি করিয়া তিন বৎসরের অধিক কাল পর্যন্ত ইহাকে বলবৎ রাখা চলিবে না।

(গ) অর্থ-সংক্রান্ত জরুরী অবস্থা ঘোষণা

যদি কোন সময় রাষ্ট্রপতির ধারণা হয় যে, ভারত অথবা ভারতের কোন অংশে আর্থিক স্থায়িত্ব বা সুনাম নষ্ট হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি অর্থ-সংক্রান্ত জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিতে পারেন। উপরি-উক্ত দুইটি ঘোষণার অনুরূপভাবেই এই ঘোষণাটিকেও পার্লামেন্টের উভয় পরিষদে উপস্থিত করিতে হইবে এবং এই ঘোষণার স্থায়িত্ব প্রথমোক্ত ঘোষণার নিয়মানুযায়ী নির্ধারিত হইবে। এই ঘোষণা বলবৎ থাকা কালে রাজ্য সরকারের আয় ও ব্যয়বরাদ্দ প্রস্তাবসমূহ রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য সংরক্ষিত থাকিবে ও রাজ্য সরকারগুলির সকল শ্রেণীর কর্মচারীর বেতন হ্রাস করা যাইবে।

উপ-রাষ্ট্রপতি

শাসনতন্ত্রের বিধানানুযায়ী ভারত-রাষ্ট্রের একজন উপ-রাষ্ট্রপতি থাকিবেন। উপ-রাষ্ট্রপতি পার্লামেন্ট সভার উভয় পরিষদের যুক্ত অধিবেশনে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে একক হস্তান্তরযোগ্য ভোটপদ্ধতিতে গোপন ভোটে নির্বাচিত হইবেন। তাহার কার্যকালের স্থায়িত্ব পাঁচবৎসর কাল। উপ-রাষ্ট্রপতি-পদপ্রার্থীর প্রায় রাষ্ট্রপতি-পদপ্রার্থীর যোগ্যতা থাকা চাই।

রাষ্ট্রপতির মৃত্যু ঘটিলে অথবা রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করিলে কিংবা অপসারিত হইলে, নূতন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত উপ-রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতির স্থলাভিষিক্ত হইবেন। দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রপতির সাময়িক অবসর গ্রহণকালে অথবা অসুস্থতা-নিবন্ধন অথবা অন্য কারণে অনুপস্থিতিকালে উপ-রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতির কার্য করিবেন। তিনি সাধারণতঃ রাজ্যসভার সভাপতিত্ব করেন।

মন্ত্রি-পরিষদ

ভারতে রাষ্ট্রপতির হস্তে যে ব্যাপক ক্ষমতা ন্যস্ত হইয়াছে, শাসনতন্ত্র অনুসারে সে সমুদয় ক্ষমতাই প্রধানমন্ত্রিসহ মন্ত্রিপরিষদের উপদেশ ও পরামর্শ অনুসারে পরিচালিত হইবে। রাষ্ট্রপতিকে শাসনকার্য-পরিচালনায় মন্ত্রিপরিষদ যে পরামর্শ বা উপদেশ দান করিবেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে কোন বিচারালয়ের নিকট দায়ী করা চলিবে না। প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাঁহার পরামর্শ অনুসারে রাষ্ট্রপতি অন্যান্য মন্ত্রীদের নিযুক্ত করিবেন। মন্ত্রি-পরিষদের সদস্যগণকে পার্লামেন্ট সভার যে-কোন পরিষদের সদস্য হইতেই

হইবে। মন্ত্রিপদে নিযুক্ত হইবার কালে যদি কোন মন্ত্রী পার্লামেণ্টের সদস্য না থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকে ছয়মাস কালের মধ্যে সদস্য নির্বাচিত হইতে হইবে; নতুবা তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে হইবে। মন্ত্রিগণের বেতন ও ভাতা পার্লামেণ্ট কর্তৃক নির্ধারিত হয়। মন্ত্রিগণ যৌথভাবে আইনসভার নিকট দায়ী।

শাসনকার্যে রাষ্ট্রপতিকে সাহায্য করা ও পরামর্শ দান করা হইল মন্ত্রি-পরিষদের প্রধান কার্য। শাসন-সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ করা এবং বিভিন্ন দপ্তর-গুলির কার্যের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানপূর্বক ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থাকে চালু রাখার দায়িত্ব মন্ত্রিপরিষদের হস্তে ন্যস্ত। সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা কতকগুলি বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বৈদেশিক ব্যাপারে ও অন্যান্য রাজনৈতিক ব্যাপার-সংক্রান্ত দপ্তরের অধিকর্তা হইলেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী। এইরূপে প্রত্যেকটি দপ্তরের জন্য এক একজন ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী আছেন। যুক্তরাষ্ট্রীয় মন্ত্রী ব্যতীত ভারতে আরও দুই শ্রেণীর মন্ত্রী আছেন, যথা, **রাষ্ট্রমন্ত্রী** ও **উপমন্ত্রী**। রাষ্ট্রমন্ত্রিগণের উপর অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বসম্পন্ন দপ্তরের ভার দেওয়া হয়। কিন্তু উপ-মন্ত্রীগণ কোন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর সহকারী হিসাবেই নিযুক্ত হইয়া থাকেন।

মন্ত্রীগণ শুধু নির্দিষ্ট দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী মাত্র নহেন তাঁহারা আইন-সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এবং আইনসভায় সদস্য হিসাবে তাঁহারা গুরুত্বপূর্ণ আইনের প্রস্তাবগুলি পার্লামেণ্ট সভায় উপস্থাপিত করিয়া সংখ্যাধিক্যের সমর্থনে সেগুলিকে আইনে পরিণত করেন। অর্থ সংক্রান্ত ব্যাপারেও মন্ত্রিপরিষদের প্রাধান্য দেখা যায়।

প্রধানমন্ত্রী

ভারতের শাসনতন্ত্রে স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ আছে যে, রাষ্ট্রপতিকে সাহায্য ও পরামর্শদান করিবার জন্য একজন প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি মন্ত্রীপরিষদ থাকিবে। সুতরাং ভারতের প্রধানমন্ত্রীর পদ শাসনতান্ত্রিক আইনের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া থাকেন। পার্লামেণ্ট সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে রাষ্ট্রপতির পক্ষে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত করা ছাড়া গত্যন্তর নাই।

নূতন শাসনতন্ত্রের বিধানানুযায়ী কার্যতঃ ভারতের প্রধানমন্ত্রী হইলেন শাসকপ্রধান। তিনি মন্ত্রিপরিষদের সভাপতি ও পরিচালক। অন্যান্য মন্ত্রিগণ

প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া থাকেন। তিনি শুধু মন্ত্রিপরিষদের সভাপতি নহেন, মন্ত্রীপরিষদকে পরিচালিত করা তাঁহার অন্যতম। দায়িত্ব। সহকর্মিগণকে তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও যুক্তির প্রভাবে নিজের মতে আনয়ন করিতে হয়। যদি কোন মন্ত্রী তাঁহার মত গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হন তাহা হইলে তিনি তাঁহাকে পদত্যাগে বাধ্য করিতে পারেন। তিনি মন্ত্রীগণের মধ্যে দপ্তর বণ্টন করিয়া থাকেন এবং বিভিন্ন দপ্তরগুলির কার্যের তদারক করা ছাড়াও তিনি নিজে একটি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের (পররাষ্ট্র) ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী।

সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসাবে প্রধানমন্ত্রী আইনসভার নেতা। নেতা হিসাবে তাঁহাকে দলীয় ঐক্য ও মর্যাদা রক্ষা করিতে হয়। এজন্য তাঁহাকে জনসাধারণের সংস্পর্শে আসিয়া জনমতকে নিয়ন্ত্রণ করিতে হয়। তাঁহার প্রধান-মন্ত্রীত্ব, দলীয় নেতৃত্ব প্রভৃতি তাঁহাব জনপ্রিয়তার উপর নির্ভর করে। পার্লামেণ্ট সভায় তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নীতি সমর্থন করেন এবং বিরোধী দলগুলির সমালোচনার উত্তর প্রদান করেন।

রাষ্ট্রপতির প্রধান পরামর্শদাতা হইলেন প্রধানমন্ত্রী। ভারতের সংবিধান রাষ্ট্রপতির হস্তে যে ব্যাপক ক্ষমতা প্রদান করিয়াছে, কাযতঃ সে সমুদয় ক্ষমতাই প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী পরিচালিত হয়। সুতরাং কি যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-পরিচালনা, কি রাজ্যশাসন-পরিচালনা, সর্বক্ষেত্রেই প্রধানমন্ত্রীর প্রাধান্য সূচিত হয়। এক কথায় বলা চলে যে, শিশুরাষ্ট্র ভারতের ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণরূপে তাহার প্রধানমন্ত্রীর বিচারবুদ্ধি ও কর্মক্ষমতার উপর নির্ভর করে।

মন্ত্রিপরিষদের সহিত রাষ্ট্রপতির সম্পর্ক

ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হইলেন রাষ্ট্রপতি। কিন্তু ভারতের সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতির হস্তে যে ব্যাপক ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে তাহা মন্ত্রিপরিষদ সহ প্রধান মন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী পরিচালিত হয়। প্রধান মন্ত্রী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং অন্যান্য মন্ত্রি-বর্গকে প্রধান মন্ত্রীর পরামর্শমত রাষ্ট্রপতিই নিয়োগ করিবেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ ব্যাপারে রাষ্ট্রপতি তাঁহার খুসীমত কাহাকেও নিয়োগ করিতে পারেন না। কারণ, পার্লামেণ্ট সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের যিনি নেতা তিনি ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি স্থায়ী মন্ত্রীসভা গঠন করিতে পারে না।

সংবিধান অনুসারে শাসনকার্য পরিচালনার জন্য রাষ্ট্রপতিকে একটি মন্ত্রিসভা

রাখিতে হইবেই এবং মন্ত্রিপরিষদ রাষ্ট্রপতির খুসীমত কার্যে বহাল থাকেন। সংবিধানে বলা হইয়াছে যে, মন্ত্রী পরিষদ তাঁহাদের কার্যের জন্য যৌথভাবে লোকসভার নিকট দায়ী থাকিবেন। সুতরাং সংবিধানের এই ধারা হইতে সহজে অনুমান করা যায় যে, ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ক্ষেত্রে একটি দায়িত্বশীল সরকার গঠন করাই হইল সংবিধানের মূল উদ্দেশ্য। এ দিক দিয়া দেখিতে গেলে মন্ত্রীপরিষদকে প্রকৃত শাসন কর্তৃপক্ষ বলা যায়, আর রাষ্ট্রপতি হইলেন ইংলণ্ডের রাজার ন্যায় নিয়মতান্ত্রিক শাসকপ্রধান। সংবিধান কর্তৃক, নির্দিষ্টরূপে উল্লিখিত না হইলেও শাসন পরিচালনার প্রায় সর্বক্ষেত্রেই রাষ্ট্রপতিকে আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দল কর্তৃক নির্বাচিত ও সমর্থিত নেতৃবর্গ দ্বারা গঠিত মন্ত্রিপরিষদের সাহায্য ও পরামর্শ অনুসারে চলিতে হয়।

মন্ত্রিপরিষদের সহিত প্রধান মন্ত্রীর সম্পর্ক—

আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হন। প্রধান মন্ত্রীর সুপারিশ ক্রমেই অন্যান্য মন্ত্রিগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে মন্ত্রী নিযুক্ত হন। সুতরাং কার্যতঃ প্রধান মন্ত্রীই অন্যান্য মন্ত্রিগণকে নিযুক্ত করেন ও দপ্তর বণ্টন করেন। প্রধান মন্ত্রী মন্ত্রীপরিষদেরও নেতা এবং তাঁহার নেতৃত্বেই দলের ঐক্য ও সংহতি রক্ষিত হয়। মন্ত্রীপরিষদের সভাপতি হিসাবে তিনি বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করেন এবং বিভিন্ন মন্ত্রীর মধ্যে মতানৈক্য ঘটিলে তিনিই মধ্যস্থতা করেন। কোন মন্ত্রী যদি প্রধানমন্ত্রীর সহিত একমত না হন তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে পদত্যাগ করা ছাড়া উপায় নাই। প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করিলে সমগ্র মন্ত্রিসভার পতন ঘটে। সুতরাং অন্যান্য মন্ত্রিগণ প্রধানমন্ত্রীর উপর শুধু নির্ভরশীল নহেন, তাঁহারা প্রধানমন্ত্রীর নিকট দায়ীও বটে। অন্যান্য মন্ত্রিগণ প্রধানমন্ত্রীর সহকর্মী হইলেও প্রধানমন্ত্রীর শ্রেষ্ঠত্ব ও অগ্রাধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত।

প্রশ্নাবলী

1. Discuss, in detail, the powers and functions of the President of India.

2. Discuss the Constitutional position of the President of India.

3. Distinguish carefully between the position of the President and that of the Prime Minister of India.

4. Discuss the Emergency Powers of the President of India.

5. Write a note on the Vice-President of India.

6. Examine: "The President is a Constitutional symbol without any substance of power".

7. Discuss the position and functions of the Prime Minister of India.

অষ্টম অধ্যায়
যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা
(Union Legislature)

পার্লামেণ্ট (Parliament)

রাষ্ট্রপতি ও দুইটি আইন-পরিষদ্ লইয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা অর্থাৎ পার্লামেণ্ট গঠিত। উচ্চ পরিষদ্কে বলা হয় রাজ্যসভা, আর নিম্ন পরিষদ্ লোকসভা নামে অভিহিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা অন্য রাষ্ট্র-নিরপেক্ষ স্বাধীন সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে, অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভার অনুরূপভাবে ভারতের পার্লামেণ্ট সভার সার্বভৌম ক্ষমতা শাসনতন্ত্র কর্তৃক সীমায়িত হইয়াছে। শাসনতন্ত্র নির্ধারিত গণ্ডির মধ্যেই ইহার ক্ষমতা প্রযুক্ত হয়। দ্বিতীয়তঃ, মৌলিক অধিকার-বিরোধী কোন কার্য করিলে এই সভার কার্য সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হইতে পারে। এতদ্ব্যতীত শাসনতন্ত্র কর্তৃক নির্ধারিত রাজ্যসরকারগুলির কার্যক্ষেত্রের উপর সাধারণতঃ এই সভার কোন ক্ষমতা নাই। সুতরাং বৃটিশ পার্লামেণ্ট সভার মত ভারতের পার্লামেণ্ট সভাকে সার্বভৌম আইনসভা (Sovereign law-making Body) বলা চলে না।

রাজ্যসভা (Council of States)

রাজ্যসভা অনধিক ২৫০ জন সদস্য লইয়া গঠিত হয়। তন্মধ্যে ১২ জন সদস্যকে রাষ্ট্রপতি সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, সমাজসেবক বা বিশেষ বিশেষ বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে মনোনীত করেন। রাজ্যসভার সদস্যগণ প্রত্যেক রাজ্যের নিম্ন কক্ষের সদস্যগণ কর্তৃক একক হস্তান্তরযোগ্য ভোটে সমানানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতিতে পরোক্ষে নির্বাচিত হইয়া থাকেন। রাজ্য পুনর্গঠনের ফলে ও ১৯৫১ সালের আদমসুমারি অনুসারে লোকবৃদ্ধির ফলে রাজ্যসভার সদস্যসংখ্যা ২০৬ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ২৩৮ হইয়াছে। রাজ্যসভার এই ২৩৮ জন সদস্য নিম্নলিখিত হারে বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মধ্যে বণ্টন করা হইয়াছে :—

রাজ্য			রাজ্যসভার সদস্যসংখ্যা
১।	অন্ধ্রপ্রদেশ	...	১৮
২।	আসাম	...	৭
৩।	বিহার	...	২২
৪।	গুজরাত	...	১১
৫।	মহারাষ্ট্র	...	১৯
৬।	কেরল	...	৯
৭।	মধ্যপ্রদেশ	...	১৬
৮।	মাদ্রাজ	...	১৮
৯।	মহীশূর	...	১২
১০।	উড়িষ্যা	...	১০
১১।	পাঞ্জাব	...	১১
১২।	রাজস্থান	...	১০
১৩।	উত্তরপ্রদেশ	...	৩৪
১৪।	পশ্চিমবঙ্গ	...	১৬
১৫।	জম্মু ও কাশ্মীর	...	৪
১৬।	নাগাভূমি	...	১
			২১৮

কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল			রাজ্যসভার সদস্যসংখ্যা
১।	দিল্লী	...	৩
২।	হিমাচল প্রদেশ	...	২
৩।	মণিপুর	...	১
৪।	ত্রিপুরা	...	১
৫।	পণ্ডিচেরি	...	১
			৮

রাজ্যগুলি—	২১৮
কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল—	৮
রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত—	১২
মোট—	২৩৮

রাজ্যসভার সদস্য নির্বাচিত হইতে হইলে প্রার্থীর অন্ততঃ ৩০ বৎসর বয়স্ক ভারতীয় নাগরিক হইতে হয়। রাজ্যসভা স্থায়ী পরিষদ্। রাষ্ট্রপতি ইহাকে ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন না। রাজ্যসভার সদস্যগণ ছয় বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন কিন্তু প্রত্যেক দুই বৎসর অন্তর এই সভার এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের অবসর গ্রহণ করিতে হয়। ভারতে রাজ্যপরিষদের গঠনপ্রণালীতে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা প্রভৃতি অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চ পরিষদ্ আঙ্গিক রাজ্যগুলির সমান সংখ্যক প্রতিনিধি লইয়া গঠিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চ পরিষদের সদস্যগণ প্রত্যক্ষ ভোটদান পদ্ধতিতে নির্বাচিত হইয়া থাকেন। ভারতে উচ্চ পরিষদের সদস্যগণ জনসংখ্যার ভিত্তিতে পরোক্ষ পদ্ধতিতে নির্বাচিত হইয়া থাকেন। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক উচ্চ

পরিষদে ১২ জন সদস্য মনোনীত করিবার যে ব্যবস্থা আছে তাহাও গণতন্ত্র-বিরোধী বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। উপরাষ্ট্রপতি রাজ্যসভায় সভাপতিত্ব করেন। সদস্যগণ আর একজন সহ-সভাপতি নির্বাচন করেন।

রাজ্যসভার ক্ষমতা ও কার্য (Powers and Functions of the Council of States)

রাজ্যসভা হইল ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চ কক্ষ। এই কক্ষের ক্ষমতা ও কাজগুলিকে নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করা যায়, যথা, আইনপ্রণয়ন বিষয়ক, অর্থ-সংক্রান্ত, শাসন-সংক্রান্ত, শাসনতন্ত্র-সংক্রান্ত ও বিবিধ।

এক অর্থ সংক্রান্ত প্রস্তাব ব্যতীত অন্য সকল প্রস্তাব রাজ্যসভায় উত্থাপিত হইতে পারে এবং এই সভার সম্মতি ব্যতীত কোন প্রস্তাবই আইনে পরিণত হইতে পারে না। নিম্ন-কক্ষ লোকসভা কর্তৃক আনীত প্রস্তাবে রাজ্যসভা সম্মতি দিতে পারে বা সংশোধন করিতে পারে বা প্রত্যাখ্যান করিতে পারে। উভয় কক্ষের মধ্যে মতবিরোধ ঘটিলে রাষ্ট্রপতি উভয় কক্ষের যুক্ত অধিবেশন আহ্বান করাইতে পারেন। কিন্তু লোকসভার সদস্যসংখ্যার সংখ্যাধিক্যের ফলে যুক্ত অধিবেশনে লোকসভার মতই গৃহীত হয়। রাজ্যসভা যদি ছয় মাসের মধ্যে লোকসভা কর্তৃক গৃহীত আইনের প্রস্তাবে সম্মতিদানে বিরত থাকে তাহা হইলে ছয় মাস অন্তে রাজ্যসভার বিনা সম্মতিতেই প্রস্তাবটি লোকসভার ইচ্ছানুসারে আইনে পরিণত হয়। সুতরাং সাধারণ আইনপ্রণয়নে রাজ্যসভা মাত্র ছয় মাস কাল আইনপ্রণয়নে বাধা দিতে পারে—আইনপ্রণয়ন একেবারে স্থগিত রাখিবার ক্ষমতা ইহার নাই।

রাজ্যসভা অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাব উত্থাপন করিতে পারে না। লোকসভা কর্তৃক উত্থাপিত অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাব রাজ্যসভায় প্রেরিত হইলে রাজ্যসভা এই প্রস্তাব সংশোধন করিতে পারে. কিন্তু এই সংশোধন লোকসভা-কর্তৃক গৃহীত না হইলে কার্যকরী হয় না। লোকসভা যে আকারে অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাব পাস করে, রাজ্যসভা যদি সেই প্রস্তাবে সম্মতিদান না করে তাহা হইলে ১৪ দিন পর প্রস্তাবটি লোকসভার ইচ্ছামত আইনে পরিণত হয়।

মন্ত্রিগণ লোকসভার নিকট দায়ী। রাজ্যসভা অনাস্থা প্রস্তাব পাস করিয়া মন্ত্রিপরিষদকে অপসারিত করিতে পারে না। তবে প্রশ্নোত্তরের সাহায্যে, মুলতুবি প্রস্তাব আনয়ন করিয়া ও সাধারণভাবে মন্ত্রিগণের কার্যের সমালোচনা

করিয়া রাজ্যসভা মন্ত্রীপরিষদের কার্যের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। কোন মন্ত্রী রাজ্যসভার সদস্য না হইলেও ইহার অধিবেশনে উপস্থিত থাকিয়া বিতর্কে যোগদান করিতে পারেন এবং নিজ নিজ বিভাগ-সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দান করিতে পারেন।

শাসনতান্ত্রিক আইন পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও রাজ্যসভা লোকসভার সহিত সম-ক্ষমতার অধিকারী। রাজ্যসভা শাসনতান্ত্রিক আইন পরিবর্তনের প্রস্তাব আনয়ন করিতে পারে, কিন্তু এরূপ প্রস্তাব শুধু উভয় কক্ষের নির্ধারিত সংখ্যাধিক্যের ভোটে গৃহীত হয়। উভয় কক্ষের মধ্যে মতবিরোধ ঘটিলে যুক্ত অধিবেশন বসে। কিন্তু যুক্ত অধিবেশনে সংখ্যাধিক্যের বলে লোকসভার জয় সুনিশ্চিত।

ইহা ছাড়া, রাজ্যসভা দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সংখ্যাধিক্য ভোটে প্রস্তাব পাস করিয়া জাতীয় স্বার্থসংরক্ষণের উদ্দেশ্যে কোন রাজ্যতালিকাভুক্ত বিষয়ের উপর আইন প্রণয়ন করিবার অনুরোধ করিতে পারে। রাষ্ট্রপতির নির্বাচন ও অপসারণে রাজ্যসভা অংশ গ্রহণ করিতে পারে। উপ-রাষ্ট্রপতির নির্বাচন ও অপসারণ ব্যাপারে রাজ্যসভা লোকসভার সহিত একযোগে অংশ গ্রহণ করিতে পারে। লোকসভার সহিত একযোগে প্রস্তাব পাস করিয়া সুপ্রিম কোর্ট ও উচ্চ বিচারালয়ের বিচারপতিগণকে পদচ্যুত করিতে পারে।

রাজ্যসভার ক্ষমতা আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, শাসনতন্ত্রের রচয়িতাগণ রাজ্যসভাকে কোনরূপ বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী না করিয়া ইহাকে শুধু একটি সংশোধনী (Revisory) কক্ষ হিসাবে গঠন করিয়া ভারতে গণতান্ত্রিক আদর্শ অক্ষুন্ন রাখিবার প্রয়াস পাইয়াছেন।

উচ্চ পরিষদ্ হিসাবে রাজ্যসভার স্থান (Position of the Council of States as a Second Chamber)

পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই বিশেষ করিয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় দ্বি-পরিষদ্ আইনসভা শাসনব্যবস্থার একটি অপরিহার্য অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হয়। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভ করিবার পূর্বেও ভারতে কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থায় দ্বি-পরিষদ্ আইনসভা বর্তমান ছিল। স্বাধীন ভারতের নূতন শাসনতন্ত্রের রচয়িতাগণও ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় দ্বি-পরিষদ্ আইনসভার প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করিয়া রাজ্যসভার সৃষ্টি করেন এবং এখনও পর্যন্ত ভারতের এই উচ্চ পরিষদের

প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিয়া ইহার উচ্ছেদের জন্য কোন জনমত গঠিত হয় নাই। সুতরাং ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় যে রাজ্যসভার কিছু গুরুত্ব আছে ইহা অনস্বীকার্য।

ভারতে রাজ্যসভার বিরুদ্ধে সাধারণতঃ দুই দিক দিয়া বিরূপ সমালোচনা করা হয়। প্রথমতঃ, বলা হয় যে আইনসভা হিসাবে রাজ্যসভা অগণতান্ত্রিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। লোকসভার সদস্যগণ সার্বজনীন ভোটাধিকার ভিত্তিতে জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধি লইয়া গঠিত, আর রাজ্যসভার কিয়দংশ সদস্য পরোক্ষ নির্বাচন-পদ্ধতিতে রাজ্যগুলির বিধানসভার সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন এবং অপর অংশ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত হন। প্রথমোক্ত পদ্ধতিতে যাঁহারা রাজ্যসভায় সদস্য নির্বাচিত হন তাঁহারা দলীয় ভিত্তিতেই নির্বাচিত হইয়া থাকেন। দলের মনোনীত ব্যক্তিগণকেই বিধানসভার সদস্যগণ একযোগে ভোট দিয়া নির্বাচিত করেন। এই পদ্ধতিতে জনগণের ইচ্ছা বা অনিচ্ছার কোন স্থান নাই। সুতরাং এই পদ্ধতিকে নির্বাচন না বলিয়া দলীয় মনোনয়ন বলা যাইতে পারে। শাসনতন্ত্র কর্তৃক রাষ্ট্রপতির উপর অর্পিত ক্ষমতাগুলি সাধারণতঃ তিনি মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ অনুযায়ী পরিচালনা করেন —সুতরাং রাষ্ট্রপতি কর্তৃক রাজ্যসভায় যে সমস্ত সদস্য মনোনীত হন, তাঁহারাও ক্ষমতাসীন দলেরই লোক। সুতরাং রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত সদস্যগণ যে অবিসংবাদিরূপে জ্ঞানী ও গুণী হইবেন তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই।

আর এক দিক দিয়া ভারতের রাজ্যসভার গঠনপ্রকৃতির ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র, সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রের আঙ্গিক রাজ্যগুলি সম-মর্যাদার অধিকারী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে আয়তন ও জনসংখ্যা-নির্বিশেষে সকল আঙ্গিক রাজ্যগুলিই উচ্চ পরিষদে সমান সংখ্যক প্রতিনিধি প্রেরণ করিবার অধিকারী। কিন্তু ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় এই সমান প্রতিনিধিত্বের নীতি গ্রহণ করা হয় নাই। রাজ্যসভার আসনগুলি* জন-সংখ্যার ভিত্তিতে বিভিন্ন রাজ্যগুলির মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ফলে জনবহুল রাজ্যগুলির প্রতিনিধিসংখ্যা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির প্রতিনিধি-সংখ্যার তুলনায় অনেক অধিক। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ভারতের রাজ্য-সভায় আসাম, কেরল, উড়িষ্যা, জম্মু ও কাশ্মীর এই চারিটি রাজ্যের সম্মিলিত প্রতিনিধিসংখ্যা হইল ৩০ জন, আর একমাত্র উত্তর প্রদেশের সদস্য-

সংখ্যা হইল ৩৪ জন। এরূপ ক্ষেত্রে বৃহৎ রাজ্যগুলি একজোটে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির স্বার্থ ক্ষুণ্ন করিতে পারে এবং ভারতে ইহার সংবিধানগত কোন প্রতিকারের ব্যবস্থা নাই। সুতরাং গঠনপ্রকৃতির দিক দিয়া ভারতের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভার এমন কোন আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য নাই, যেজন্য এই সভা দেশে ও বিদেশে বিশেষ মর্যাদা দাবী করিতে পারে।

রাজ্যসভার ক্ষমতা ও কার্য পর্যালোচনা করিলেও দেখা যায় যে, সাধারণ আইনপ্রণয়ন ব্যাপারে রাজ্যসভা মাত্র ছয় মাসকাল আইনপ্রণয়নে বাধা দিতে পারে—আইনপ্রণয়ন একেবারে স্থগিত রাখিবার ক্ষমতা ইহার নাই। রাজ্যসভার এই দুর্বলতা গণতান্ত্রিক আদর্শসম্মত বলা যাইতে পারে; কারণ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় জনগণের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত লোকসভার অগ্রাধিকার ও উচ্চতর ক্ষমতা স্বাভাবিকভাবেই কাম্য। রাজ্যসভা অর্থসংক্রান্ত প্রস্তাব উত্থাপন করিতে পারে না। লোকসভা যে আকারে অর্থসংক্রান্ত প্রস্তাব পাস করে, রাজ্যসভা যদি সেই প্রস্তাবে সম্মতি দান না করে, তাহা হইলে ১৪ দিন পর প্রস্তাবটি লোকসভার ইচ্ছামত আইনে পরিণত হয়। সুতরাং অর্থ-সংক্রান্ত ব্যাপারেও রাজ্যসভার আদৌ কোন বৈশিষ্ট্য নাই।

প্রশ্নোত্তরের সাহায্যে মুলতুবি প্রস্তাব আনয়ন করিয়া রাজ্যসভা মন্ত্রী পরিষদের কার্যের উপর প্রভাববিস্তার করিতে পারিলেও অনাস্থা প্রস্তাব পাস করিয়া মন্ত্রিপরিষদকে অপসারণ করিতে পারে না।

তবে শাসনতান্ত্রিক আইন পরিবর্তনের ক্ষেত্রে রাজ্যসভা লোকসভার সমক্ষমতার অধিকারী। ইহা ছাড়া রাজ্যসভ দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সংখ্যাধিক্য ভোটে প্রস্তাব পাশ করিয়া জাতীয় স্বার্থসংরক্ষণের উদ্দেশ্যে কোন রাজ্য-তালিকাভুক্ত বিষয়ের উপর আইন প্রণয়ন করিবার অনুরোধ করিতে পারে। রাষ্ট্রপতির ও উপ-রাষ্ট্রপতির নির্বাচন ও অপসারণে এবং সুপ্রীম কোর্ট ও উচ্চ বিচারালয়ের বিচারপতিগণের পদচ্যুতি ব্যাপারে রাজ্যসভা লোকসভার সহিত একযোগে কাজ করিতে পারে।

ভারতের উচ্চ-কক্ষ রাজ্যসভার গঠনপ্রকৃতি ও ক্ষমতা পর্যালোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, শাসনতন্ত্রের রচয়িতাগণ ইহাকে একটি আদর্শ উচ্চ-কক্ষরূপে গঠন করিবার চেষ্টা না করিয়া শুধু একটি সংশোধনী কক্ষ

(Revising House) হিসাবে গঠন করিয়া গণতান্ত্রিক আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। ইংলণ্ডের লর্ড সভার অনুরূপ ভারতের রাজ্যসভার কোন প্রাচীন ঐতিহ্য বা সর্বোচ্চ বিচার-বিভাগীয় ক্ষমতা নাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট সভার গঠনপ্রকৃতির পশ্চাতে যে গণতান্ত্রিক ভিত্তি আছে, রাজ্যসভার তাহা নাই। সাধারণ আইন ও অর্থ-সংক্রান্ত আইন-প্রণয়নে, শাসন-কর্তৃপক্ষের নীতি ও কার্য নিয়ন্ত্রণে এবং বিশেষ বিচার-বিভাগীয় ক্ষমতা পরিচালনায় সিনেট সভা যে সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী, ভারতের রাজ্যসভার সে ক্ষমতা নাই। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের উভয় পরিষদ্ই সম-ক্ষমতার অধিকারী, ভারতের রাজ্য-সভা দুই-একটি বিষয় ব্যতীত লোকসভার সমান ক্ষমতার অধিকারী নহে।

সুতরাং দেখা যায় যে, দ্বি-পরিষদ্ আইনসভার সপক্ষে সাধারণতঃ যে যুক্তিগুলির অবতারণা করা হয়, ভারতের রাজ্যসভার ক্ষেত্রে সেগুলি সম্পূর্ণভাবে প্রযোজ্য নহে। নিম্ন-কক্ষের দ্রুত ও বিবেচনাহীন আইন-প্রণয়নে বাধা দেওয়া বা আঙ্গিক রাজ্যগুলির বিশেষ স্বার্থসংরক্ষণ ব্যাপারে অথবা জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তি-গণের নির্বাচন ব্যাপারে ভারতের উচ্চ-কক্ষ রাজ্যসভার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কোন ভূমিকা নাই বলিলেও চলে।

লোকসভা (House of the People)

অনধিক ৫০০ সংখ্যক সদস্য লইয়া নিম্ন পরিষদ্ গঠিত হয়। রাজ্যগুলির ভোটদাতৃগণ প্রত্যক্ষভাবে প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সদস্য নির্বাচন করেন। প্রত্যেক ৫ লক্ষে অন্যূন একজন প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবেন। এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে, ইংলণ্ডে প্রত্যেক সত্তর হাজার লোকের জন্য একজন প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা আছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি তিন লক্ষ আঠার হাজার লোকের জন্য একজন প্রতিনিধির ব্যবস্থা আছে।

লোকসভার প্রতিনিধির যোগ্যতা হইল যে, তাহাকে অন্ততঃপক্ষে ২৫ বৎসর বয়স্ক ভারতীয় নাগরিক হইতে হইবে। রাজ্য পুনর্গঠনের ফলে বর্তমান লোকসভার সদস্যসংখ্যা হইল ৫০৯। ইহার মধ্যে পার্লামেণ্ট সভা নির্ধারিত পদ্ধতিতে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হইতে অনধিক ২০ জন সদস্য নিযুক্ত হইবে।

লোকসভার আসনসংখ্যা নিম্নলিখিত হারে বিভিন্ন রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইয়াছে :—

রাজ্য (নির্বাচিত)		সদস্যসংখ্যা
১। অন্ধ্রপ্রদেশ	...	৪৩
২। আসাম	...	১২
৩। বিহার	...	৫৩
৪। গুজরাত	...	২২
৫। মহারাষ্ট্র	...	৪৪
৬। কেরল	...	১৮
৭। মধ্যপ্রদেশ	...	৩৬
৮। মাদ্রাজ	...	৪১
৯। মহীশূর	...	২৬
১০। উড়িষ্যা	...	২০
১১। পাঞ্জাব	...	২২
১২। রাজস্থান	...	২২
১৩। উত্তরপ্রদেশ	...	৮৬
১৪। পশ্চিমবঙ্গ	...	৩৬
কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল (নির্বাচিত)		
১। দিল্লী	...	৫
২। হিমাচল প্রদেশ	...	৪
৩। মণিপুর	...	২
৪। ত্রিপুরা	...	২
৫। গোয়া, দিউ ও দমন		২
৬। পণ্ডিচেরি	...	১
		৪৯৭

রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত		সদস্যসংখ্যা
১। জম্মু ও কাশ্মীর	...	৬
২। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ	...	১
৩। লাক্ষাদ্বীপপুঞ্জ	...	১
৪। উত্তর-পূব সীমান্ত অঞ্চল		১
৫। নাগাভূমি	...	১
৬। দাদ্রা ও নগর হেভেলি		১
৭। ইঙ্গ ভারতীয়	...	২
		১৩

৪৯৭ (নির্বাচিত)
+ ১৩ (মনোনীত) = মোট ৫১০

১৯৬২ সালে ভারতে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহাতে ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি লোকসভায় নিম্নলিখিত সংখ্যক আসন লাভ করিয়াছে :—

কংগ্রেস	...	৩৬১
সাম্যবাদী	...	২৯
পি. এস. পি.	...	১২
সোসালিষ্ট	...	৬
জনসংঘ	...	১৪
স্বতন্ত্র	..	১৮
ফরওয়ার্ড ব্লক, হিন্দু মহাসভা, তপশীলভুক্ত প্রভৃতি অন্যান্য দল		২৭
স্বতন্ত্র (Independent)		২৭
মোট নির্বাচিত সদস্য	...	৪৯৭

পার্লামেন্ট আইন-প্রণয়ন করিয়া ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর রাজ্যগুলির প্রতিনিধি-নির্বাচনের পৃথক্ ব্যবস্থা করিতে পারিত। তপশীলভুক্ত সম্প্রদায় ও তপশীলভুক্ত উপজাতির জন্য এবং ইঙ্গ-ভারতীয়দের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা হইয়াছে। নিম্ন পরিষদ্ সাধারণতঃ পাঁচ বৎসর স্থায়ী হইবে, তবে জরুরী অবস্থায় এই স্থিতিকাল পার্লামেন্ট এক বৎসর বৃদ্ধি করিতে পারে। রাষ্ট্রপতি পাঁচ বৎসরের পূর্বে এই সভা ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন।

লোকসভার ক্ষমতা ও কার্য (Powers and Functions of the House of the People)

শাসনতন্ত্রের রচয়িতাগণ ভারতে গণতান্ত্রিক নীতি অনুসারে নিম্ন-কক্ষ লোকসভাকে অধিকতর শক্তিশালী করিয়া গঠন করিয়াছেন। কি সাধারণ আইন, কি অর্থ-সংক্রান্ত আইন—উভয় আইনপ্রণয়ন ব্যাপারে লোকসভার শ্রেষ্ঠত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সাধারণ আইনপ্রণয়ন-ব্যাপারে লোকসভার মত শেষ পর্যন্ত বলবৎ হয়। রাজ্যসভার আপত্তি সত্ত্বেও ছয় মাস পর লোকসভা কর্তৃক গৃহীত আইন বলবৎ হয়। অর্থ-সংক্রান্ত আইন একমাত্র লোকসভায় উত্থাপিত হয় ও রাজ্যসভায় পাঠাইবার ১৪ দিন পর রাজ্যসভার বিনা সম্মতিতে আইন

বলিয়া গণ্য হয়। মন্ত্রিগণ একমাত্র লোকসভার অনাস্থা প্রস্তাবেই পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন। সুতরাং মন্ত্রিগণের দায়িত্বের অর্থই হইল লোকসভার নিকট দায়িত্ব।

ইহা ছাড়া, রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতির নির্বাচন ও অপসারণ, সুপ্রিম কোর্ট ও উচ্চ বিচারালয়ের বিচারপতিগণের পদচ্যুতি ও শাসনতন্ত্রের সংশোধন প্রভৃতি ব্যাপারে লোকসভা ইহার আপেক্ষিক সংখ্যাধিক্যের বলে শাসনকার্যে অধিকতর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। দেশে জনমতগঠনেও লোকসভার আলোচনা ও বিতর্ক অধিকতর প্রভাবশালী।

পার্লামেন্টের সদস্যগণের অধিকারসমূহ (Privileges of Members of Parliament)

অন্যান্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী ভারতের পার্লামেণ্ট সভার সদস্যগণ যাহাতে যথাযথভাবে তাঁহাদের কর্তব্য সম্পাদন করিতে পারেন তজ্জন্য তাঁহাদের কতকগুলি বিশেষ অধিকার দেওয়া হইয়াছে।

প্রথমতঃ, তাঁহারা বাক্‌স্বাধীনতার অধিকারী। আইনসভার ও সভার কোন কমিটিতে কোনপ্রকার মন্তব্য বা ভোটদানের জন্য তাঁহাদের কোন আদালতে অভিযুক্ত করা যায় না। দ্বিতীয়তঃ, সংবিধানে বলা হইয়াছে যে, পার্লামেণ্ট সভা আইন প্রণয়ন করিয়া যতদিন পর্যন্ত অধিকারসমূহ বিধিবদ্ধ না করিবে ততদিন পর্যন্ত ইংলণ্ডের কমন্স সভার সদস্যগণ যে সমস্ত অধিকার ভোগ করেন, ভারতের পার্লামেণ্টের সদস্যগণও সেই সমুদয় অধিকার ভোগ করিবেন।

পার্লামেণ্টের অধিবেশনকালে অথবা অধিবেশনের ৪০ দিন পূর্বে বা পরে কোন দেওয়ানী মামলায় অভিযুক্ত বলিয়া তাঁহাদিগকে আটক করা যাইবে না। অবশ্য এই বিশেষ অধিকার ফৌজদারী মামলা বা আটক আইনের প্রয়োগক্ষেত্রে কার্যকরী হয় না। পার্লামেণ্টের কোন সদস্য যদি জেলে প্রেরিত বা আটক হন তাহা হইলে তাহার সংবাদ অবিলম্বে পার্লামেণ্টে দিতে হইবে। পার্লামেণ্টের অধিবেশন চলা কালে ইহার অনুমতি ব্যতীত কোন সদস্যকে সাক্ষ্য দিবার জন্য আদালতে উপস্থিত হইবার জন্য আহ্বান করা যায় না বা জুরীর কার্য করিবার জন্য আহ্বান করা যায় না। এই সভা বাহিরাগতদের পার্লামেণ্ট সভায় উপস্থিতি নিষিদ্ধ করিতে পারে। পার্লামেণ্ট সভার প্রত্যেক পরিষদ্ ইহার অধিকার ভঙ্গ বা অবমাননার জন্য শাস্তি প্রদান করিতে পারে। ইহার

অধিকার ভঙ্গ বা অবমাননা হইয়াছে কিনা এ সম্পর্কে পার্লামেন্টের সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার কোন আদালতের নাই। এ সম্পর্কে একটি বিষয় মনে রাখিতে হইবে যে, যে পর্যন্ত না পার্লামেন্ট সভা আইন প্রণয়ন করিয়া ইহার অধিকারগুলি বিধিবদ্ধ করেন সে পর্যন্ত ভারতের পার্লামেন্ট সভা কমন্স সভার সদস্যগণ যে যে অধিকারগুলি ভোগ করেন, ভারতেও সদস্যগণ অনুরূপ অধিকার ভোগ করিবেন। এই অধিকারভোগ ক্ষেত্রে যদি পার্লামেন্টের কোন অধিকার নাগরিকগণের মৌলিক অধিকার বিরোধী হয়, তাহা হইলে পার্লামেন্টের অধিকারই প্রাধান্য লাভ করিবে। এই সভা বহিরাগতদের সভার অধিবেশনে উপস্থিত থাকিতে নিষেধ করিতে পারে। সভায় যে সমস্ত বিতর্ক হয় তাহা বা সভার কার্যবিবরণী প্রকাশ এই সভা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে। সভার বিতর্কে মানহানিকর বিষয় থাকিলেও এই সভার তাহা প্রকাশ করিবার অধিকার আছে। এই সভা প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচন নিষ্পত্তি করিতে পারে এবং কোন নির্বাচনপ্রার্থীকে আইনতঃ অযোগ্য ঘোষণা করিয়া তাঁহার আসন শূন্য বলিয়া ঘোষণা করিতে পারে। সভার মধ্যে অনুষ্ঠিত সকল ব্যাপারের নিষ্পত্তি এই সভা করিতে পারে। মানহানির জন্য এই সভা ইহার সদস্য বা সদস্য-বহির্ভূত ব্যক্তিদের তিরস্কার করিয়া, বহিষ্করণ করিয়া বা সদস্যদের কিছুকাল পর্যন্ত সদস্যপদ হইতে বঞ্চিত রাখিয়া শাস্তি দান করিতে পারে। এই সভা ইহার কার্যসূচী নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। সভার সদস্যগণ সমবেতভাবে সভার সভাপতির মাধ্যমে রাষ্ট্রপতিসকাশে আবেদন করিতে পারে।

পার্লামেন্ট সভার কার্য ও ক্ষমতা (Powers and Functions of Parliament)

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, ভারতের পার্লামেন্ট সভা আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অ-সার্বভৌম আইনসভার পর্যায়ভুক্ত। ভারতের পার্লামেন্ট সভা যুক্তরাষ্ট্রীয় তালিকাভুক্ত এবং যুগ্ম-তালিকাভুক্ত বিষয়গুলির উপর আইন প্রণয়ন করিতে পারে। অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাব ব্যতীত অন্য প্রস্তাবগুলি যে-কোন পরিষদে উত্থাপিত হইতে পারে। কোন প্রস্তাব আইনে পরিণত হইতে হইলে উভয় পরিষদের সম্মতি অপরিহার্য। যদি কোন পরিষদ্ সম্মতিপ্রদানে বিরত থাকে এবং ছয় মাসের পরও যদি মতামত জ্ঞাপন না করে, তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি

উভয় পরিষদের যুক্ত অধিবেশন আহ্বান করিবেন এবং যুক্ত অধিবেশনে অধিকাংশ ভোটে বিলটি গৃহীত হইলে উহা আইনে পরিণত হইবে। উভয় পরিষদ্ কর্তৃক কোন প্রস্তাব গৃহীত হইলে ঐ গৃহীত প্রস্তাব রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য তাহার নিকট উপস্থাপিত হইবে। রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিলে প্রস্তাবটি আইনে পরিণত হয়। রাষ্ট্রপতি যদি প্রস্তাবটিতে তাঁহার সম্মতি প্রদান না করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে তাঁহার সুপারিশসহ উক্ত প্রস্তাব পুনর্বিবেচনার জন্য পার্লামেণ্ট সভায় প্রেরণ করিতে হয়। পার্লামেণ্ট সভা পুনর্বিবেচনা করিয়া প্রস্তাবটিকে যদি পুনরায় রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ করে, তাহা হইলে এই দ্বিতীয়বার রাষ্ট্রপতি আর তাঁহার সম্মতি প্রত্যাহার করিতে পারেন না।

অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাব ভিন্ন পদ্ধতিতে অনুমোদিত হয়। অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাব উচ্চ পরিষদে উত্থাপিত হইতে পারে না। নিম্ন পরিষদ্ কর্তৃক অনুমোদিত হইলে এই প্রস্তাবগুলি উচ্চ পরিষদে প্রেরিত হয় এবং উচ্চ পরিষদ্ যদি ১৪ দিনের মধ্যে ইহার মতামত জ্ঞাপন না করে তাহা হইলে প্রস্তাবটি উচ্চ পরিষদের সম্মতি ব্যতিরেকে আইনে পরিণত হইবে। এ বিষয়ে ভারতের সংবিধান বৃটেনের লর্ড সভার অনুরূপ ভাবেই অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাবগুলির উপর রাজ্যসভার ক্ষমতা সঙ্কুচিত করিয়াছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, কোন প্রস্তাব অর্থ-সংক্রান্ত কি না, সে সম্পর্কে স্পীকারই চূড়ান্ত মীমাংসা করিবার অধিকারী।

এতদ্ব্যতীত রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জরুরী অবস্থার ঘোষণা পার্লামেণ্ট সভার অনুমোদনসাপেক্ষ। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জরুরী অবস্থা ঘোষণাকালে অথবা রাজ্যসভা কর্তৃক অথবা এক বা একাধিক রাজ্য আইনসভা কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া পার্লামেণ্ট সভা রাজ্যতালিকাভুক্ত বিষয়ের উপর আইন প্রণয়ন করিতে পারে।

এতদ্ব্যতীত পার্লামেণ্ট সভার নির্বাচিত সদস্যগণ রাষ্ট্রপতি-নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিবার ক্ষমতার অধিকারী। পার্লামেণ্ট সভার উভয় কক্ষের সদস্যগণ কর্তৃক উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধাচরণের জন্য পার্লামেণ্টের যে-কোন কক্ষ রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করিতে পারে এবং উভয় কক্ষের বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে গৃহীত প্রস্তাব পাস করিয়া রাষ্ট্রপতিকে তাঁহার পদ হইতে অপসারিত করিতে পারে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা লোকসভার নিকট যৌথভাবে দায়ী। লোকসভা মন্ত্রীদের বেতন মঞ্জুর করে এবং সরকারী আয়-ব্যয়ের বাৎসরিক হিসাব প্রত্যাখ্যান দ্বারা অথবা মন্ত্রিসভা কর্তৃক প্রস্তাবিত খসড়া আইন না-মঞ্জুর করিয়া বা মন্ত্রিসভা-

অনুসৃত নীতি প্রত্যাখ্যান করিয়া বা সরাসরি মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাস করিয়া মন্ত্রিসভার পতন ঘটাইতে পারে।

শাসনতন্ত্র সংশোধন করিবার ক্ষমতা পার্লামেণ্ট সভার হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। কতকগুলি বিষয়ে সংশোধন সাধারণ পদ্ধতিতে সম্পন্ন হইতে পারে, অন্য বিষয়গুলির ক্ষেত্রে বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠের সম্মতি প্রয়োজন হয়।

পার্লামেণ্ট সভার প্রত্যেক কক্ষ ⅔ সংখ্যক সদস্যের ভোটে গৃহীত প্রস্তাব আনয়ন করিয়া সুপ্রিম কোর্ট ও উচ্চ বিচারালয়ের বিচারপতিগণকে অবধারিত অসদাচরণ বা অযোগ্যতার জন্য অপসারণের ব্যবস্থা করিতে পারে।

রাজ্যসভা বিশেষ সংখ্যাধিক্যের ভোটে গৃহীত প্রস্তাব দ্বারা রাজ্য-তালিকাভুক্ত যে-কোন বিষয়ের উপর জাতীয় স্বার্থের উৎকর্ষের উদ্দেশ্যে সাময়িকভাবে পার্লামেণ্ট সভার উপর আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা প্রদান করিতে পারে।

পার্লামেণ্ট হইল ভারতের জাতীয় মহাসভা। এই সভায় সমগ্র দেশের স্বার্থ-সম্পর্কিত বিষয়গুলির বিশদ আলাপ-আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। পার্লামেণ্ট ইহার এই প্রায়-অবাধ ক্ষমতা পরিচালনা দ্বারা একদিকে যেমন ভারতের জনমত সজাগ রাখে, অপর দিকে তদ্রূপ শাসনকর্তৃপক্ষকে নিয়ন্ত্রিত করে। পার্লামেণ্টের এই নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতার অবর্তমানে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে না। পার্লামেণ্ট সভার আলাপ-আলোচনা ও কার্যপদ্ধতি রাজ্য আইনসভা-গুলিকেও অনুপ্রেরণা দান করিয়া থাকে।

রাজ্যসভা ও লোকসভার মধ্যে সম্পর্ক (Relation between the two Houses of Parliament)

ভারতের পার্লামেণ্ট সভা দুইটি পরিষদ্ লইয়া গঠিত। নিম্ন পরিষদ্ অর্থাৎ লোকসভা লোকসংখ্যার ভিত্তিতে জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করে। উচ্চ পরিষদ্ লোকসংখ্যার ভিত্তিতে গঠিত হইলেও পরোক্ষভাবে বিভিন্ন রাজ্যগুলির প্রতিনিধিত্ব করে।

ক্ষমতার দিক দিয়া দেখিতে গেলে সাধারণ আইনপ্রণয়ন-ব্যাপারে উভয় পরিষদ্ প্রায় সমান ক্ষমতার অধিকারী। অর্থ সংক্রান্ত প্রস্তাব ব্যতীত অন্য যে-কোন আইনের প্রস্তাব যে-কোন পরিষদে উত্থাপিত হইতে পারে এবং উভয় পরিষদের সম্মতি ব্যতীত ঐ প্রস্তাব আইনে পরিণত হইতে পারে না।

উভয় পরিষদের মধ্যে আইনপ্রণয়ন-ব্যাপারে কোন মতভেদ হইলে রাষ্ট্রপতি উভয় পরিষদের যুক্ত অধিবেশন আহ্বান করিতে পারেন এবং এই যুক্ত অধিবেশনে সংখ্যাধিক্যের ভোটে প্রস্তাবটি সম্পর্কে চূড়ান্ত মীমাংসা হয়। তবে রাজ্যসভা অপেক্ষা লোকসভার সদস্যসংখ্যা দ্বিগুণ; সেইজন্য মতবিরোধ ঘটিলে শেষ পর্যন্ত লোকসভার জয় সুনিশ্চিত। কিন্তু বৃটেনের কমন্স সভার মত ভারতের লোকসভা উচ্চ পরিষদের সিদ্ধান্ত একেবারে প্রত্যক্ষভাবে বাতিল করিতে পারে না।

অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাবগুলি নিম্ন পরিষদেই উত্থাপিত হয়। নিম্ন পরিষদ্ কর্তৃক গৃহীত হইলে প্রস্তাবটি উচ্চ পরিষদে প্রেরণ করা হয়। উচ্চ পরিষদের অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাব সংশোধন করিবার ক্ষমতা আছে এবং উচ্চ পরিষদ্ কর্তৃক আনীত সংশোধন প্রস্তাব যদি নিম্ন পরিষদ্ কর্তৃক গৃহীত হয়, একমাত্র তাহা হইলেই উক্ত প্রস্তাব বৈধ বলিয়া বিবেচিত হয়। নিম্ন পরিষদ্ কর্তৃক উত্থাপিত অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাব উচ্চ পরিষদে প্রেরিত হইবার ১৪ দিন পর পর্যন্ত যদি তাহার সুপারিশসহ অথবা বিনা সুপারিশে নিম্ন পরিষদে প্রেরিত না হয়, তাহা হইলে উক্ত প্রস্তাব নিম্ন পরিষদের মতানুযায়ী আইনে পরিণত হইবে। বৃটেনে লর্ড সভার অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাব সংশোধন করিবার অধিকার নাই। অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাবগুলি বিবেচনার জন্য লর্ড সভাকে ১৯১১ খৃষ্টাব্দের আইন অনুসারে মাত্র একমাস সময় দেওয়া হইয়াছে। এই সময় অতিবাহিত হইবার পর লর্ড সভার বিনা অনুমোদনেই প্রস্তাব আইনে পরিণত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চ পরিষদ্—সিনেট সভা—অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাব উত্থাপন করিতে না পারিলেও ইহা অর্থসংক্রান্ত প্রস্তাবগুলিকে ব্যাপকভাবে সংশোধন করিবার ক্ষমতার অধিকারী। ভারতের উচ্চ পরিষদ্ মাত্র ১৪ দিন পর্যন্ত অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাব স্থগিত রাখিতে পারে।

গ্রেট বৃটেনের প্রথার মত ভারতের মন্ত্রিপরিষদ্ও লোকসভার নিকট দায়ী। রাজ্যসভা অর্থাৎ উচ্চ পরিষদ্ অনাস্থা-প্রস্তাব আনয়ন করিয়া মন্ত্রিপরিষদ্‌কে অপসারিত করিতে পারে না। এ বিষয়েই নিম্ন পরিষদ্ অধিকতর ক্ষমতার অধিকারী।

বৃটেনে ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চ পরিষদের বিশেষক্ষেত্রে বিশেষ পদ্ধতিতে বিচার করিবার ক্ষমতা আছে। নিম্ন পরিষদ্ অভিযোগ আনয়ন করিতে পারে, কিন্তু বিচারক্ষমতার একমাত্র অধিকারী হইল উচ্চ পরিষদ। ভারতে উচ্চ পরিষদ্‌কে এইরূপ একচেটিয়া ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই। রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে যে-

কোন পরিষদ্‌ই অভিযোগ আনয়ন করিতে পারে এবং একটি পরিষদ্ কর্তৃক অভিযোগ আনীত হইলে অন্য পরিষদ্ ঐ আনীত অভিযোগ সম্পর্কে অনুসন্ধান করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে। সুতরাং ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থার সর্বক্ষেত্রে নিম্ন পরিষদের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়।

পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষের যুগ্ম অধিবেশন—Joint sitting of both the Houses of Parliament.

কোন সাধারণ আইনের প্রস্তাব আইনে পরিণত হইতে হইলে উভয় কক্ষের সম্মতি প্রয়োজন। অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাব ব্যতীত অন্য প্রস্তাব সম্পর্কে যদি উভয় কক্ষ একমত হইতে না পারে তাহা হইলে উভয় কক্ষের যুক্ত অধিবেশনের ব্যবস্থা করা হয়। রাষ্ট্রপতি নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলিতে যুক্ত অধিবেশন আহ্বান করিতে পারেন। প্রথমতঃ, যদি কোন প্রস্তাব এক কক্ষ কর্তৃক গৃহীত হওয়ার পর দ্বিতীয় কক্ষে প্রেরিত হইলে সেই কক্ষ কর্তৃক বাতিল হয়। দ্বিতীয়তঃ, উভয় কক্ষই যখন সংশোধন প্রস্তাবে একমত না হয়। তৃতীয়তঃ, এক কক্ষ হইতে প্রেরিত হইবার পর ছয়মাসের অধিককাল পর্যন্ত যদি অন্য কক্ষ সেই প্রস্তাবটি পাশ না করে।

যুক্ত অধিবেশনে সাধারণতঃ লোকসভার স্পীকার সভাপতিত্ব করেন। যুক্ত অধিবেশনে নির্ধারিত বিষয় সম্পর্কে ব্যতীত অন্য কোন সংশোধনী প্রস্তাব করা যায় না। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, যদি অপর কক্ষ কর্তৃক আনীত সংশোধনী প্রস্তাব প্রস্তাবকারী কক্ষ কর্তৃক গৃহীত না হওয়ার ফলে উভয় কক্ষের মধ্যে মতভেদ ঘটে তাহা হইলে যে কারণে মতভেদ ঘটিয়াছে, সেই কারণ সম্পর্কে সংশোধনী প্রস্তাব আনা যাইতে পারে। যদি যুক্ত অধিবেশনে সংশোধন সহ কোন প্রস্তাব উভয় কক্ষের উপস্থিত ও ভোটদানকারী সংখ্যাধিক্যের সম্মতিতে পাশ হয় তাহা হইলে এই প্রস্তাব উভয় কক্ষ কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাব বলিয়া ধরা হয়। রাজ্যসভা অপেক্ষা লোকসভার সদস্য সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ। সুতরাং যুক্ত অধিবেশনে লোকসভার মত প্রবল হয়।

স্পীকার (The Speaker of the House of the people)

লোকসভা ইহার কার্য-পরিচালনার জন্য সদস্যগণের মধ্য হইতে একজন সভাপতি ও একজন সহ-সভাপতি নির্বাচন করে। সভাপতি স্পীকার ও সহ-

সভাপতি ডেপুটি স্পীকার নামে অভিহিত হন। উভয়কেই লোকসভার সদস্য হইতে হইবে এবং লোকসভার সদস্যপদ-চ্যুত হইলে তাঁহারা স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার থাকিতে পারেন না। তাঁহারা নিজেরা কাজে ইস্তফা দিতে পারেন কিংবা লোকসভা সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে প্রস্তাব পাস করিয়া তাঁহাদিগকে অপসারিত করিতে পারে। এইরূপ প্রস্তাব পাস করিতে হইলে ১৪ দিনের নোটিশ দিতে হয়।

ভারতে লোকসভার স্পীকার ইংলণ্ডের কমন্স সভার স্পীকারের ক্ষমতার অনুরূপ ক্ষমতা ভোগ করেন। তিনি লোকসভায় সভাপতিত্ব করেন। তিনি সভার বিতর্ক পরিচালনা করেন এবং সভার নিয়ম-কানুন ব্যাখ্যা ও বলবৎ করেন। কোন বিষয়ে বৈধতার প্রশ্ন উঠিলে তাঁহার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া পরিগণিত হয়। নির্বাচনের পর তাঁহাকে দল-নিরপেক্ষ থাকিয়া সকল দলকে সমান অধিকার দিতে হয়। কোন আইন সম্পর্কে বিতর্কে মুলতুবি প্রস্তাব আনিতে হইলে তাঁহার সম্মতি প্রয়োজন। তাঁহার অনুমতি ব্যতীত কেহই সভায় বক্তৃতা করিতে পারেন না। তিনি অধিবেশনের শৃংখলা রক্ষা করেন। তিনি প্রয়োজন বোধ করিলে সভার কাজ স্থগিত রাখিতে পারেন। তিনিই হইলেই সদস্যগণের অধিকারের রক্ষক। উভয় পক্ষে সমান সংখ্যক ভোট হইলে তিনি একটি অতিরিক্ত ভোট দিতে পারেন। বৃটিশ পার্লামেণ্ট সভার স্পীকারের মতই কোন প্রস্তাব অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাব কিনা এ সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উঠিলে ভারতের স্পীকারও তাহার চূড়ান্ত মীমাংসা করিতে পারেন। কোন আইনের প্রস্তাব রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যসভার নিকট প্রেরণের পূর্বে লোকসভার মুখপাত্র হিসাবে স্পীকারকেই প্রস্তাবটিতে স্বাক্ষরযুক্ত করিতে হয়। স্পীকারের অনুপস্থিতিতে ডেপুটি স্পীকার সভাপতিত্ব করেন।

ভারতীয় পার্লামেণ্টে বিরোধী দলের ভূমিকা (Role of the Opposition in the Indian Parliament)

ভারতে বৃটিশ শাসনব্যবস্থার অনুরূপভাবে পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে। এই শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হইল দলীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা। দলীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতার অর্থ হইল যাঁহারা রাজনৈতিক ব্যাপারে ভিন্ন মত পোষণ করেন, তাঁহারা ভিন্ন রাজনৈতিক দল গঠন করিয়া তাঁহাদের মতানুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করিতে সংঘবদ্ধ হইয়া থাকেন। এই উদ্দেশ্যে

ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক দল নির্বাচনে জয়ী হইয়া সরকার গঠন করিবার জন্য সচেষ্ট হন। রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে এই প্রতিযোগিতার ফলে যে শাসনব্যবস্থার শুধু উৎকর্ষ সাধিত হয় তাহা নহে, শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাজনৈতিক দল বিরোধী দলের সমালোচনার ভয়ে জনস্বার্থ-বিরোধী কোন কায করিতে সাহসী হয় না। যে কোন উপায়ে হউক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দলকে ক্ষমতাচ্যুত করিয়া ক্ষমতা গ্রহণ করাই বিরোধী দলের একমাত্র কর্তব্য নহে। গঠনমূলক সমালোচনার দ্বারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দলকে সর্বদা জাতীয় স্বার্থের অনুকূল কাযকলাপে প্রবোচিত করা বিরোধী দলের অন্যতম প্রধান কর্তব্য। এজন্য প্রয়োজন হইলে বিরোধী দলকে সরকারের সহিত সহযোগিতা করিবার প্রয়োজন হইতে পারে।

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলগুলির কাযকলাপ গ্রেট বৃটেনে যেরূপ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে, এক সুইজারল্যাণ্ড ব্যতীত অন্য কোন দেশে তাহার দৃষ্টান্ত বিরল এবং এই সাফল্যের পশ্চাতে রহিয়াছে ইংলণ্ডের প্রধানতঃ দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা। ইংলণ্ডে বিরোধী দলের প্রধান কায হইল সরকারী কাযের সমালোচনা করা। বিরোধী দল বলপূর্বক সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত না করিয়া সরকারী কাযের সমালোচনা দ্বারা জনমত প্রভাবিত করে। জনমত অনুকূল হইলে পরবর্তী নির্বাচনকালে বিরোধী দলই সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিয়া শাসনক্ষমতা লাভ করিতে পারে। এইজন্য ইংলণ্ডে বিরোধী দলকে রাজার অনুগত বিরোধী দল (His Majesty's Loyal Opposition) বলা হয়।

নূতন শাসনতন্ত্র অনুসারে ভারতেও পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে এবং শাসনকায নির্বাচনে জয়ী সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজনৈতিক দল (কংগ্রেস) কর্তৃক পরিচালিত হয়। ইংলণ্ডের দলীয় শাসনব্যবস্থার সহিত ভারতের দলীয় শাসনব্যবস্থার তুলনা এইখানে শেষ হয়। কারণ ইংলণ্ডের দীর্ঘকালব্যাপী রাজনৈতিক ইতিহাসের বিবর্তনে রাজনৈতিক দলগুলির যে ঐতিহ্য সৃষ্টি হইয়াছে, ভারতের দলগুলির সে ঐতিহ্য বা সে-জাতীয় দৃষ্টিভংগীর অভাব দেখা যায়। ভারতে সুসংবদ্ধ ও জনমতের প্রতিনিধিত্ব করিবার অধিকারী হইল কংগ্রেস দল। ১৯৬২ সালের নির্বাচনে মোট নির্বাচিত ৪৯৪ জন সদস্যের মধ্যে কংগ্রেসের ৩৬১ জন নির্বাচিত হইয়াছিলেন। ইহার পর হইল ভারতের সাম্যবাদী দলের স্থান—এই দল ২৯টি আসন দখল করিয়া দ্বিতীয় দল হিসাবে সরকার-বিরোধী দল রূপে পরিগণিত হয়। ইহা ছাড়া, পি. এস. পি., জনসংঘ, স্বতন্ত্র প্রভৃতি

নানা দল ও উপদল পার্লামেন্ট সভায় দেখা যায়। এই দল বা উপদলগুলিকে সঠিকভাবে রাজনৈতিক দল আখ্যা দেওয়া চলে না। ভারতের পার্লামেন্ট সভায় ক্ষমতাসীন দল, কংগ্রেসের সংখ্যাধিক্য এত বিপুল যে, সাম্যবাদী দলের পক্ষে এককভাবে অথবা সবদল সংহতিক্ষেত্রেও ক্ষমতাসীন কংগ্রেস দলকে ক্ষমতাচ্যুত করা অসম্ভব। ইংলণ্ডে ক্ষমতাসীন দল ও বিরোধী দলের সংখ্যাগত পার্থক্য অকিঞ্চিৎকর। সুতরাং ক্ষমতাসীন দলের বিরোধী দলের ভয়ে সর্বদা সন্ত্রস্ত থাকিতে হয় এবং এজন্য ক্ষমতাসীন দলের নেতা অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী বিরোধী দলের নেতার সহযোগিতা কামনা করেন। ভারতে ক্ষমতাসীন দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা এত অধিক যে, তাহাদের পদচ্যুত হইবারও কোন সম্ভাবনা নাই, পরন্তু তাঁহারা বিরোধী দলের সমালোচনায় আদৌ কর্ণপাত না করিতে পারেন। সুতরাং ভারতে বিরোধী দল থাকিলেও এই দলের মতামত শাসনকার্যের উপর খুব কম ক্ষেত্রেই প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। ইহা ছাড়া বিরোধী দলগুলির মধ্যে কোন ঐক্যভাব নাই। এই কারণে অধিকাংশ দলগুলিই বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছে। ভারতে শক্তিশালী বিরোধী দলের অভাবের প্রধান কারণ হইল শিক্ষিত সচেতন ও স্বাধীনভাবে উদ্বুদ্ধ জনমতের অভাব। এই শিক্ষিত ও সচেতন জনমতের অভাবে একটি মাত্র রাজনৈতিক দল আপেক্ষিক সংখ্যাগরিষ্ঠতার বলে দীর্ঘদিন ধরিয়া ক্ষমতায় আসীন আছে। এই ব্যবস্থা একদলীয় শাসনব্যবস্থার নামান্তর মাত্র।

আইন-প্রণয়ন পদ্ধতি (Process of Law-making in Parliament)

অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশসমূহের অনুরূপ ভাবে ভারতেও একটি বিলকে আইনে পরিণত হইবার পূর্বে কয়েকটি বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়া উভয় পরিষদের অনুমোদন লাভ করিতে হয়। প্রস্তাবক কর্তৃক আইনের খসড়া প্রস্তুত হইলে প্রস্তাবককে উক্ত বিল আইনসভায় উত্থাপন করিবার জন্য এক মাস পূর্বে অনুমতি গ্রহণ করিতে হয়। নির্ধারিত দিনে বিলটি উত্থাপিত হয় এবং প্রস্তাবক আইনসভায় নিম্নলিখিত তিনটির মধ্যে একটি প্রস্তাব করিতে পারেন : (১) পরিষদে সরাসরি বিলটির বিচার-বিবেচনা করা হউক ; (২) বিলটিকে বিচার-বিবেচনার জন্য নির্দিষ্ট কমিটিতে প্রেরণ করা হউক ; (৩) বিলটি সম্পর্কে জনমত জানিবার জন্য উহাকে গেজেটে প্রচার করা হউক। যদি কোন মন্ত্রী কোন বিল উত্থাপন করেন তাহা হইলে উক্ত বিল উত্থাপনের জন্য অনুমতির প্রয়োজন হয় না।

সরকারী বিল সরাসরি গেজেটে প্রকাশ করা যাইতে পারে। এই পদ্ধতিকে বিলের উত্থাপন এবং প্রথম পাঠ (Introduction and First Reading) বলা হয়।

এই পর্যায়ে বিলটির নীতি-সম্পর্কে আলোচনা চলে, কিন্তু বিলটি সম্পর্কে কোন বিশদ আলোচনা চলিতে পারে না। জনমত জানিবার উদ্দেশ্যে বিলটি প্রচার করিবার সময় অতিবাহিত হইলে প্রস্তাবক পুনরায় বিলটিকে সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরণ করিবার জন্য প্রস্তাব করিতে পারেন।

বিলটি যদি সভার অনুমোদনক্রমে বিবেচনার্থ সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরিত হয়, তাহা হইলে এই কমিটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিলটি পরীক্ষা করে এবং বিলটিকে তাহাদের সুপারিশসহ আইনপরিষদে প্রেরণ করে। কমিটি যদি বিলটির কোন পরিবর্তন না করে তাহা হইলে কমিটি শুধু বিলটিকে ফেরত পাঠায়; আইন-সভায় কমিটির কোন বিবরণী পেশ করিতে হয় না। এই পর্যায়কে কমিটি পর্যায় (Committee Stage) বলা হয়।

ইহার পর বিলের উত্থাপক বিলটি দ্বিতীয় পাঠের (Second Reading) প্রস্তাব করেন। এই পর্যায়ে বিলটি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা চলে। সদস্যগণ বিলটি সম্পর্কে সংশোধন প্রস্তাব আনিতে পারেন। অতঃপর বিলটির সম্পর্কে ভোট গ্রহণ করা হয়।

বিলটি যদি সংখ্যাধিক্যের ভোটে অনুমোদিত হয়, তাহা হইলে বিলের উত্থাপক বিলটির তৃতীয় পাঠের (Third Reading) প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এই পর্যায়ে মৌখিক সংশোধন প্রস্তাব ব্যতীত বিল-সম্পর্কে অন্য কোনরূপ সংশোধন প্রস্তাব করা যায় না। বিলটিকে হয় সমগ্রভাবে গ্রহণ বা সমগ্রভাবে বর্জন করা চলে।

এইরূপে একটি পরিষদ কর্তৃক গৃহীত হইলে বিলটি অপর পরিষদে প্রেরিত হয়। শাসনতান্ত্রিক আইন অনুযায়ী উভয় পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হইলে বিলটি রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়া আইনে পরিণত হয়।

পার্লামেণ্টে অর্থ-সংক্রান্ত বিল (Financial Legislation in Parliament)

প্রত্যেক দেশে অর্থবিষয়ক ব্যাপারে আইনসভার ক্ষমতা কতকগুলি সাধারণ নিয়ম দ্বারা পরিচালিত হয়। ভারতেও এই সাধারণ নিয়মগুলি প্রচলিত দেখা

যায়। প্রথমতঃ, অর্থ-সংক্রান্ত ব্যাপারে নিম্নপরিষদ অর্থাৎ লোকসভা হইল প্রধান নিয়ামক। দ্বিতীয়তঃ, শাসনকর্তৃপক্ষের সম্মতি ব্যতীত (১) করধার্য বা অন্য উপায়ে অর্থসংগ্রহ বা (২) ব্যয়-মঞ্জুরী দাবী করা যায় না। তৃতীয়তঃ, পার্লামেণ্টের অনুমোদন ব্যতীত কোন প্রকারে অর্থ সংগ্রহ বা অর্থ ব্যয় করা যায় না।

সরকারী বৎসর ১লা এপ্রিল হইতে আরম্ভ হইলেও জানুয়ারী বা ফেব্রুয়ারী মাস হইতে সরকারী বিভিন্ন বিভাগগুলি তাহাদের আগামী বৎসরের আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করে। আয়-ব্যয়ের এই হিসাব সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হইলে মার্চ মাসে এই হিসাব পার্লামেণ্টে উপস্থিত করা হয়। এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ভারতের শাসনতন্ত্র অনুসারে এই হিসাব রাষ্ট্রপতি প্রত্যেক আর্থিক বৎসরে পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষে উপস্থিত করাইবেন। সুতরাং বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রস্তুত করা এবং পার্লামেণ্টে ইহা উপস্থিত করা রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব। কার্যতঃ রাজস্বমন্ত্রী লোকসভায় এই আর্থিক বিবরণী পেশ করিয়া একটি বক্তৃতা প্রদান করেন।

আনুমানিক ব্যয়বরাদ্দকে বিবরণীতে দুই ভাগে ভাগ করিয়া দেখাইতে হয়।

কয়েকটি নির্দিষ্ট ব্যয়ের দাবী (রাষ্ট্রপতির জন্য খরচ, লোকসভার স্পীকার ও সহকারী স্পীকার, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিগণের বেতন ইত্যাদি) ব্যতীত অন্য সাধারণ দাবীও এই বিবরণীতে থাকে। নির্দিষ্ট ব্যয়ের দাবীসম্পর্কে পার্লামেণ্ট সভায় আলোচনা চলিতে পারে, কিন্তু সেগুলি সম্পর্কে সদস্যগণ ভোট প্রদান করিতে পারেন না। অন্যান্য দাবিগুলি লোকসভার অনুমোদনসাপেক্ষ। লোকসভা অনুমোদনসাপেক্ষ ব্যয়বরাদ্দগুলিকে প্রত্যাখ্যান বা হ্রাস করিতে পারে, কিন্তু কোন ব্যয়বরাদ্দ বৃদ্ধি করিতে পারে না বা নূতন ব্যয়ের প্রস্তাব করিতে পারে না। ব্যয়বরাদ্দ সম্পর্কে আলোচনা করিবার সময় লোকসভার স্পীকার পার্লামেণ্টের নেতাদের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করেন এবং এই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমস্ত ব্যয়বরাদ্দের দাবীর আলোচনা ও ভোট গ্রহণ শেষ করিতেই হয়। ব্যয়বরাদ্দের দাবী অনুমোদিত হইলে বৃটিশ পার্লামেণ্টে প্রচলিত প্রথানুযায়ী আর একটি বিশেষ আইন পাস করিয়া ভারতের পার্লামেণ্ট সভা শাসন-কর্তৃপক্ষকে সঞ্চিত তহবিল হইতে অর্থ তুলিবার ক্ষমতা প্রদান করেন।

করধার্য বা করসংগ্রহের জন্য আইন পাস করিতে হয়। এই প্রস্তাবগুলি রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে রাজস্ব বিল (Finance Bill) আকারে আইনসভায় উত্থাপিত হয়।

শাসনতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি অতিরিক্ত ব্যয়বরাদ্দ বিল পার্লামেণ্টে উপস্থাপিত করাইতে পারেন। লোকসভার অগ্রিম এবং বিশেষ ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব পাশ করিবার ক্ষমতা আছে।

আইনসভার বিভিন্ন সংস্থা (Committees of the Legislature)

অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশসমূহের ন্যায় ভারতের পার্লামেণ্ট সভার কাজ আইনসভার বিশেষ সংস্থার দ্বারা পরিচালিত হয়। প্রত্যেকটি সংস্থা বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য গঠিত হইয়াছে এবং আইনসভার এই বিশেষ সংস্থাগুলি ইহাদের কাজ বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া আইনসভায় ইহাদের মতামত পেশ করে।

ভারতের আইনসভার উভয় কক্ষে এইরূপ অনেকগুলি সংস্থা আছে। এক লোকসভাতেই প্রায় ১২টি বিভিন্ন সংস্থা আছে, যথা,—

১। সিলেক্ট কমিটি - Select Committee—আইনের খসড়া কোন সিলেক্ট কমিটিতে পাঠান হউক—এই মর্মে কোন প্রস্তাব পাস হইলে লোকসভা কর্তৃক সিলেক্ট কমিটির সদস্যগণ নিযুক্ত হন। এই কমিটির চেয়ারম্যান স্পীকার কর্তৃক নিযুক্ত হন। এই কমিটি আইনের প্রস্তাব সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য ও সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া লোকসভায় ইহার বিবরণী পেশ করে।

২। অধিকার-সংক্রান্ত সংস্থা -Committee on Privileges—এই কমিটি সদস্যগণের অধিকার সম্পর্কিত বিষয় বিবেচনা করে।

৩। বে-সরকারী সদস্য আনীত বিল ও প্রস্তাব সংস্থা—Committee on Private Members' Bills and Resolutions—এই কমিটি উপরি-উক্ত প্রস্তাবগুলি বাছাই করে ও ইহাদের আলোচনার জন্য সময় স্থির করে।

৪। নিয়ম সংস্থা—Rules Committee—এই সংস্থা আইনসভার কার্য পরিচালনা করিবার নিয়মাবলী পরীক্ষা করে এবং প্রয়োজন ক্ষেত্রে নিয়মাবলীর সংশোধন বা নূতন নিয়ম প্রবর্তনের সুপারিশ করিতে পারে।

৫। সরকারী প্রতিশ্রুতি-সংক্রান্ত সংস্থা—Committee on Government Assurances—মন্ত্রিগণ আইনসভায় যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি দান করেন, তাহা সময় মত কার্যে রূপান্তরিত হয় কিনা তাহার অনুসন্ধান করাই হইল এই সংস্থার প্রধান কাজ।

৬। হিসাব সংস্থা—Estimatos Committee—বিভিন্ন বিভাগের ভার-প্রাপ্ত মন্ত্রিগণ শাসন পরিচালনা কাযের জন্য অর্থ বিভাগের সম্মতিসহ যে ব্যয়বরাদ্দ স্থির করেন, এই ব্যয়বরাদ্দ মিতব্যয়িতার সহিত করা হইয়াছে কিনা তাহাই এই সংস্থাটি পরীক্ষা করে। এই সংস্থাটির কাজ খুব গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই সংস্থাটির কাজের দ্বারা সরকারী আয়-ব্যয়ের সু-সামঞ্জস্য, সরকারী কাজের দক্ষতা ও সরকারী শাসন-নীতি বহুল পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হয়।

৭। সরকারী হিসাব পরীক্ষা সংস্থা—Public Accounts Committee—আইনসভার এই সংস্থাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। লোকসভার ১৫ জন সদস্য লইয়া এই সংস্থা গঠিত। উভয় কক্ষের সম্মতিক্রমে রাজ্যসভার ৭ জন সদস্য এই সংস্থায় যোগদান করেন। পার্লামেণ্ট সভার সম্মতিক্রমে সরকারের বিভিন্ন বিভাগগুলি ব্যয়-সংকুলানের জন্য বাজেট নির্ধারিত যে পরিমাণ অর্থ পায় তাহা যথাযথভাবে ব্যয় হইয়াছে কিনা তাহা এই সংস্থাটি পরীক্ষা করে। এই সংস্থার প্রধান কাজ হইল ভারতের হিসাব পরীক্ষক-প্রধানের বিবরণী পরীক্ষা করিয়া বিভিন্ন বিভাগের ব্যয় সম্পর্কে পার্লামেণ্টে বিবরণী পেশ করা। এই সংস্থাটির কাযের উপর শাসন বিভাগের দক্ষতা অনেক পরিমাণে নির্ভর করে।

ইহা ছাড়াও আরও কয়েকটি সংস্থা আছে। এই সংস্থাগুলির অবর্তমানে আইনসভার পক্ষে ইহার গুরুদায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা সম্ভব হইত না। এই সংস্থাগুলিই আইনসভার জটিল কায সরল করে, দুরূহ সমস্যার সমাধানে সাহায্য করে, বিশেষজ্ঞের অভিমত প্রদান করে এবং সর্বোপরি সময়ের মিতব্যয়িতা করে।

আয়-ব্যয়ের উপর পার্লামেণ্টের নিয়ন্ত্রণক্ষমতা (Parliamentary Control over the financial System)

প্রত্যেক সরকারের আয় জনসাধারণের নিকট হইতে কর, ফি, মূল্য, জরিমানা প্রভৃতি নানা উপায়ে সংগৃহীত হয় ও জনসাধারণের কাযে আদায়ীকৃত অর্থ ব্যয় হয়। সুতরাং গণতান্ত্রিক আদর্শ অনুসারে সরকারী আয়-ব্যয়ের উপর জনগণের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত আইনসভার নিয়ন্ত্রণ থাকা একান্তভাবে বাঞ্ছনীয়।

ভারতের সংবিধানের ২৬৫নং ধারায় বলা হইয়াছে যে, শাসন কর্তৃপক্ষ পার্লামেণ্ট সভার বিনা অনুমোদনে কোন কর ধায করিতে পারিবে না।

বেআইনীরূপে কোন কর ধার্য করা হইলে নাগরিকগণ আদালতের সাহায্যে ইহার প্রতিকার দাবী করিতে পারে।

ব্যয়ের ক্ষেত্রে সঞ্চিত তহবিলের (Consolidated Fund) মাধ্যমে পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণক্ষমতা বলবৎ করিবার ব্যবস্থা আছে। সকল প্রকার উৎস হইতে আদায়ীকৃত সরকারী আয় (কর, ঋণ প্রভৃতি) এই সঞ্চিত তহবিলে জমা হয় এবং সরকারী সর্বপ্রকার ব্যয়ের দাবী এই সঞ্চিত তহবিল হইতে সংকুলান করা হয়। সরকারী ব্যয়বরাদ্দগুলি পার্লামেন্টের বাৎসরিক অনুমোদন-সাপেক্ষ হউক বা না হউক, পার্লামেন্টের অনুমোদন ব্যতীত কোন ব্যয়বরাদ্দই সঞ্চিত তহবিল হইতে খরচ করা যায় না।

আয়-ব্যয়ের উপর পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণক্ষমতা শুধুমাত্র ব্যয়ের পরিমাণ অনুমোদনে সীমাবদ্ধ নহে। প্রত্যেকটি বিষয়ে ব্যয় যাহাতে মিতব্যয়িতার সহিত পরিচালিত হয়, সেদিকে দৃষ্টি রাখাও পার্লামেন্টের অর্থ-সংক্রান্ত কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া পরিগণিত হয়। সরকারী বিভিন্ন ব্যয়ে মিতব্যয়িতা বলবৎ করিবার ক্ষেত্রে পার্লামেন্টের নীতি এরূপভাবে পরিচালিত করিতে হইবে যাহাতে শাসন বিভাগের কার্যক্রম বা দক্ষতা কোন ক্রমে ক্ষুণ্ন না হয়। সরকারী ব্যয়ে অযথা অপচয় বন্ধ করিবার কাজ আইনসভার একটি কমিটির হস্তে ন্যস্ত করা হয়। এই কমিটি হইল হিসাব সংস্থা (Estimates Committee)। পার্লামেন্ট সভায় বাৎসরিক ব্যয়বরাদ্দের তালিকা উপস্থাপিত করা হইলে এই হিসাব সংস্থা ঐ ব্যয়বরাদ্দ তালিকা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া ইহার মন্তব্যসহ লোকসভায় পেশ করে। হিসাব সংস্থার এই মন্তব্য সম্পর্কে লোকসভায় কোন বিতর্ক না হইলেও হিসাব সংস্থার পরীক্ষাকার্যের একটা গুরুত্ব আছে। পরবর্তী বৎসরের ব্যয়ের হিসাবকালে সরকারী বিভাগসমূহ হিসাব সংস্থার পরীক্ষার ভয়ে অনাবশ্যক ব্যয় যথাসম্ভব পরিহার করিতে বাধ্য হন।

পার্লামেন্ট সভা আরও একটি উপায়ে আয়-ব্যয়ের উপর ইহার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বলবৎ করিতে পারে। ভারত সরকারের প্রধান হিসাব পরীক্ষকের কার্যের সাহায্যে এই নিয়ন্ত্রণ পরিচালিত হয়। প্রধান হিসাব পরীক্ষকের কার্য হইল ভারত সরকারের আয়-ব্যয় পরীক্ষা করা এবং পরীক্ষার সময় তিনি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখেন যাহাতে পার্লামেন্টের বিনা অনুমোদনে শাসন কর্তৃপক্ষ এক কপর্দকও ব্যয় করিতে না পারে। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে হিসাব পরীক্ষা করিয়া প্রধান হিসাব পরীক্ষক তাহার মন্তব্যসহ একটি বিবরণী রাষ্ট্র-

পতির নিকট দাখিল করেন এবং রাষ্ট্রপতি এই বিবরণী পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষে প্রেরণ করেন।

রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রেরিত প্রধান হিসাব পরীক্ষকের এই বিবরণী আইন-সভার একটি বিশেষ সংস্থা—সরকারী হিসাব পরীক্ষক সংস্থা (Public Accounts Committee) দ্বারা পরীক্ষা করা হয়। এই সংস্থা লোক-সভার ১৫ জন সদস্য লইয়া গঠিত এবং উভয় কক্ষের সম্মতিক্রমে রাজ্যসভার ৭ জন সদস্য এই সংস্থায় যোগদান করেন। এই সংস্থা প্রধান হিসাব পরীক্ষকের বিবরণী অতি সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করে এবং যদি কোন বিষয়ে কোনরূপ ত্রুটি দেখিতে পায়, তাহা হইলে সে সম্পর্কে লোকসভায় ইহার মন্তব্য প্রেরণ করে।

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে দেখা যায় যে, পার্লামেণ্টের বিনা অনুমোদনে শাসন কর্তৃপক্ষ আয়-ব্যয় সংক্রান্ত কোন কাযই সম্পাদন করিতে পারে না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ব্যাপার হইল যে, বর্তমান যুগে সরকারী আয-ব্যয় এরূপ জটিল হইয়াছে যে, পার্লামেণ্টের সাধারণ সদস্যগণের এই জটিলতার আবরণ ভেদ করিয়া প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হইবার মত অর্থ বিষয়ক জ্ঞান নাই। এ বিষয়ে আলোচনা করিবার মত পর্যাপ্ত সময়ও পাওয়া যায় না। সুতরাং শাসন বিভাগ যাহা স্থির করে, তাহাই ঈষৎ পরিবর্তনসহ অনুমোদিত হয়।

ভারতের পার্লামেণ্ট, বৃটিশ পার্লামেণ্ট ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস

(The Indian Parliament, the British Parliament and the American Congress)

ভারতের নূতন শাসনতন্ত্রের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কালে দেখা গিযাছে যে, এই শাসনব্যবস্থা অংশতঃ বৃটিশ শাসনব্যবস্থার অনুরূপভাবে গঠিত হইয়াছে, আবার অংশতঃ মার্কিন শাসনব্যবস্থার আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত ভারতের শাসনব্যবস্থা একটি যুক্তরাষ্ট্রের ভিত্তিতে গঠিত হইয়াছে কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচিত রাষ্ট্রপতির ন্যায় ভারতে একজন নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি থাকিলেও ভারতের শাসনব্যবস্থাকে কোন দিক দিয়াই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি-প্রধান শাসনব্যবস্থা বলা যায় না। এ দিক দিয়া দেখিতে গেলে ভারতের শাসনব্যবস্থা গ্রেট বৃটেনের পার্লামেণ্ট-প্রধান শাসনব্যবস্থার অনুসরণ করিয়াছে। কিন্তু গ্রেট বৃটেনের পার্লামেণ্ট-প্রধান শাসনব্যবস্থা অনুসরণ করিলেও গ্রেট বৃটেনের পার্লামেণ্ট যে অগ্রাধিকার ও মর্যাদার অধিকারী,

ভারতের পার্লামেণ্ট সভাকে সেরূপ অগ্রাধিকার ও মর্যাদার অধিকারী করা হয় নাই। তিনটি দেশের আইনসভার মর্যাদা ও ক্ষমতা সম্পর্কে বলা যায় যে, বৃটিশ পার্লামেণ্ট সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন আইনসভা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস অ-সার্বভৌম আইনসভা, আর ভারতের পার্লামেণ্ট এই উভয় দেশের আইনসভার মধ্যবর্তী স্থান অধিকার করে।

বৃটিশ শাসনব্যবস্থায় পার্লামেণ্টের প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত। পার্লামেণ্ট যে-কোন রকম আইন প্রণয়ন, পরিবর্তন ও বাতিল করিতে পারে। পার্লামেণ্ট-প্রণীত আইনের ব্যাখ্যা করিতে পারিলেও কোন আদালতের এই আইন অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করিবার অধিকার নাই। সুতরাং দেখা যায় যে, আইনতঃ পার্লামেণ্টের ক্ষমতার কোন বাধা-নিষেধ নাই। সুতরাং বৃটিশ পার্লামেণ্ট হইল সার্বভৌম আইনসভা।

অপর পক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য সুস্পষ্ট। শাসনতন্ত্র হইল সর্ববিধ ক্ষমতার উৎস। সরকারের বিভিন্ন বিভাগগুলির শাসনতন্ত্র-প্রদত্ত ক্ষমতার সীমার মধ্যে কার্যপরিচালনা করিতে হয়। আইনসভা কংগ্রেসকেও এই শাসনতন্ত্র নির্ধারিত গণ্ডির মধ্যে ইহার আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা সীমাবদ্ধ রাখিতে হয়। শাসনতন্ত্র বহির্ভূত কোন আইন প্রণয়ন করিলে সংবিধান ভঙ্গের অভিযোগে ঐ আইন অসিদ্ধ হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের এই প্রাধান্য সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক রক্ষিত হয়। সুপ্রিম কোর্ট শুধু আইনের ব্যাখ্যা করিয়া ক্ষান্ত হয় না বা সংবিধান-বিরোধী বলিয়া আইন বাতিল করে না। কংগ্রেস-প্রণীত কোন আইন যদি সুপ্রিম কোর্টের মতে ন্যায়-নীতি বিরোধী হয় বা অযৌক্তিক বলিয়া পরিগণিত হয় তাহা হইলে সেরূপ আইনও সুপ্রিম কোর্ট অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করিতে পারে। সুতরাং আইন প্রণয়ন ব্যাপারে আইনসভাই চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী নহে। এ বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের স্থান আইনসভারও ঊর্ধ্বে। সুতরাং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সুপ্রিম কোর্টের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ভারতের আইনসভা পার্লামেণ্ট বৃটিশ পার্লামেণ্টের মত সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী নহে। ইহার কোন আইনগত প্রাধান্য নাই। ভারতের পার্লামেণ্টের আইন প্রণয়ন করিবার পরিধি ও ক্ষমতা শাসনতন্ত্র কর্তৃক নির্ধারিত হইয়াছে। এই পরিধির সীমা লংঘন করিয়া বা সংবিধানে বিধিবদ্ধ নাগরিকগণের মৌলিক অধিকার বিরোধী কোন আইন ভারতের পার্লামেণ্ট প্রণয়ন

করিতে পারে না। ভারতের পার্লামেণ্ট এরূপ কোন আইন প্রণয়ন করিলে আদালত এই আইনের বৈধতা বিচার করিতে পারে। সুতরাং ভারতের পার্লামেণ্ট বৃটিশ পার্লামেণ্টের ন্যায় সার্বভৌম আইনসভা নহে। এই সভা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস সভার মত অ-সার্বভৌম আইনসভা।

এ বিষয়ে ভারতের পার্লামেণ্ট সভা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের সহিত তুলনীয় হইলেও অপর একটি দিক দিয়া মার্কিন কংগ্রেস অপেক্ষা ইহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—উভয় দেশের আদালত আইনসভা প্রণীত আইন সংবিধান ভংগ করিয়াছে কিনা তাহার বিচার করিয়া আইনটির বৈধতা স্থির করিতে পারে। আইনসভা প্রণীত আইন সম্পর্কে ভারতীয় আদালতের তদতিরিক্ত কোন ক্ষমতা নাই। সুতরাং সংবিধান অনুযায়ী ক্ষমতা পরিচালনা করিলে আইনসভার আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে আর কোন বাধা নাই। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আদালত শুধু সংবিধান ভংগের কারণে আইনসভা প্রণীত আইনকে অবৈধ ঘোষণা করিয়া ক্ষান্ত হয় না, আইনসভা প্রণীত আইন যদি বিচারালয়ের মতে অযৌক্তিক ও স্বাভাবিক ন্যায়-ধর্ম বিরোধী হয়, তাহা হইলেও সে আইনকে অবৈধ ঘোষণা করিতে পারে। ভারতে বিচারালয়ের এরূপ কোন চরম ক্ষমতা নাই। সুতরাং ভারতের পার্লামেণ্ট মার্কিন কংগ্রেসের মত একান্ত-ভাবে বিচারালয়ের উপর নির্ভরশীল নহে। বৃটিশ পার্লামেণ্টের মত প্রাধান্য না থাকিলেও মার্কিন কংগ্রেসের মত একেবারে অ-সার্বভৌম নহে।

সংক্ষিপ্তসার

যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা—ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভা পার্লামেণ্ট রাষ্ট্রপতি ও দুইটি কক্ষ—রাজ্যসভা ও লোকসভা লইয়া গঠিত। উচ্চকক্ষ অর্থাৎ রাজ্যসভা অনধিক ২৫০ জন সদস্য লইয়া গঠিত। রাজ্যসভার সদস্যগণ প্রত্যেক রাজ্যের নিম্নকক্ষের সদস্যগণ কর্তৃক একক-হস্তান্তরযোগ্য ভোটে সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতিতে পরোক্ষে নির্বাচিত হন। রাষ্ট্রপতি ১২ জন বিশেষ বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে মনোনীত করেন।

অনধিক ৫০০ জন সদস্য লইয়া লোকসভা গঠিত হয়। রাজ্যগুলির ভোট-দাতৃগণ প্রত্যক্ষভাবে প্রাপ্ত-বয়স্কের ভোটাধিকার ভিত্তিতে লোকসভার সদস্যগণকে পাঁচ বৎসরের জন্য নির্বাচন করেন।

সদস্যগণ বাক্ স্বাধীনতা ও অন্যান্য কয়েকটি বিশেষ অধিকার ভোগ করেন।

পার্লামেণ্ট সভা আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অ-সার্বভৌম আইনসভা পর্যায়ভুক্ত। উভয় কক্ষের সম্মতিতে কোন প্রস্তাব আইনে পরিণত হয়। প্রত্যেক প্রস্তাবে রাষ্ট্রপতির সম্মতি প্রয়োজন। রাষ্ট্রপতি সম্মতি প্রদান করিয়া পুনর্বিবেচনার জন্য প্রস্তাবটিকে ফেরত পাঠাইলে ঐ প্রস্তাব যদি পার্লামেণ্ট পুনরায় পাশ করিয়া রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ করে তাহা হইলে দ্বিতীয়বার রাষ্ট্রপতি আর সম্মতি প্রত্যাহার করিতে পারেন না। অর্থ সংক্রান্ত প্রস্তাব লোকসভায় উত্থাপিত হয় এবং লোকসভা কর্তৃক এরূপ গৃহীত প্রস্তাবে রাজ্যসভা ১৭ দিনের মধ্যে মতামত জ্ঞাপন না করিলে আইনে পরিণত হয়। রাষ্ট্রপতির জরুরী অবস্থার ঘোষণাও পার্লামেণ্টের অনুমোদন সাপেক্ষ। এরূপ জরুরী অবস্থা ঘোষণাকালে অথবা রাজ্যসভা অথবা এক বা একাধিক রাজ্য আইনসভা কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া পার্লামেণ্ট সভা রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়ের উপর আইন প্রণয়ন করিতে পারে। রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতির নির্বাচনে ও অপসারণে এবং সুপ্রিম কোর্ট ও উচ্চ বিচারালয়ের বিচারপতিগণের অপসারণে এই সভা অংশ গ্রহণ করিতে পারে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা লোকসভার নিকট দায়ী। শাসনতন্ত্র সংশোধনের ক্ষমতাও পার্লামেণ্টের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। উভয় কক্ষের মতভেদের ক্ষেত্রে যুক্ত অধিবেশনের ব্যবস্থা আছে।

প্রশ্নাবলী

1. What are the Constituent Parts of the Indian Parliament? Elucidate the role of each of them in the passing of an Act.

2. Explain the Constitutional relations between the House of the People (Lok Sabha) and the Council of States (Rajya Sabha).

3. "Bi-Cameralism is a political and constitutional necessity in India." Discuss critically.

4. What are Money Bills in respect of the Indian Union under the Constitution? Discuss fully the procedure laid down in the Constitution for the passing of Money Bills by the Union Parliament.

5. Explain the channels through which the legislatures control the executive in India.

6. Indicate the importance of the Council of States in the Constitution of India and point out its composition and functions.

7. Write notes on the following :—

(a) The Speaker of the House of the People (Lok Sabha) (b) The Attorney-General of India.

8. Explain fully how the Parliament exercises control over the Union Government.

--- -

নবম অধ্যায়

যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারব্যবস্থা

(Union Judiciary)

সুপ্রিম কোর্ট (The Supreme Court)

সুপ্রিম কোর্ট যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার একটি অপরিহার্য অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হয়। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান কার্য হইল শাসনতন্ত্রকে রক্ষা করা। এতদ্ব্যতীত এই বিচারালয় জনসাধারণের মৌলিক অধিকারগুলিকে সুরক্ষিত করে এবং কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকারগুলির মধ্যে শাসনতন্ত্র নির্ধারিত ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা করে।

একজন প্রধান বিচারপতি ও অনধিক সাতজন বিচারপতি লইয়া ভারতের সুপ্রিম কোর্ট প্রথমে গঠিত হয়। ১৯৫৬ সালে একটি সংশোধনী আইন পাস করিয়া বিচারপতির সংখ্যা ৭ হইতে ১০ করা হয়। বিচারকার্য যাহাতে দ্রুত সম্পন্ন হয়, সেই উদ্দেশ্যে ১৯৬০ সালে দ্বিতীয় সংশোধনী আইন পাস করিয়া বিচারপতির সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করা হয়। বর্তমানে প্রধান বিচারপতি ব্যতীত আরও ১৩ জন বিচারপতি লইয়া এই আদালত গঠিত। সুপ্রিম কোর্ট ও অন্যান্য উচ্চ বিচারালয়ের বিচারপতিদের পরামর্শক্রমে এবং সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচাপতির সহিত সবক্ষেত্রে পরামর্শ করিয়া রাষ্ট্রপতি অন্যান্য বিচারপতিগণকে নিযুক্ত করেন। বিচারপতিগণ ৬৫ বৎসর বয়স্ক কাল নিযুক্ত থাকিতে পারেন। সুপ্রিম কোর্টের কোন বিচারপতি অবসর গ্রহণ করিবার পর ভারতের কোন বিচারালয়ে আইনব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিতে পারেন না। প্রধান বিচারপতির বেতন মাসিক পাঁচ হাজার টাকা, অন্যান্য বিচারপতিগণ চার হাজার টাকা বেতন পাইয়া থাকেন। বিচারপতিগণ যাহাতে স্বাধীনভাবে বিচারকার্য পরিচালনা করিতে পারেন তজ্জন্য শাসনতন্ত্রে বলা হইয়াছে যে, পার্লামেন্টের উভয় পরিষদে মোট সদস্যের সংখ্যাধিক্যে এবং দুই-তৃতীয়াংশের ভোটাধিক্যে কোন বিচারপতির বিরুদ্ধে প্রস্তাব গৃহীত হইলে এবং উক্ত গৃহীত প্রস্তাব রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সমর্থিত হইলে সংশ্লিষ্ট বিচারপতিকে অপসারিত করা যাইবে। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিগণের নিম্নলিখিত যোগ্যতা থাকা চাই :

(১) বিচারপতিগণকে অবশ্যই ভারতের নাগরিক হইতে হইবে এবং অন্ততঃপক্ষে পাঁচ বৎসরকাল কোন উচ্চ বিচারালয়ের বিচারক হওয়া চাই, বা (২) অন্ততঃ একাদিক্রমে দশ বৎসর এক বা একাধিক উচ্চ বিচারালয়ে ওকালতি করা চাই, বা (৩) রাষ্ট্রপতির মতে একজন প্রসিদ্ধ আইনজ্ঞ হওয়া চাই।

সুপ্রিম কোর্টের ক্ষমতা (Powers of the Supreme Court)

ভারতের সুপ্রিম কোর্টের ক্ষমতা চার ভাগে ভাগ করা হইয়াছে, যথা,—আদিম ক্ষমতা, আপীল ক্ষমতা, পরামর্শ ক্ষমতা ও মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত ক্ষমতা।

(১) আদিম এলাকা (Original Jurisdiction)

নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সুপ্রিম কোর্টের আদিম বিভাগের বিচার্য হইবে: (ক) ভারত সরকার বা এক বা একাধিক রাজ্য সরকারের মধ্যে বিবাদ, (খ) ভারত সরকার ও এক বা একাধিক রাজ্য সরকার যখন একদিকে এবং এক বা একাধিক রাজ্য সরকার অপর দিকে, (গ) দুই বা ততোধিক রাজ্য সরকারের মধ্যে বিরোধ—এ স্থলে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বিচার্য বিষয় বিবদমান পক্ষগুলির আইনগত অধিকার-সম্পর্কিত হওয়া চাই। এতদ্ব্যতীত 'খ'-শ্রেণীভুক্ত কোন রাজ্য যদি বিবাদের একটি পক্ষ হইত এবং উক্ত বিবাদ যদি শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হইবার পূর্বে সম্পাদিত চুক্তি, সন্ধি, সনদ ইত্যাদি সংক্রান্ত হইত, তাহা হইলে সুপ্রিম কোর্টের উক্ত বিবাদ বিচার করিবার ক্ষমতা ছিল না।

(২) আপীল এলাকা (Appellate Jurisdiction)

(ক) ভারতে অবস্থিত যে-কোন উচ্চ বিচারালয়ের আদেশ ও নির্দেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে তিন প্রকারের আপীল করা যাইতে পারে: (১) উচ্চ বিচারালয়ের সম্মতিক্রমে শাসনতান্ত্রিক আইনবিষয়ক ফৌজদারী, দেওয়ানী বা অন্য প্রকারের বিরোধের আপীল সুপ্রিম কোর্টে করা যাইতে পারে। (২) উক্ত বিচারালয় যদি সম্মতি প্রদান না করে, তাহা হইলে সুপ্রিম কোর্ট নিজেই উক্তরূপ বিরোধ সম্পর্কে আপীল করিবার বিশেষ অনুমতি দান করিয়া আপীলের বিচার করিতে পারে। (৩) উপরি-উক্ত দুইটি বিধি প্রযোজ্য কি

না, সে সম্পর্কেও কোন বিরোধ উপস্থিত হইলে তাহার আপীল বিচার করিতে পারে।

(খ) দেওয়ানী (Civil) মামলার আপীল :

কোনও মোকদ্দমার বিচারে বা ডিক্রীতে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির মূল্য যদি কুড়ি হাজার টাকার কম না হয় অথবা মামলাটি সুপ্রিম কোর্টে প্রেরণযোগ্য বলিয়া যদি উচ্চ বিচারালয় মত প্রকাশ করে, তাহা হইলে উক্ত বিষয় সুপ্রিম কোর্টে আপীল করা যাইতে পারে। এইরূপ মামলার ক্ষেত্রেও শাসনতান্ত্রিক প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে।

(গ) ফৌজদারী (Criminal) মামলার আপীল :

ফৌজদারী মামলায় উচ্চ বিচারালয় যদি কোন ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে অথবা উচ্চ বিচারালয় কর্তৃক কোন মামলা যদি সুপ্রিম কোর্টে আপীলযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলেও সুপ্রিম কোর্টে আপীল করা যায়। পার্লামেণ্ট আইন প্রণয়ন করিয়া সুপ্রিম কোর্টের ফৌজদারী মামলা সংক্রান্ত আপীল শুনিবার অধিকার বৃদ্ধি করিতে পারে। সুপ্রিম কোর্ট যুক্তিসঙ্গত মনে করিলে একমাত্র সামরিক আদালতের সিদ্ধান্ত ব্যতীত ভারতের অন্য যে-কোন বিচারালয়ের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীল গ্রহণ করিতে পারে।

(৩) পরামর্শদান কার্য (Advisory function)

রাষ্ট্রপতি ইচ্ছা করিলে কোন আইন-সম্পর্কিত বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের মতামত চাহিতে পারেন। সুপ্রিম কোর্টের কর্তব্য হইল রাষ্ট্রপতিকে ইহার মতামত জ্ঞাপন করা।

(৪) মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত ক্ষমতা (Functions in relation to Fundamental Rights)

এতদ্ব্যতীত ভারতের সুপ্রিম কোর্টের আর একটি বিশেষ ক্ষমতা আছে। শাসনতন্ত্র কর্তৃক ভারতীয় নাগরিকগণের উপর যে সমস্ত মৌলিক অধিকার অর্পিত হইয়াছে, কোন কারণে যদি উক্ত অধিকারগুলি বিপন্ন হয়, তাহা হইলে সুপ্রিম কোর্ট অধিকারগুলিকে রক্ষা করিতে পারে। এই উদ্দেশ্যে সুপ্রিম কোর্ট নানাপ্রকার আদেশ ও নির্দেশ জারী করিয়া মৌলিক অধিকারগুলিকে সংরক্ষিত করে।

ভারতে সুপ্রিম কোর্টের ক্ষমতা পর্যালোচনা করিলে স্বভাবতই মনে হয় যে, এইরূপ ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী উচ্চ বিচারালয় আর অন্য কোন দেশে নাই। এই বিচারালয় শুধু যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় নয়, ইহা হইল ভারতের সর্বোচ্চ আপীল আদালত, সংবিধানের সংরক্ষক ও ব্যাখ্যাকার হিসাবে ইহাকে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য সম্পাদন করিতে হয়। কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে শাসনতন্ত্র নির্ধারিত সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখা ইহার গুরু দায়িত্ব। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সম্পূর্ণ অঙ্গ ভারতীয় নাগরিকগণের সংবিধান প্রদত্ত মৌলিক অধিকারগুলি রক্ষা করিবার ভার এই বিচারালয়ের উপর প্রদত্ত হইয়াছে। শাসনবিভাগ ও আইনবিভাগ যাহাতে শাসনতন্ত্র নির্ধারিত গণ্ডি অতিক্রম করিয়া মৌলিক অধিকারগুলি ক্ষুণ্ণ করিতে না পারে, সেজন্য সুপ্রিম কোর্টকে সর্বদা অবহিত থাকিতে হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট আইনসভাপ্রণীত যে-কোন আইনের বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করিতে পারে। কিন্তু ভারতের সুপ্রিম কোর্টের সে ক্ষমতা নাই। ভারতীয় পার্লামেন্ট সভা বা রাজ্য আইনসভাগুলি যদি শাসনতন্ত্র-নির্ধারিত ক্ষমতার বহির্ভূত কায করে, একমাত্র তাহা হইলে উক্ত আইনসভাগুলি কর্তৃক প্রণীত আইনগুলির উপর সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশদান করিতে পারে। কিন্তু আইনসভাগুলি কর্তৃক প্রণীত আইনগুলি যদি শাসনতন্ত্র বিরোধী না হয় তাহা হইলে মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টের ন্যায় ভারতের সুপ্রিম কোর্টের উক্ত আইনগুলির গুণাগুণ বিচার করিবার ক্ষমতা নাই। সুতরাং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টের ন্যায় ভারতের সুপ্রিম কোর্টকে আইনসভার ঊর্ধ্বে স্থান দেওয়া হয় নাই।

সুপ্রিম কোর্টের ভূমিকা (The Role of the Supreme Court)

ভারতে বিচারব্যবস্থায় সুপ্রিম কোর্ট এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। যুক্তরাষ্ট্রীয় ও রাজ্য আইন-বিষয়ে সর্বোচ্চ আপীল আদালত হিসাবে সুপ্রিম কোর্ট ভারতের বিচারব্যবস্থার শীর্ষস্থানে অবস্থিত। এই বিচারালয়ের প্রধান কায হইল সকল প্রকার আইনের ন্যায়সঙ্গত প্রয়োগ বলবৎ করা এবং বিচারপ্রার্থী কোন ব্যক্তি যাহাতে কোন বিচারালয় কর্তৃক ন্যায় বিচার হইতে বঞ্চিত না হয়। এই বিচারালয় কর্তৃক ঘোষিত আইন ভারতের সকল বিচারালয়ের উপর বাধ্যতামূলকভাবে প্রযোজ্য এবং এই উদ্দেশ্যে এই বিচারালয়ে বিচারব্যবস্থার সমগ্র ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করা হইয়াছে। অন্য কোন দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়ে

বিচার-বিভাগীয় ক্ষমতার এরূপ কেন্দ্রীকরণ করা হয় নাই। ভারতের সুপ্রিম কোর্টের কাজ আর এক দিক দিয়া বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে শাসনতন্ত্র কর্তৃক ক্ষমতার বিভাজন বলবৎ রাখিয়া এই বিচারালয় উভয় সরকারের সম্পর্কের ভারসাম্য রক্ষা করে। পরিশেষে বলা যায় যে, এই বিচারালয় শাসনতন্ত্রের এবং নাগরিকগণের মৌলিক অধিকারগুলির রক্ষাকবচ হিসাবে কাজ করে। এই উদ্দেশ্যে সুপ্রিম কোর্ট ও উচ্চ বিচারালয়গুলি ব্যক্তি, সংঘ এমন কি সরকারের উপরও নানাজাতীয় আদেশ ও নির্দেশ জারী করিতে পারে।

সুপ্রিম কোর্ট যাহাতে শাসনতন্ত্রের শুচিতা ও মৌলিক অধিকার রক্ষা করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে এই বিচারালয়কে আইনসভা-প্রণীত আইনের বৈধতা বিচার করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। ভারতে আইনসভা-প্রণীত আইনের বৈধতা বিচার করিবার ক্ষেত্র স্বল্প-পরিসর হইলেও যদি পার্লামেন্ট বা রাজ্য আইনসভা-প্রণীত কোন আইন শাসনতন্ত্র বিরোধী বলিয়া বিবেচিত হয় তাহা হইলে সুপ্রিম কোর্ট এরূপ আইনকে অবৈধ বলিয়া বাতিল করিতে পারে। ইংলণ্ড বা ফরাসী দেশের উচ্চ আদালতের আইনসভা-প্রণীত আইনের বৈধতা বিচার করিবার এরূপ কোন ক্ষমতা নাই। অপর পক্ষে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট মার্কিন সুপ্রিম কোর্টের মত আইনসভা-প্রণীত আইনকে অযৌক্তিক বা ন্যায়নীতি বিরোধী বলিয়া অবৈধ ঘোষণা করিতে পারে না। ভারতের সংবিধান সুপ্রিম কোর্টকে যুক্তরাষ্ট্র-সুলভ স্বাভাবিক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করিয়াছে। মার্কিন সুপ্রিম কোর্টের মত ইহাকে আইনসভার ঊর্ধ্বে স্থান দেয় নাই।

এতদ্ব্যতীত ভারতের সুপ্রিম কোর্ট সর্বভারতীয় সর্বোচ্চ বিচারালয় হিসাবে কাজ করে। এই বিচারালয়ই হইল দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার সর্বোচ্চ আপীল আদালত। সংশ্লিষ্ট উচ্চ বিচারালয়ের সুপারিশে অথবা সুপ্রিম কোর্টের নিজ অনুমোদনে এই বিচারালয়ে আপীল করা যায়।

সুতরাং শেষ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, সুপ্রিম কোর্ট ভারতের সংবিধানের একমাত্র ব্যাখ্যাকার হিসাবে কাজ করে। আইনসভার অভিভাবকরূপে এই বিচারালয়কে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ না করিয়া সংবিধানের রচয়িতাগণ ইহাকে শাসনতন্ত্রের রক্ষক ও শাসনকর্তৃপক্ষের স্বৈরাচারের বাধারূপে গঠন করিয়াছেন।

ভারতের সুপ্রিম কোর্ট ও মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট

(The Supreme Courts of India and the U. S. A.)

ভারতে ও মার্কিন দেশে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রচলিত আছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ সুপ্রিম কোর্টের অবস্থিতি। উভয় দেশেই এই যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় থাকিলেও এই উভয় বিচারালয়ের মধ্যে কিছু পার্থক্য দেখা যায়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সুপ্রিম কোর্ট একজন প্রধান বিচারপতি ও আটজন অন্য বিচারপতি লইয়া গঠিত এবং প্রধান বিচারপতি সহ বিচারপতিগণ আইনসভার উচ্চ কক্ষ সিনেট সভার অনুমোদনক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া থাকেন। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োগ সিনেট সভা মধ্যে মধ্যে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। দলীয় ভিত্তিতে বিচারপতিগণ নিযুক্ত হইলেও সাধারণতঃ আইন সম্পর্কে উচ্চ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ও দূরদর্শী ব্যক্তিগণকেই বিচারপতি নিযুক্ত করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিগণ আজীবন কালের জন্য নিযুক্ত হন এবং একমাত্র অভিযোগ (Impeachment) পদ্ধতি দ্বারা তাঁহাদের পদচ্যুত করা যায়।

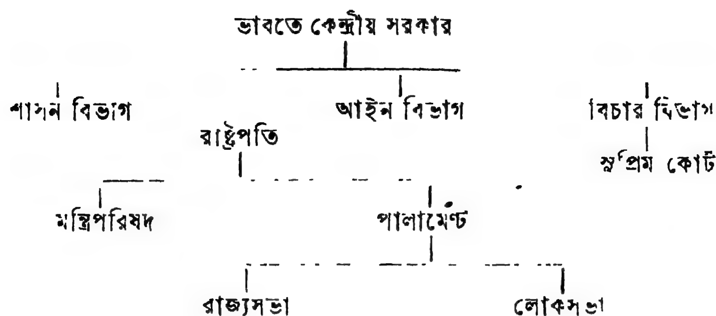
ভারতে সুপ্রিম কোর্ট বর্তমানে প্রধান বিচারপতি ও ১৩ জন অন্য বিচারপতি লইয়া গঠিত। প্রধান বিচারপতি ব্যতীত অন্যান্য বিচারপতি নিযুক্ত করিতে হইলে রাষ্ট্রপতিকে ভারতের প্রধান বিচারপতির সহিত অবশ্যই পরামর্শ করিতে হইবে এবং সুপ্রিম কোর্ট ও রাজ্যের উচ্চ আদালতগুলির বিচারপতিদের সহিতও পরামর্শ করিতে পারেন। ভারতে বিচারপতি নিয়োগে আইনসভার কোন হাত নাই। বিচারপতিগণ ৬৫ বৎসর পর্যন্ত কার্যে বহাল থাকেন। পার্লামেন্ট সভার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের অভিযোগে অবধারিত অসদাচরণ বা অযোগ্যতা হেতু রাষ্ট্রপতি ইহাদিগকে অপসারিত করিতে পারেন।

ক্ষমতার দিক দিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, ভারতের সুপ্রিম কোর্ট অপেক্ষা আমেরিকার সুপ্রিম কোর্টের আদিম ক্ষমতা অধিক। অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তি করা ব্যতীতও মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট বিদেশী রাষ্ট্রদূত, বাণিজ্য প্রতিনিধি, চুক্তি, নৌ-বাহিনী প্রভৃতি সম্পর্কীয় বিরোধের বিচার করিতে পারে। ভারতের সুপ্রিম কোর্টের এ ক্ষমতা নাই। কিন্তু আপীল ক্ষমতায় ভারতের সুপ্রিম কোর্ট শ্রেষ্ঠতর। ভারতের সুপ্রিম কোর্ট নিম্ন আদালতগুলি হইতে আনীত ফৌজদারী, দেওয়ানী ও শাসনতান্ত্রিক আইন-

সম্পর্কিত বিরোধের আপীল শুনিতে পারে। অন্য কয়েকটি বিষয়েও ভারতের সুপ্রিম কোর্ট এই বিচারালয়ের নিকট আপীল করিবার বিশেষ অনুমতি দান করিতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়ের একমাত্র শাসনতান্ত্রিক আইন সম্পর্কিত বিরোধের আপীল শুনিবার ক্ষমতা ব্যতীত সাধারণ ফৌজদারী বা দেওয়ানী মামলার আপীল শুনিবার ক্ষমতা নাই।

ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উভয় দেশের সুপ্রিম কোর্টই কেন্দ্রীয় ও রাজ্য আইনসভাগুলি প্রণীত আইন শাসনতন্ত্র বিরোধী বলিয়া বাতিল করিতে পারে। কিন্তু উভয় দেশের সুপ্রিম কোর্টের এই বিশেষ ক্ষমতার পরিধি ও প্রয়োগক্ষেত্র সমান নহে। ভারতের কেন্দ্রীয় ও রাজ্য আইনসভাগুলি যত সময় পর্যন্ত শাসনতন্ত্র নির্ধারিত গণ্ডির মধ্যে তাহাদের আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা সীমাবদ্ধ রাখে ততক্ষণ পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্ট আইনসভা প্রণীত কোন আইন শাসনতন্ত্র বিরোধী বলিয়া অসিদ্ধ ঘোষণা করিতে পারে না। কিন্তু কেন্দ্রীয় বা কোন রাজ্য আইনসভা যখন শাসনতন্ত্র নির্ধারিত আইন-প্রণয়ন ক্ষমতার সীমা অতিক্রম করে, একমাত্র তখনই সুপ্রিম কোর্ট আইনসভা প্রণীত আইনের বৈধতা বিচার করিতে পারে। সুতরাং আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে ভারতের আইনসভাগুলি তাহাদের নিজস্ব এলাকার মধ্যে স্বাধীন।

কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট শুধু আইনসভা প্রণীত আইনের বৈধতা বিচার করে না। আইনসভা প্রণীত আইনের গুণাগুণ বিচার করিবার ক্ষমতাও সুপ্রিম কোর্টের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। আইনসভা প্রণীত আইন শাসনতন্ত্রসম্মত হইলেও যদি সুপ্রিমকোর্টের মতে অযৌক্তিক হয় বা প্রচলিত ন্যায়বোধ বিরোধী হয় তাহা হইলে মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট এই অযৌক্তিকতা বা ন্যায়বোধ বিরোধিতার কারণে আইনসভা প্রণীত আইনটিকে অসিদ্ধ বলিয়া বাতিল করিতে পারে। অর্থাৎ ভারতে কোন আইন ভাল কি মন্দ তাহার বিচারভার আইন-প্রণেতা আইনসভার উপর—বিচারালয় শুধু আইন প্রয়োগ করে—আইনের গুণাগুণ বিচার করে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিচারালয় শুধু আইন প্রয়োগ করিয়া ক্ষান্ত হয় না—বিচারালয় আইনের গুণাগুণ বিচার ক্ষমতারও অধিকারী। এইরূপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সুপ্রিম কোর্টকে আইনসভার ঊর্ধ্বে স্থান দিয়া আইনসভার তথা ভোটদাতার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করা হইয়াছে। ভারতে সুপ্রিম কোর্টকে আইনসভার ঊর্ধ্বে স্থান দেওয়া অবাঞ্ছিত বলিয়া ভারত মার্কিন নীতি গ্রহণ করে নাই।



সংক্ষিপ্তসার

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় একটি সর্বোচ্চ আদালত একান্ত অপরিহার্য। ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে একটি সুপ্রিম কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। একজন প্রধান বিচারপতি ও অনধিক সাতজন বিচারপতি লইয়া এই আদালত প্রথম গঠিত ছিল। ১৯৫৬ সালে একটি সংশোধনী আইন পাস করিয়া বিচারপতির সংখ্যা ৭ হইতে ১০ করা হয়। বিচারকার্য যাহাতে দ্রুত সম্পন্ন হয় সেই উদ্দেশ্যে ১৯৬০ সালে দ্বিতীয় সংশোধনী আইন পাস করিয়া বিচারপতির সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করা হয়। বর্তমানে প্রধান বিচারপতি ছাড়া আরও ১৩ জন বিচারপতি লইয়া এই আদালত গঠিত।

রাষ্ট্রপতি ইঁহাদিগকে নিযুক্ত করেন। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হইতে হইলে অন্ততঃ পাঁচ বৎসর উচ্চ আদালতে বিচারপতি হিসাবে কাজ করিতে হয় অথবা দশ বৎসর উচ্চ আদালতে ওকালতি করিতে হয় অথবা প্রসিদ্ধ আইনজ্ঞ হইতে হয়। বিচারপতিগণ পঁয়ষট্টি বৎসর বয়স পর্যন্ত কাজ করিতে পারেন এবং অবসর গ্রহণের পর ভারতের কোন আদালতে আর ওকালতি করিতে পারেন না। পার্লামেন্ট সভার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের অভিযোগে রাষ্ট্রপতি ইঁহাদিগকে অপসারিত করিতে পারেন।

সুপ্রিম কোর্টের কার্য চারিভাগে ভাগ করা যায়, যথা, আদিম ক্ষমতা, আপীল ক্ষমতা, পরামর্শ ক্ষমতা ও মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত দান ক্ষমতা।

প্রথমতঃ কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের মধ্যে, অথবা দুই বা ততোধিক রাজ্য সরকারের মধ্যে শাসনতন্ত্রের কোন বিষয়ের অর্থ লইয়া বিরোধ ঘটিলে তাহার বিচার করা।

দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন রাজ্যের উচ্চ আদালতের দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার রায়ের বিরুদ্ধে কয়েকটি বিশেষক্ষেত্রে আপীল শুনা।

তৃতীয়তঃ, শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যা সম্পর্কে কোন বিষয়ে জানিবার জন্য রাষ্ট্রপতি যদি অনুরোধ করেন, তাহা হইলে কোর্টের নিজ মতামত জ্ঞাপন করা।

চতুর্থতঃ, নাগরিকগণের শাসনতন্ত্রে উল্লিখিত মৌলিক অধিকার রক্ষা করা। যদি কোন ব্যক্তি মনে করে যে, সরকার বা অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান দ্বারা তাহার নাগরিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হইয়াছে তাহা হইলে সে সুপ্রিম কোর্টে ইহার প্রতিকারের প্রার্থনা করিতে পারে। উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনিয়া সুপ্রিম কোর্ট ইহার নির্দেশ দিতে পারে।

প্রশ্নাবলী

1. Discuss the position of the Supreme Court of India (a) as a federal Court, (b) as a Court of Appeal, and (c) as the guardian of the constitution and the protector of the Fundamental Rights of the Citizens.

2. Describe the composition and functions of the Supreme Court and indicate its importance in the Constitutional System of India



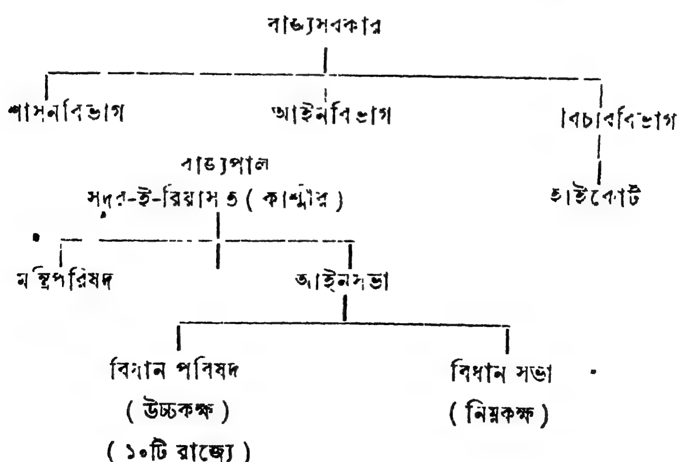
দশম অধ্যায়

রাজ্যশাসন কর্তৃপক্ষ

(The State Executive)

রাজ্য শাসন ব্যবস্থা (Administration of States)

১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের রাজ্য পুনর্গঠন আইনের ভিত্তিতে ভারতের ১৫টি রাজ্যে একই ধরণের গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে। পূর্বতন ক, খ, গ শ্রেণীর রাজ্যগুলি বর্তমানে সমপর্যায়ভুক্ত এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত সম্পর্কে প্রত্যেকটি রাজ্য সমান অধিকার ও দায়িত্বের অধিকারী; রাজ্য সরকারগুলির শাসনব্যবস্থা অনেক পরিমাণে কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার অনুরূপ। প্রত্যেক রাজ্যে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শাসনব্যবস্থার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ হইতেছেন একজন গভর্ণর বা নিয়মতান্ত্রিক রাজ্যপাল। রাজ্যপালকে সাহায্য ও পরামর্শ দান করিবার জন্য প্রত্যেক রাজ্যে একটি মন্ত্রিপরিষদ আছে। মন্ত্রিপরিষদ ইহার কার্যের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী। প্রত্যেক রাজ্যে একটি আইনসভা আছে এবং নূতন আইন অনুসারে প্রত্যেক রাজ্যে একটি উচ্চ বিচারালয় (High Court) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।



শাসনকর্তৃপক্ষ—রাজ্যপাল (The Executive—The Governor)

প্রত্যেক রাজ্যে একজন করিয়া রাজ্যপাল থাকেন ও তাঁহার নামে শাসনকার্য পরিচালিত হয়। রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া থাকেন ও রাষ্ট্রপতির ইচ্ছানুযায়ী কার্যে বহাল থাকেন। তাঁহার কার্যকাল পাঁচ বৎসর। রাজ্যপালকে ভারতের নাগরিক হইতে হইবে ও অন্ততঃ পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়স্ক হওয়া চাই। তিনি আইনসভার কোন পরিষদেরই সদস্য হইতে পারেন না। তিনি বিনা খরচায় আবাসগৃহ পাইয়া থাকেন এবং তাঁহার মাসিক বেতন ৫,০০০ টাকা। এতদ্ব্যতীত তিনি অন্যান্য ভাতা পান। নিয়মতান্ত্রিক শাসনপ্রধান হিসাবে রাজ্যপাল-নিয়োগ ব্যাপারে রাষ্ট্রপতি সাধারণতঃ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপরিষদ ও রাজ্য মন্ত্রিপরিষদের সহিত পরামর্শ করিয়া রাজ্যপাল নিয়োগ করেন। এই নিয়োগব্যাপারে রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিগত ইচ্ছার বিশেষ স্থান নাই।

রাজ্যপালের নিয়োগ-পদ্ধতি (Mode of Appointment of the Governor)

রাষ্ট্রপতি কর্তৃক রাজ্যপালের নিয়োগ সম্পর্কে অনেক বিরুদ্ধ সমালোচনা হইয়াছে। প্রথমতঃ, বলা যায় যে, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার মূলনীতি হইল প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন। যে স্থলে প্রাদেশিক শাসনকর্তা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত হইয়া থাকেন, সে স্থলে প্রাদেশিক শাসনকর্তার স্বাধীনতা অনেক পরিমাণে ক্ষুন্ন হইবার সম্ভাবনা থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে প্রাদেশিক শাসনকর্তা শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি পর্যায়ে পরিণত হন। ফলে, প্রাদেশিক ব্যাপারেও কেন্দ্রীয় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাদেশিক শাসনকর্তৃগণ গণতান্ত্রিক নীতি অনুযায়ী প্রত্যেক প্রদেশের ভোটদাতৃগণের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হইয়া থাকেন। ভারতের রাজ্যপালসমূহের নিয়োগ ব্যাপারে গণতান্ত্রিক আদর্শ যে অনুসৃত হয় নাই ইহা অস্বীকার করা যায় না।

উপরি-উক্ত সমালোচনার প্রত্যুত্তরে বলা হয় যে, ভারতের রাজ্যপালগণ নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাদেশিক শাসনকর্তৃগণের ক্ষমতার ন্যায় তাঁহাদের কোন প্রকৃত ক্ষমতা নাই। ভারতের রাজ্যপালগণের শাসনতন্ত্র-প্রদত্ত ক্ষমতাগুলি রাজ্য মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুসারেই পরিচালিত হয় এবং এই

ক্ষমতা পরিচালনার জন্য মন্ত্রিসভা আইনসভার নিকট দায়ী থাকেন। রাজ্যপালগণের আইনসভার নিকট কোনপ্রকার দায়িত্ব নাই। প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী ও প্রয়োগ-কর্তা হইলেন মন্ত্রিমণ্ডলী এবং মন্ত্রিমণ্ডলীর সদস্যবর্গ সাধারণতঃ আইনসভার নির্বাচিত সদস্য। এরূপ ক্ষেত্রে রাজ্যপালগণের ভোটদাতৃগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইবার বিশেষ কোন সার্থকতা আছে বলিয়া মনে হয় না।

রাজ্যপালের ক্ষমতা (Powers of the Governor)

প্রত্যেক রাজ্যের শাসনক্ষমতা রাজ্যপালের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে এবং তাঁহার নামেই সমগ্র শাসনক্ষমতা পরিচালিত হইয়া থাকে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপরিষদের মত রাজ্যশাসন ব্যাপারে পরামর্শ দিবার জন্য প্রত্যেক রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রিসহ একটি মন্ত্রিপরিষদ থাকিবে। রাজ্যপাল তাঁহার নিজ ইচ্ছামত যে সমস্ত কায করিবার অধিকার শাসনতন্ত্র হইতে পাইয়াছেন, যে সমস্ত ব্যাপারে মন্ত্রিপরিষদ তাঁহাকে কোন পরামর্শ দান করিতে পারে না। একমাত্র আসামের রাজ্যপালের উপজাতি-অধ্যুষিত এলাকাগুলি সম্পর্কে দুইটি বিশেষ ক্ষমতা আছে—যাহা তিনি মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ গ্রহণ না করিয়া নিজ ইচ্ছায় প্রয়োগ করিতে পারেন। আসাম ব্যতীত অন্য কোন রাজ্যের রাজ্যপালের এরূপ নিজ ইচ্ছামত ক্ষমতাপ্রয়োগের কথা শাসনতন্ত্রের কোথাও উল্লেখ নাই। তবে এ স্থলে একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যদি কোন ক্ষেত্রে রাজ্যপালের নিজ ইচ্ছামত ক্ষমতাপ্রয়োগের প্রশ্ন উত্থিত হয় তাহা হইলে এ সম্পর্কে রাজ্যপালের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া পরিগণিত হইবে। আইনসভায় বহুদলের অস্তিত্বের জন্য যখন কোন দলই সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিতে পারে না, তখন মুখ্যমন্ত্রী নিয়োগ ব্যাপারে রাজ্যপাল তাঁহার ইচ্ছামত ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারেন। এতদ্ব্যতীত বিধানসভা ভাঙ্গিয়া দিবার অনুমতি প্রদানসম্পর্কে এবং শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থার সৃষ্টি হইলে রাজ্যপাল তাঁহার ইচ্ছামত ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার সুযোগ পান। রাজ্যপালের ক্ষমতা নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করা হয়।

শাসনবিভাগীয় ক্ষমতা (Executive Powers)

রাজ্যপাল রাজ্য-সংক্রান্ত শাসনবিভাগীয় সমুদয় ক্ষমতার অধিকারী এবং এই ক্ষমতা তিনি স্বয়ং অথবা অধস্তন কর্মচারিবৃন্দের সাহায্যে পরিচালনা করেন।

তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে ও মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে অন্যান্য মন্ত্রিগণকে নিযুক্ত করেন এবং মন্ত্রীদের মধ্যে দপ্তর বণ্টন করেন। তিনি উচ্চ বিচারালয়ের বিচারপতির যোগ্যতাসম্পন্ন একজন ব্যক্তিকে য়্যাড্ভোকেট্ জেনারেল পদে নিযুক্ত করেন। রাষ্ট্রপতি তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া রাজ্যের উচ্চ বিচারালয়ের বিচারপতি-গণকে নিযুক্ত করেঁন। যে সমস্ত রাজ্যে তপশীলভুক্ত জাতি ও অনুন্নত শ্রেণী আছে, সে সমস্ত রাজ্যে এই সমস্ত অনগ্রসর শ্রেণীর কল্যাণসাধনের বিশেষ ভার রাজ্যপালের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে এবং এইজন্য রাজ্যপাল একজন পৃথক মন্ত্রী নিযুক্ত করিতে পারেন। রাজ্যতালিকাভুক্ত সমুদয় ক্ষমতাই রাজ্যপাল পরিচালনা করেন। তবে যুগ্ম তালিকাভুক্ত বিষয়গুলির উপর তাঁহার ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা দ্বারা সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে।

আইনবিষয়ক ক্ষমতা (Legislative Powers)

রাজ্যপাল রাজ্য আইনসভার অবিচ্ছেদ্য অংশ। যে সমস্ত রাজ্যে আইনসভা দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট, সেখানে উচ্চ পরিষদে রাজ্যপাল কতিপয় সদস্য মনোনীত করিতে পারেন। এতদ্ব্যতীত তিনি ইচ্ছা করিলে য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়কে উপযুক্ত পরিমাণ প্রতিনিধিত্ব দিবার জন্য উক্ত সম্প্রদায় হইতে কয়েকজন সদস্য বিধান-সভায় মনোনীত করিতে পারেন।

রাজ্যপাল আইসভার অধিবেশন আহ্বান করিতে পারেন, স্থগিত রাখিতে পারেন ও নিম্ন পরিষদ ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন, কিন্তু ইহার কার্যকাল বৃদ্ধি করিতে পারেন না। তিনি আইনসভার যে-কোন পরিষদে বা উভয় পরিষদে বক্তৃতা করিতে পারেন এবং বাণী প্রেরণ করিতে পারেন। কোন বিল আইনে পরিণত করিতে হইলে রাজ্যপালের সম্মতি অপরিহার্য। তিনি সম্মতি দান করিতে পারেন, প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন অথবা রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য তাঁহার নিকট প্রেরণ করিতে পারেন। অর্থ-সংক্রান্ত বিল ব্যতীত অন্য বিলগুলিকে তিনি পুনর্বিবেচনার জন্য আইনসভায় ফেরৎ পাঠাইতে পারেন। রাজ্যপাল কর্তৃক পুনর্বিবেচনার জন্য প্রেরিত বিল যদি আইনসভা কর্তৃক দ্বিতীয়বার গৃহীত হয়, তাহা হইলে রাজ্যপাল উক্ত বিলে সম্মতি দিতে অস্বীকার করিতে পারেন না। আইনসভার অধিবেশন স্থগিত থাকাকালে রাজ্যপাল জরুরী আইন (Ordinance) জারী করিতে পারেন, কিন্তু যে সমস্ত ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির সম্মতি প্রয়োজন, সে সকল ক্ষেত্রে জরুরী আইন জারী করিবার পূর্বে রাষ্ট্রপতির

অনুমোদন লাভ করিতে হইবে। প্রত্যেকটি জরুরী আইন আইনসভায় পেশ করিতে হইবে এবং অধিবেশন আরম্ভ হইবার পর ছয় সপ্তাহ পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে। আইনসভা কর্তৃক অনুমোদিত না হইলে তৎপূর্বেই উহা বাতিল হইবে।

অর্থবিষয়ক ক্ষমতা (Financial Powers)

কোন অর্থবিষয়ক প্রস্তাব আইনসভায় উত্থাপন করিতে হইলে রাজ্যপালের অনুমতি প্রয়োজন। তাহার অনুমোদন ব্যতীত কোন ব্যয়বরাদ্দের দাবী আইনসভায় উত্থাপিত হইতে পারে না। রাজ্যপালের উদ্যোগেই অর্থমন্ত্রী আইনসভায় বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন।

বিচারবিষয়ক ক্ষমতা (Judicial Powers)

রাজ্যপাল দণ্ডদানের আদেশ সংশোধন করিতে পারেন। রাজ্য সরকারের ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত ব্যাপারে শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে রাজ্যপাল মার্জনা করিতে পারেন। দণ্ডকাল তিনি হ্রাস করিতে পারেন এবং দণ্ডপ্রদান স্থগিত রাখিতে পারেন। একজাতীয় দণ্ডকে অন্য জাতীয় দণ্ডে পরিবর্তিত করিবার ক্ষমতাও রাজ্যপালের আছে।

রাজ্যপালের ক্ষমতা পর্যালোচনা করিলে আপাতদৃষ্টিতে তাঁহাকে প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া মনে হয় এবং অনেক বিষয়ে তাঁহাকে ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত রাজ্যপালের মত স্বৈরাচারী শাসক বলিয়া ধারণা হয়। কিন্তু কার্যতঃ বর্তমান রাজ্যপালগণ নিয়মতান্ত্রিক শাসক-প্রধান ব্যতীত অন্য কিছু নহেন। একমাত্র আসামের উপজাতি-অধ্যুষিত এলাকা-সম্পর্কিত দুইটি বিষয় ব্যতীত অন্য কোন রাজ্যের রাজ্যপালই মন্ত্রি-পরিষদের সাহায্য ও পরামর্শ ব্যতীত শাসনকার্য পরিচালনা করিতে পারেন না। রাজ্যপালকে একদিকে মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শক্রমে শাসনকার্য পরিচালনা করিতে হয়, অপরদিকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপরিষদসহ রাষ্ট্রপতির আদেশ ও নির্দেশ অনুসারে চলিতে হয়। সুতরাং রাজ্যপালের পক্ষে স্বৈরাচারী হইবার সম্ভাবনা আদৌ নাই।

রাজ্যপাল পদের শাসনতান্ত্রিক তাৎপর্য (Constitutional significance of the Position of the Governor)

ভারতের নূতন শাসনতন্ত্রে বলা হইয়াছে যে, প্রত্যেক রাজ্যে রাষ্ট্রপতি

কর্তৃক নিযুক্ত একজন রাজ্যপাল থাকিবেন। তিনি শাসন ব্যাপারে রাজ্য মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ অনুযায়ী তাঁহার সকল ক্ষমতা পরিচালনা করিবেন। সুতরাং রাজ্যপাল পদের প্রকৃতি সম্পর্কে বলা যায় যে, তিনি ইংলণ্ডের রাজা বা রাণীর মত নিয়মতান্ত্রিক শাসক-প্রধান, প্রকৃত শাসন ক্ষমতার অধিকারী হইলেন মন্ত্রিপরিষদ। কারণ ভারতেও ইংলণ্ডের মত পার্লামেণ্টারী শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে।

রাজ্যপালের সংবিধান প্রদত্ত ক্ষমতাগুলি আলোচনা করিলে তাঁহাকে ইংলণ্ডের রাণীর মত নিছক নিয়মতান্ত্রিক শাসক-প্রধান বলা যুক্তিযুক্ত হয় না। প্রথমতঃ, রাজ্যপালের নিয়োগ সম্পর্কে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে রাজ্যের শাসক-প্রধান রূপে নিযুক্ত হন। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক রাজ্যপাল নিযুক্ত হন এবং রাষ্ট্রপতির খুশী মত তিনি কার্যে বহাল থাকেন। রাজ্যপালের নিয়োগ ব্যাপারে রাষ্ট্রপতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রি-পরিষদের পরামর্শে অধিকতরভাবে পরিচালিত হন। রাজ্যপালের নিয়োগ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের এই প্রাধান্য শুধু যে যুক্তরাষ্ট্র গঠন নীতি-বিরোধী তাহা নহে, এই ব্যবস্থার দ্বারা রাজ্যপালের পদের নিয়মতান্ত্রিক প্রকৃতি অনেক পরিমাণে ক্ষুণ্ণ করা হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, ক্ষমতার দিক দিয়া আলোচনা করিলেও রাজ্যপালকে সম্পূর্ণভাবে নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তা বলা সমীচীন হয় না। কেন্দ্রে মন্ত্রিপরিষদের সম্পর্কে রাষ্ট্রপতি যে অর্থে নিয়মতান্ত্রিক শাসক-প্রধান বলিয়া পরিগণিত হন, রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে মন্ত্রিপরিষদ সম্পর্কে রাজ্যপালকে সে অর্থে নিয়মতান্ত্রিক শাসক-প্রধান বলা চলে না। সংবিধানের ১৬৩ (ক) ধারায় বলা হইয়াছে যে, রাজ্যপাল যখন তাঁহার স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতাসমূহ অথবা স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার কোন একটি পরিচালনা করিবেন, তখন তিনি তাহা মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ ব্যতিরেকেই করিতে পারিবেন। অন্যান্য বিষয়সমূহ সম্পর্কে মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ অপরিহার্য হইলেও স্বেচ্ছাধীন বিষয়সমূহে এই পরামর্শ আদৌ প্রয়োজনীয় নহে। কি কি বিষয় তাঁহার স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতাভুক্ত, এ সম্পর্কেও রাজ্যপালের সিদ্ধান্তই হইল চূড়ান্ত এবং রাজ্যপালের এই সিদ্ধান্তের বৈধতার প্রশ্ন কেহ করিতে পারিবেন না। শাসনতন্ত্রের ষষ্ঠ তপশীলের নবম ও অষ্টাদশ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত হইয়াছে যে, এ সম্পর্কে বিশেষ বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত না হওয়া পর্যন্ত আসামের রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধি হিসাবে নির্দিষ্ট উপজাতি-অধ্যুষিত এলাকার শাসনকার্য

পরিচালনা করিবেন এবং এই কার্য তাঁহার স্বেচ্ছাধীন কার্যের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে অর্থাৎ মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ ছাড়াই তিনি এই এলাকার শাসন পরিচালনা করিবেন।

সংবিধানের ২৩৯ (২) ধারায় বলা হইয়াছে যে, রাষ্ট্রপতি যখন কোন রাজ্যপালকে সেই রাজ্যের নিকটবর্তী কোন কেন্দ্রীয় অঞ্চলের শাসন পরিচালনা ভার অর্পণ করিবেন, তখন সেই এলাকার শাসনকার্য রাজ্যপাল মন্ত্রিপরিষদের প্রভাবমুক্ত থাকিয়া (Independently of the Council of Ministers) পরিচালনা করিবেন।

১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে সংশোধিত শাসনতন্ত্রের ৩৭১ ধারায় বলা হইয়াছে যে, রাষ্ট্রপতি গুজরাত ও মহারাষ্ট্র রাজ্য দুইটির নির্দিষ্ট অঞ্চল উন্নয়নের জন্য উক্ত রাজ্য দুইটির রাজ্যপালদ্বয়কে বিশেষ দায়িত্ব (Special responsibility) প্রদান করিতে পারেন। অনুরূপভাবে পাঞ্জাব ও অন্ধ্ররাজ্যের আইনসভার আঞ্চলিক কমিটি গঠন ও পরিচালনা সম্পর্কে বলা হয় যে, রাষ্ট্রপতি সংশ্লিষ্ট রাজ্যপালের হস্তে বিশেষ দায়িত্ব ন্যস্ত করিতে পারেন।

৩৭১ (ক) ধারায় বলা হইয়াছে, যতদিন পর্যন্ত নাগাভূমিতে বিদ্রোহী নাগাদের কর্মতৎপরতা থাকিবে ততদিন পর্যন্ত নাগাভূমিতে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার বিশেষ দায়িত্ব নাগাভূমির রাজ্যপালের হস্তে ন্যস্ত থাকিবে।

এখন প্রশ্ন হইল রাজ্যপালের এই বিশেষ দায়িত্বের তাৎপর্য কি? সংবিধানে এই বিশেষ দায়িত্বের কোন ব্যাখ্যা নাই। সুতরাং বিশেষ দায়িত্ব পালনের জন্য রাজ্যপাল মন্ত্রিপরিষদের সহিত পরামর্শ নাও করিতে পারেন অর্থাৎ মন্ত্রিপরিষদ নিরপেক্ষভাবে স্ব-ইচ্ছায় শাসন পরিচালনা করিতে পারেন।

রাজ্যপালের শাসনতান্ত্রিক প্রকৃতির সম্বন্ধে আরও দুইটি বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে। প্রথমতঃ, রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির নিকট দায়ী এবং দ্বিতীয়তঃ, তিনি কি কি বিষয়ে তাঁহার স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা পরিচালনা করিবেন তাহাও একমাত্র রাজ্যপাল স্বেচ্ছাধীনভাবে স্থির করিবেন। ইহা হইতে সহজে অনুমান করা যায় যে, শাসনতন্ত্রে বিশেষভাবে উল্লিখিত বিষয়সমূহ বহির্ভূত ব্যাপারেও তিনি মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ গ্রহণ না করিয়াও শাসন পরিচালনা করিতে পারেন। উপরি-উক্ত অবস্থার উদাহরণে বলা যায় যে, রাজ্যপালের যখন কোন রাজ্যের শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থা উদ্ভবের বিষয় রাষ্ট্রপতির গোচরীভূত করিতে হয়, তখন অনেক ক্ষেত্রে তাঁহাকে মন্ত্রিপরিষদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনিতে হয় এবং

এই অভিযোগের বিবরণী নিশ্চয়ই তিনি মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ অনুযায়ী করিতে পারেন না। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রেও বলা যায় যে, রাজ্যপাল স্বেচ্ছাধীনভাবে তাঁহার কার্য পরিচালনা করেন। আবার কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশগুলি রাজ্য সরকার পালন করিতেছে কি না তাহাও রাজ্যপালের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার অবগত হন।

ইহা ব্যতীত রাষ্ট্রপতি যখন কোন রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থার সৃষ্টি ঘোষণা করিয়া রাজ্যের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন তখন রাজ্যপাল শাসনতন্ত্র নির্ধারিত রাজ্য-সংক্রান্ত বিষয়গুলির শাসনকার্য রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধি হিসাবে পরিচালনা করেন।

পরিশেষে, রাজ্যপাল রাজ্যের আইনসভা কর্তৃক গৃহীত আইনের প্রস্তাব রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য স্থগিত রাখিতে পারেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপরিষদ ও রাজ্যের মন্ত্রিপরিষদ যদি এক মতাবলম্বী না হয় তাহা হইলে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে রাজ্যপাল কেন্দ্রীয় সরকারের স্বার্থে ও মর্যাদার খাতিরে রাজ্য মন্ত্রিপরিষদের বিরোধিতা করিয়াও প্রস্তাবিত আইনটিকে রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য স্থগিত রাখিবেন।

সুতরাং শেষ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রগুলিতে রাজ্যপাল সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রপতি তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপরিষদের প্রভাবাধীন থাকিবেন। অন্য ব্যাপারে রাজ্যপালের উপর রাষ্ট্রপতির প্রভাব শক্তিশালী নহে, কারণ আইনসভার আস্থাভাজন সপরিষদ মুখ্যমন্ত্রীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কার্য করা রাজ্যপালের পক্ষে সম্ভব নহে।

মন্ত্রিপরিষদের সহিত রাজ্যপালের সম্পর্ক (Relation of the Council of Ministers to the Governor)

ভারতের শাসনতন্ত্রে সুস্পষ্টভাবে লিখিত আছে যে, শাসনকার্যে রাজ্যপালকে পরামর্শদান ও সাহায্য করিবার নিমিত্ত প্রত্যেক রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রিসহ একটি মন্ত্রিপরিষদ থাকিবে। রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়োগ করিবেন এবং মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারে অন্যান্য মন্ত্রিগণকে নিযুক্ত করিবেন। মন্ত্রিগণ রাজ্যপালের খুসীমত কার্যে বহাল থাকিবেন। প্রত্যেক মন্ত্রীই এক বা একাধিক শাসন-বিভাগ পরিচালনার ভারপ্রাপ্ত হন এবং তাঁহারা তাঁহাদের কার্যের জন্য যৌথভাবে আইনসভার নিকট দায়ী থাকেন। মুখ্যমন্ত্রীর নিয়োগে রাজ্যপাল

তাঁহার খুসীমত কাহাকেও নিয়োগ করিতে পারেন না। আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠদলের নেতাকেই মন্ত্রিপরিষদ গঠন করিবার জন্য আহ্বান করিতে হয়। আবার মন্ত্রিপরিষদ যতদিন পর্যন্ত আইনসভার আস্থাভাজন থাকেন ততদিন পর্যন্ত রাজ্যপাল তাঁহাদের পদচ্যুত করিতে পারেন না। সুতরাং দেখা যায় যে, মন্ত্রিপরিষদই হইল রাজ্যের প্রকৃত শাসক—আর রাজ্যপাল হইলেন রাজ্যের শাসনতান্ত্রিক শাসক-প্রধান।

সুতরাং সাধারণভাবে বলিতে গেলে কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির সহিত মন্ত্রিপরিষদের যে সম্পর্ক রাজ্যগুলির শাসনক্ষেত্রে রাজ্যপালের সহিত রাজ্য মন্ত্রিপরিষদের প্রায় অনুরূপ সম্পর্ক। কিন্তু একটি বিষয়ে এই সম্পর্কের বিশেষ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থায় সংবিধান কর্তৃক রাষ্ট্রপতির উপর কোন স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই, কিন্তু রাজ্য শাসনক্ষেত্রে রাজ্যপালকে স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে এবং এই ক্ষমতার বলে রাজ্যপাল মন্ত্রিপরিষদের সহিত পরামর্শ না করিয়া কতিপয় নির্দিষ্টক্ষেত্রে শাসনকার্য পরিচালনা করিতে পারেন। [এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা রাজ্যপাল পদের শাসনতান্ত্রিক তাৎপর্য অনুচ্ছেদে করা হইয়াছে।]

মন্ত্রিপরিষদ (Council of Ministers)

রাজ্যপালকে সাহায্য ও পরামর্শ দান করিবার জন্য প্রত্যেক রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রিসহ একটি মন্ত্রিপরিষদ আছে। রাজ্যপালকে পরামর্শদান-সম্পর্কে কোন বিচারালয়ে মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনীত হইতে পারে না। রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীকে (Chief Minister) নিযুক্ত করেন এবং মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী অন্যান্য মন্ত্রিগণকে নিযুক্ত করিয়া থাকেন। মন্ত্রিগণ তাঁহার খুশীমত কার্যে বহাল থাকেন। মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণকে আইনসভার সদস্য হইতে হইবে। যদি কোন মন্ত্রী আইনসভার সদস্য না হন, তাহা হইলে তাঁহার নিয়োগকাল হইতে ছয় মাসের মধ্যে আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হইতে হইবে, নতুবা তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে হইবে। প্রত্যেক মন্ত্রী একটি বা একাধিক দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত থাকেন এবং মুখ্যমন্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিয়া ও তাঁহার নির্দেশক্রমেই দপ্তরের কার্য পরিচালনা করেন। মন্ত্রিগণ তাঁহাদের নীতি ও কার্যের জন্য যৌথভাবে আইনসভার নিকট দায়ী। রাজ্যশাসন ক্ষেত্রেও

কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার অনুরূপ দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। রাষ্ট্রপতি ও পার্লামেণ্ট সভার সহিত কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপরিষদের যেরূপ সম্পর্ক, রাজ্য মন্ত্রি-পরিষদেরও রাজ্যপাল ও রাজ্য আইনসভার সহিত তদ্রূপ সম্পর্ক। মন্ত্রী ব্যতীত প্রায় সকল রাজ্যেই রাষ্ট্র মন্ত্রী অথবা উপ-মন্ত্রী আছেন। মন্ত্রিগণ আইনসভা কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণ বেতন ও ভাতা পান। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিমণ্ডলীর সদস্যগণের ন্যায় রাজ্যমন্ত্রিগণও উভয় পরিষদে উপস্থিত থাকিতে পারেন। বিহার, উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশ—এই তিনটি রাজ্যে উপজাতির স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য একজন করিয়া মন্ত্রী আছেন।

মুখ্যমন্ত্রী (Chief Minister)

ক্ষমতা ও পদমর্যাদার দিক দিয়া দেখিতে গেলে মুখ্যমন্ত্রীকে রাজ্যশাসন ব্যবস্থার শীর্ষ স্থানীয় ব্যক্তি বলা চলে। তাঁহার ক্ষমতা ও পদমর্যাদা অনেকাংশে কেন্দ্রীয় প্রধান মন্ত্রীর অনুরূপ হইলেও কয়েকটি বিষয়ে সুস্পষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। সংবিধান অনুসারে কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার প্রায় সবক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিকে স-পরিষদ প্রধান মন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারে শাসনকার্য পরিচালনা করিতে হয়, কিন্তু রাজ্যশাসন ক্ষেত্রে রাজ্যপাল কয়েকটি বিশেষ অবস্থায় মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ গ্রহণ না করিয়াও শাসনকার্য পরিচালনা করিতে পারেন। শাসনতন্ত্রে উল্লিখিত কয়েকটি বিষয়ে রাজ্যপাল মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ গ্রহণ না করিয়া স্বেচ্ছাধীনভাবে কার্য করিতে পারেন এবং অন্ধ্র, পাঞ্জাব, গুজরাত, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি যে সমস্ত রাজ্যে রাজ্যপালকে বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছে, সেই সমস্ত বিশেষ দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে রাজ্যপাল মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ ব্যতীত কায করিতে পারেন। এই সমস্ত বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ের শাসন ব্যাপারে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় প্রধানমন্ত্রীর মতই রাজ্যের প্রকৃত শাসক-প্রধান হিসাবে পরিগণিত হন।

ভারতের সংবিধানে সুস্পষ্টভাবে লিখিত আছে যে, প্রত্যেক রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রিসহ একটি মন্ত্রিপরিষদ থাকিবে। রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়োগ করেন এবং এই নিয়োগ ব্যাপারে রাজ্যপালের স্বাধীন ইচ্ছা প্রয়োগের বিশেষ কোন ক্ষমতা নাই। আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকেই তাঁহার মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত করা ছাড়া উপায় নাই। যে সমস্ত রাজ্যে দ্বি-পরিষদ আইনসভা বর্তমান, সেখানে রাজ্যপাল যে-কোন কক্ষ হইতে মুখ্যমন্ত্রী নিয়োগ করিতে পারেন। মুখ্যমন্ত্রীকে যে নিম্ন কক্ষের সদস্য হইতেই হইবে ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রীর ন্যায়

ভারতের সংবিধানে এরূপ কোন বিধি নাই। তবে কেন্দ্রে ও রাজ্যগুলিতে দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে জনগণ দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত সদস্য সমন্বিত নিম্ন কক্ষ হইতে মুখ্যমন্ত্রীর নিয়োগ অধিকতর স্বাভাবিক ও কাম্য। রাজ্যপাল অবশ্য আইনসভা বহির্ভূত কোন ব্যক্তিকে মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত করিতে পারেন, কিন্তু এরূপ ব্যক্তি যদি ছয় মাসের মধ্যে আইনসভায় নির্বাচিত হইতে না পারেন তবে তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে হয়। ইহা ব্যতীত এরূপ গুরুত্বপূর্ণ ও দায়িত্বশীল পদে মনোনীত ব্যক্তির নিয়োগ অ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলিয়া দেশে অসন্তোষের সৃষ্টি হইতে পারে।

মুখ্যমন্ত্রী হইলেন রাজ্যপালের প্রধান উপদেষ্টা এবং তিনিই হইলেন রাজ্যপাল ও মন্ত্রিপরিষদের মধ্যে যোগসূত্র। রাজ্যশাসন ব্যাপারে সংবিধান কর্তৃক রাজ্যপালের উপর যে ব্যাপক ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে কার্যতঃ, সে সমুদয় ক্ষমতা মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী পরিচালিত হয়।

দ্বিতীয়তঃ, মুখ্যমন্ত্রী হইলেন মন্ত্রিপরিষদের সভাপতি ও পরিচালক। অন্যান্য মন্ত্রিগণ মুখ্যমন্ত্রীর সুপারিশক্রমে রাজ্যপাল কর্তৃক নিযুক্ত হন। মুখ্যমন্ত্রী শুধু মন্ত্রিসভার সভাপতি নহেন, তাঁহার অন্যান্য সহকর্মিগণকে তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও যুক্তির প্রভাবে স্বমতে আনিতে হয়। যদি কোন মন্ত্রী তাঁহার মত গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হন তাহা হইলে তিনি তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে বাধ্য করিতে পারেন। মুখ্যমন্ত্রীই অন্যান্য মন্ত্রিগণের মধ্যে দপ্তর বণ্টন করেন এবং সকল দপ্তরের কাযের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন।

রাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসাবে তিনি আইনসভারও নেতা। নেতা হিসাবে তাঁহাকে দলের সংহতি ও মর্যাদা রক্ষা করিতে হয়। এজন্য জনসাধারণের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহাকে জনমত নিয়ন্ত্রণ করিতে হয়। তাঁহার মুখ্যমন্ত্রীত্ব, দলীয় নেতৃত্ব প্রভৃতি সব কিছুই তাঁহার জনপ্রিয়তার উপর নির্ভর করে। রাজ্য আইনসভায় তিনি সরকারী নীতি সমর্থন করেন এবং বিরোধী দলগুলির প্রশ্ন ও সমালোচনার উত্তর প্রদান করেন।

সুতরাং দেখা যায় যে, রাজ্যশাসন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী হইলেন শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রস্থল। তাঁহার যোগ্যতা ও জনপ্রিয়তার উপর রাজ্যের স্ব-শাসন অনেক পরিমাণে নির্ভর করে।

রাজ্য মহা-ব্যবহারিক (Advocate General)

প্রত্যেক রাজ্য সরকারের একজন মহা-ব্যবহারিক থাকেন। ইনি আইন সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞ হিসাবে রাজ্য সরকারের আইন-সংক্রান্ত বিষয়ের উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করেন। ইহার কর্তব্য কেন্দ্রীয় সরকারের মহা-ব্যবহারিকের অনুরূপ। রাজ্যের মহা-ব্যবহারিক রাজ্যপাল কর্তৃক নিযুক্ত হন এবং তাঁহার খুসীমত কার্যে বহাল থাকেন। উচ্চ বিচারালয়ের বিচারপতির যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে মহা-ব্যবহারিক নিযুক্ত করা হয়। রাজ্যপাল তাঁহার বেতনাদি স্থির করেন। মহা-ব্যবহারিক রাজ্য আইনসভার উভয় কক্ষে উপস্থিত থাকিয়া সভার কাযে অংশ গ্রহণ করিতে পাবেন, কিন্তু ভোটদান করিতে পারেন না।

সংক্ষিপ্তসার

রাজ্যশাসন কর্তৃপক্ষ

প্রত্যেক রাজ্যে একজন রাজ্যপাল থাবেন। তিনি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ৫ বৎসরের জন্য নিযুক্ত হন। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার সহিত রাষ্ট্রপতি কর্তৃক রাজ্যপালের নিযোগ অসংগতিপূর্ণ বলিয়া অনেকে মনে করেন। কিন্তু রাজ্যপাল রাজ্যের নিয়মতান্ত্রিক শাসক-প্রধান। কতিপয় বিশেষক্ষেত্র ব্যতীত তাঁহার স্বকীয় ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার নাই। রাজ্যপালের শাসন বিভাগীয়, আইন প্রণয়ন বিষয়ক, বিচার বিষয়ক, অর্থ-সংক্রান্ত নানাবিধ ক্ষমতা আছে। কিন্তু এই সকল ক্ষমতা তিনি মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুসারে পরিচালনা করেন। কেবল আসামের রাজ্যপাল উপজাতীয় এলাকার শাসন ব্যাপারে মন্ত্রিসভা নিরপেক্ষ।

প্রত্যেক রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য মন্ত্রী লইয়া একটি মন্ত্রিসভা আছে। এই মন্ত্রিসভাই হইল রাজ্যের প্রকৃত শাসক। রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীকে নিযুক্ত করেন এবং মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারে অন্যান্য মন্ত্রিগণ রাজ্যপাল কর্তৃক নিযুক্ত হন। মুখ্যমন্ত্রী হইলেন মন্ত্রিসভার সভাপতি ও আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা। তাঁহার নির্দেশেই মন্ত্রিসভা ও আইনসভা পরিচালিত হয়। মন্ত্রিসভা ইহার নীতি ও কার্যের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী।

·াজ্যসরকারের আইন সংক্রান্ত বিষয়ের উপদেষ্টা হিসাবে প্রত্যেক রাজ্যে একজন আইন-বিশেষজ্ঞ রাজ্য মহা-ব্যবহারিক রূপে নিযুক্ত থাকেন।

1. Describe the position, powers and functions of the Governor of an Indian State. Should he be elected by the people or nominated by the President ?

2. Discuss the relationship between the Governor and his Ministers. In what respect does the principle of Cabinet responsibility in the states differ from that in the Union ?

3. Write a note on the legislative powers of the Governors of Indian States.

4. "The Chief Minister is the real ruler of an Indian state." —Examine.

———

একাদশ অধ্যায়
রাজ্য আইনসভা
(The State Legislature)

রাজ্য আইনসভা (State Legislature)

রাজ্য পুনর্গঠন আইনের ভিত্তিতে ও পরবর্তী সংশোধন আইনের ফলে ভারতের ১৫টি রাজ্যে (জম্মু ও কাশ্মীর ব্যতীত) একজন রাজ্যপাল এবং একটি অথবা দুইটি পরিষদ লইয়া রাজ্য আইনসভা গঠিত হইয়াছে। অন্ধ্র, মাদ্রাজ, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র ও মহীশূর রাজ্যে দুইটি কক্ষ ও অন্যান্য রাজ্যে এক-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা গঠিত হইয়াছে। উচ্চ পরিষদ বিধান পরিষদ (Legislative Council) ও নিম্ন পরিষদ বিধান সভা (Legislative Assembly) নামে অভিহিত হয়। কোন রাজ্যে অবস্থিত উচ্চ পরিষদ বিলোপ করা হইবে বা গঠিত হইবে তাহা স্থির করিতে হইলে সেই রাজ্যের নিম্ন পরিষদের ⅔ ভোটাধিক্যে ও সমগ্র সদস্যগণের সংখ্যাধিক্যে প্রস্তাব গ্রহণ করিতে হয় এবং উক্ত প্রস্তাব পার্লামেণ্ট সভা কর্তৃক ভোটাধিক্যে গৃহীত হওয়া চাই।

বিধান পরিষদ (Legislative Council)

উচ্চ কক্ষ অর্থাৎ বিধান পরিষদের মোট সদস্যসংখ্যা নিম্ন কক্ষের সদস্য সংখ্যার ¼এর অধিক এবং ৪০এর কম হইতে পারিবে না। পার্লামেণ্ট অন্য ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত বিধান পরিষদগুলি নিম্নলিখিতভাবে গঠিত হইবে :

১। এক-তৃতীয়াংশ সদস্য স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন।

২। এক-দ্বাদশাংশ সদস্য অন্যূন তিন বৎসরের পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি পাইয়াছেন এমন ব্যক্তিদের দ্বারা নির্বাচিত হইবে।

৩। এক-দ্বাদশাংশ কমপক্ষে তিন বৎসর শিক্ষকতা করিয়াছেন এমন ব্যক্তিদের দ্বারা নির্বাচিত হইবেন।

৪। এক-তৃতীয়াংশ সদস্য নিম্ন পরিষদ কর্তৃক পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হইবেন।

৫। অবশিষ্ট সদস্যগণ সাহিত্য, বিজ্ঞান, সমাজসেবা প্রভৃতি বিষয়ে কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে রাজ্যপাল কর্তৃক মনোনীত হইয়া থাকেন।

বিধান পরিষদ স্থায়ী, তবে প্রত্যেক দুই বৎসর অন্তর এক-তৃতীয়াংশ সদস্য বিদায় গ্রহণ করেন। সদস্যগণ ভারতীয় নাগরিক হইবেন এবং তাঁহাদের অন্ততঃ তিরিশ বৎসর বয়স্ক হওয়া চাই। বিধান পরিষদের কার্যপরিচালনা করিবার জন্য সদস্যগণ নিজেদের মধ্য হইতে একজন সভাপতি (Chairman) ও একজন সহ-সভাপতি (Deputy Chairman) নির্বাচন করেন।

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের বিধান পরিষদ মোট ৭৫ জন সদস্য লইয়া গঠিত। তন্মধ্যে ৯ জন রাজ্যপাল কর্তৃক মনোনীত, ৪ জন যথাক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিপ্রাপ্ত ভোটদাতা ও শিক্ষক কর্তৃক নির্বাচিত এবং ১৭ জন যথাক্রমে বিধান সভা ও স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্বাচিত।

রাজ্য পুনর্গঠন আইন বলবৎ হওয়ার ফলে দ্বিকক্ষ-সমন্বিত রাজ্যগুলির উচ্চ কক্ষের সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন অনুভূত হওয়ায় ১৯৫৭ সালে পার্লামেণ্ট সভায় একটি বিল পাস হইয়াছে। এই নূতন আইনানুসারে রাজ্যগুলির উচ্চ কক্ষের সদস্যসংখ্যা নিম্ন কক্ষের সদস্যসংখ্যার $\frac{১}{৪}$ অংশের পরিবর্তে $\frac{১}{৩}$ অংশ করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত এই আইনে অন্ধ্র রাজ্যের জন্য একটি উচ্চ কক্ষ গঠন করা হইয়াছে।

বিধান সভা (Legislative Assembly)

বিধানসভা একুশ বৎসর বয়স্ক ভোটদাতৃগণের ভোটের দ্বারা নির্বাচিত সদস্য লইয়া গঠিত হয়। প্রত্যেক রাজ্যের বিধান সভার সদস্যসংখ্যা স্থির করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কোন বিধান সভার সদস্যসংখ্যা ৬০-এর কম বা ৫০০-এর অধিক হইতে পারে না। ২৫৬ জন সদস্য লইয়া পশ্চিমবঙ্গের বিধান সভা গঠিত। শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হওয়ার পর দশ বৎসর পর্যন্ত তপশীলভুক্ত সম্প্রদায় ও আসামের উপজাতিদের জন্য আসন-সংরক্ষণের ব্যবস্থা হইয়াছে। রাজ্যপাল প্রয়োজন বোধ করিলে য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান্ সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে সদস্য মনোনীত করিতে পারিবেন। এই সভার কার্যকাল ৫ বৎসর। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জরুরী অবস্থা ঘোষিত হইলে পার্লামেণ্ট এক বৎসর পর্যন্ত

ইহার কার্যকাল বৃদ্ধি করিতে পারে। অপরপক্ষে আবার ইহার কার্যকাল শেষ হইবার পূর্বে ইহাকে ভাঙ্গিয়া দেওয়া যাইতে পারে। বিধানসভার সদস্যগণ নিজেদের মধ্য হইতে একজন স্পীকার ও একজন ডেপুটি স্পীকার নির্বাচন করেন।

রাজ্যগুলির আইনসভার গঠন (Composition of State Legislatures)

রাজ্যগুলির নাম	বিধান পরিষদ	বিধান সভা
অন্ধ্র প্রদেশ	৯০	৩০০
আসাম	×	১০৫
বিহার	৯৬	৩১৮
গুজরাত	×	১৫৪
মহারাষ্ট্র	৭৮	২৬৪
কেরল	×	১৩৩
মধ্যপ্রদেশ	৯০	২৮৮
মাদ্রাজ	৬৩	২০৬
মহীশূর	৬৩	২০৮
উড়িষ্যা	×	১৪০
পাঞ্জাব	৫১	১৫৪
রাজস্থান	×	১৭৬
উত্তরপ্রদেশ	১০৮	৪৩০
পশ্চিমবঙ্গ	৭৫	২৫২
জম্মু ও কাশ্মীর	৩৬	৭৫
নাগাভূমি	×	৪৬

কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলের স্থানীয় সভা (Territorial Councils)

১।	হিমাচল প্রদেশ	৪১
২।	মণিপুর	৩০
৩।	ত্রিপুরা	৩০
৪।	গোয়া, দমন, দিউ	৩০
৫।	পণ্ডিচেরী	৩০

রাজ্য আইনসভার ক্ষমতা ও কার্য (Powers and Functions of the State Legislature)

রাজ্যের আইনসভা রাজ্যতালিকাভুক্ত ও যুগ্ম তালিকাভুক্ত বিষয়সম্পর্কে আইন প্রণয়ন করিতে পারে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, রাজ্য আইনসভা-গুলির এই আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা পার্লামেন্টের বিশেষ ক্ষমতার দ্বারা সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে। যুগ্ম তালিকাভুক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে রাজ্য আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইন যদি পার্লামেন্ট-প্রণীত আইনের বিরোধী হয়, তাহা হইলে রাজ্য আইন বাতিল হইবে।

কোন বিল আইনে পরিণত হইতে হইলে উভয় পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। তবে উচ্চ পরিষদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। উচ্চ পরিষদ তিন মাস পর্যন্ত নিম্ন পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত বিলে সম্মতিজ্ঞাপন না করিতে পারে। উক্ত বিল যদি দ্বিতীয় বার নিম্ন পরিষদ কর্তৃক গৃহীত হয় তাহা হইলে উচ্চ পরিষদ উক্ত বিলে একমাস পর্যন্ত সম্মতি না দিতে পারে। কিন্তু একমাস অতীত হইলে উক্ত বিল নিম্ন পরিষদ কর্তৃক যে আকারে গৃহীত হয়, ঠিক সেই আকারেই আইনে পরিণত হয়। সুতরাং মতবিরোধ ক্ষেত্রে নিম্নপরিষদের মতই বলবৎ হয়। রাজ্য আইনসভাগুলিতে পার্লামেন্ট সভার মত যুক্ত অধিবেশন সাহায্যে মতবিরোধ দূর করিবার ব্যবস্থা নাই।

অর্থ-সংক্রান্ত বিলসম্পর্কেও নিম্ন পরিষদের প্রাধান্য সূচিত হয়। অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাব উচ্চ পরিষদে উত্থাপিত হইতে পারে না। অর্থ-সংক্রান্ত বিলে উচ্চ পরিষদ তাহার অভিমত জ্ঞাপন করিতে পারে কিন্তু নিম্ন পরিষদ তাহা গ্রহণ বা বর্জন করিতে পারে। উচ্চ পরিষদ যদি ১৪ দিনের মধ্যে অর্থ-সংক্রান্ত বিল নিম্নপরিষদে প্রেরণ না করে, তাহা হইলে নির্ধারিত সময় উত্তীর্ণ হইবার পর উহা আইনে পরিণত হয়। মন্ত্রিপরিষদ যৌথভাবে নিম্ন পরিষদের নিকট দায়ী।

রাজ্য আইনসভা-সম্পর্কে রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপালের ক্ষমতার কথা পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। রাষ্ট্রপতির ন্যায় রাজ্যপালও আইন-প্রণয়নে সম্মতি দিতে পারেন, অথবা প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন, অথবা পুনর্বিবেচনার জন্য আইনসভায় ফেরত পাঠাইতে পারেন কিংবা রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য পাঠাইতে পারেন। কিন্তু রাজ্যপাল কর্তৃক পুনর্বিবেচনার জন্য প্রেরিত বিল যদি আইনসভা কর্তৃক বিনা সংশোধনে অথবা সংশোধিত আকারে গৃহীত হইয়া

রাজ্যপালের নিকট দ্বিতীয়বার উপস্থাপিত হয়, তাহা হইলে উক্ত বিল হইতে তিনি সম্মতি প্রত্যাহার করিতে পারেন না।

রাজ্য আইনসভার ক্ষেত্রে দ্বি-পরিষদের সপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি

(Arguments for and against Bi-cameralism in the Indian States)

দ্বি-পরিষদ আইনসভা সম্পর্কে রাষ্ট্র বিজ্ঞানীগণের মধ্যে বহুদিন ধরিয়া মতভেদ ছিল। দ্বি-পরিষদ আইনসভার বিরুদ্ধে ল্যাস্কি প্রভৃতি মনীষিগণের শক্তিশালী যুক্তিসত্ত্বেও দ্বি-পরিষদ আইনসভা গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অপরিহার্য অংশরূপে অধিকাংশ দেশের আইনসভা সংগঠনে স্থান পাইয়াছে। চেকোশ্লোভেকিয়া, বুলগেরিয়া, চীন, পাকিস্তান প্রভৃতি কয়েকটি দেশ ব্যতীত অন্যান্য দেশে দ্বি-পরিষদ আইনসভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দেশের কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থায় দ্বি-পরিষদ আইনসভার প্রয়োজনীয়তা থাকিলেও রাজ্য আইনসভার সংগঠনে দ্বি-পরিষদের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে গুরুতর মতভেদ দেখা যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশের আঙ্গিক রাজ্যগুলির আইনসভা দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট। ক্যানাডায় নয়টি প্রদেশের মধ্যে মাত্র দুইটি প্রদেশের আইনসভা দ্বি-পরিষদযুক্ত। ভারতে ষোলটি রাজ্য আইনসভার মধ্যে দশটি দ্বি-কক্ষ-সমন্বিত এবং এক কক্ষ-সমন্বিত অন্য রাজ্যগুলিতে উচ্চ কক্ষ প্রতিষ্ঠা করিবার বিধান শাসনতন্ত্রে লিখিত আছে। এখন প্রশ্ন হইল যে, ভারতে রাজ্য আইনসভাগুলিতে উচ্চ কক্ষ সৃষ্টি করিবার আদৌ কোন যুক্তিযুক্ততা আছে কিনা।

ভারতে নূতন সংবিধান রচনাকালে বিহার, বোম্বাই, মাদ্রাজ, পশ্চিমবঙ্গ, মহীশূর ও উত্তর প্রদেশের প্রতিনিধি গণপরিষদের সদস্যগণের অভিপ্রায় অনুসারে উক্ত রাজ্যগুলিতে দ্বিপরিষদ আইনসভার সৃষ্টি হয়। পরবর্তী কালে, আরও কয়েকটি রাজ্যের অভিপ্রায় অনুসারে ভারতে দ্বি পরিষদ রাজ্য আইনসভার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া দশ হয়।

দ্বি-কক্ষ-বিশিষ্ট আইনসভার পক্ষে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত যুক্তিগুলির অবতারণা করা হয়। ১। দ্বি-কক্ষ আইনসভা দ্রুত ও বিশেষ বিবেচনা না করিয়া আইন পাস করিতে বাধা দেয়। ২। নিম্ন কক্ষের অসংযত ও পক্ষপাতমূলক আইন-প্রণয়নে অন্তরায়রূপে কাজ করে। ৩। ইহা নিম্ন কক্ষের স্বৈরাচার

বন্ধ করিতে পারে। ৪। উচ্চ কক্ষ, জ্ঞানী, গুণী ও অভিজ্ঞ লোকের প্রতিনিধিত্ব করিতে পারে। ৫। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় উচ্চ কক্ষ প্রদেশগুলির ন্যায্য অধিকার রক্ষা করিতে সাহায্য করে। ৬। দ্বি-কক্ষের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াই আজ পৃথিবীর প্রায় সকল দেশই দ্বি-কক্ষ-বিশিষ্ট আইনসভা গ্রহণ করিয়াছে।

উপরি-উক্ত যুক্তিগুলির ভিত্তিতে বিচার করিলে ভারতে কেন্দ্রীয় আইনসভার ক্ষেত্রে দ্বি-পরিষদ আইনসভার অস্তিত্ব সমর্থনযোগ্য হইলেও রাজ্য সরকারগুলির ক্ষেত্রে দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা প্রতিষ্ঠার কোন সার্থকতা আছে কি না সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ আছে।

ফরাসী লেখক আবে সিয়েযে বলিয়াছেন যে, উচ্চ কক্ষ যদি নিম্ন কক্ষের সহিত একমত হয়, তাহা হইলে ইহার কোন উপযোগিতা নাই, আর উচ্চ কক্ষ যদি নিম্ন কক্ষের সহিত একমত না হয়, তাহা হইলে এরূপ উচ্চ কক্ষ ক্ষতিকর। ভারতে যে সকল রাজ্যে দ্বি-পরিষদ আইনসভা আছে, সেগুলি সম্পর্কে আবে সিয়েযের মত সম্পূর্ণভাবে প্রযোজ্য। কারণ, রাজ্যের উচ্চ কক্ষগুলির কি সাধারণ আইন-প্রণয়নে, কি অর্থ-সংক্রান্ত আইন-প্রণয়নে কার্যতঃ কোন ক্ষমতা নাই। রাজ্য বিধানসভাগুলি বিধান পরিষদগুলির বিনা অনুমোদনে উভয়বিধ আইন প্রণয়ন করিতে পারে। কিন্তু বিধান পরিষদগুলি বিধানসভাগুলির বিনা অনুমোদনে কোন আইনই পাস করিতে অসমর্থ। সুতরাং উচ্চ কক্ষগুলি কার্যতঃ নিষ্প্রয়োজনীয়। ইহা ছাড়া রাজ্যের উচ্চ কক্ষ ইহার অস্তিত্বের জন্যও নিম্ন কক্ষের উপর নির্ভরশীল। নিম্ন কক্ষ ২/৩ সদস্যের ভোটে একটি প্রস্তাব পাস করিয়া উচ্চ কক্ষ বিলোপ করিবার জন্য পার্লামেন্টের নিকট সুপারিশ করিতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, রাজ্যের দ্বি-কক্ষগুলি পদমর্যাদায় হীন, কারণ ইহার সদস্যগণ অংশতঃ নির্বাচিত এবং অংশতঃ বিভিন্ন সম্প্রদায় ও স্বার্থের প্রতিনিধি। গণ-তান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় অ-গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার দ্বারা নিযুক্ত আইনসভার প্রতি জনগণের আস্থা থাকিতে পারে না। মন্ত্রিপরিষদ এই সভার নিকট দায়ী নহেন বলিয়াও ইহার মর্যাদার হানি হইয়াছে।

তৃতীয়তঃ, বর্তমান সময়ে কোন আইনই দ্রুত পাস হইতে পারে না। ভারতে জমিদারী প্রথা বিলোপের প্রস্তাব দীর্ঘদিন ধরিয়া আলোচিত হয়। আর নিম্ন কক্ষ যদি একান্তই দ্রুত আইন পাস করিতে বদ্ধপরিকর হয়, তাহা হইলে তাহা রোধ করিবার ক্ষমতা উচ্চ কক্ষের নাই। অধিকন্তু বলা হয় যে, বর্তমানে

প্রগতিশীল কোন আইন-প্রণয়নে উচ্চ কক্ষই বেশী বাধা দেয়। সুতরাং ইহার কোন উপযোগিতা নাই।

চতুর্থতঃ, দ্বি-কক্ষের সপক্ষে যুক্তরাষ্ট্রীয় যে নীতির অবতারণা করা হয়, রাজ্য আইনসভার ক্ষেত্রে তাহা আদৌ প্রযোজ্য নহে। ইহা ছাড়া, বলা যায় যে, উচ্চ কক্ষের সদস্যগণ দলগত ভিত্তিতে নির্বাচিত বা মনোনীত হইয়া থাকেন এবং তাঁহারা কোন প্রস্তাবের ভাল-মন্দ বিবেচনা না করিয়া দলীয় নির্দেশেই পরিচালিত হন। ইহা ছাড়া, দ্বি-কক্ষ থাকার ফলে সরকারী দল অধিকসংখ্যায় তাহাদের অনুসরণকারীদের সদস্য মনোনীত করিয়া দলপুষ্ট করিতে পারে। এই পদ্ধতিও গণতন্ত্র-বিরোধী।

পঞ্চমতঃ, বলা যায় যে, দেশ বিভক্ত হওয়ার ফলে পশ্চিমবঙ্গের ন্যায় বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের সৃষ্টি হইয়াছে। আয়তন ও লোকসংখ্যার দিক দিয়া দেখিতে গেলে এই সকল ক্ষুদ্র রাজ্যে উচ্চ কক্ষের কোন প্রয়োজনীয়তা দেখা যায় না। শুধু তাহাই নহে, উচ্চ কক্ষ ব্যয়-বহুল বটে। করভাবে পীড়িত দরিদ্র রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে উচ্চ কক্ষ একটি ব্যয়সাধ্য বিলাসিতা বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

ষষ্ঠতঃ, ভারতের সংবিধান অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকারকে কাযতঃ সব ক্ষমতার আধার করা হইয়াছে। রাজ্য সরকারগুলির এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ নাই যাহা বিচার-বিবেচনা করিবার জন্য একটি ব্যয়-বহুল উচ্চ কক্ষের প্রয়োজনীয়তা থাকিতে পারে।

পরিশেষে বলা যায় যে, সংবিধানের স্রষ্টাগণও দ্বি-পরিষদ আইনসভার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সন্দিহান ছিলেন এবং এই কারণে তাঁহারা সংবিধানে যুগপৎ উচ্চ কক্ষ সৃষ্টি ও বিলোপের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। নতুবা তাহারা উচ্চ কক্ষ বিলোপের উল্লেখ করিতেন না।

অর্থ-সংক্রান্ত আইন (Money Bills)

রাজ্য আইনসভায় অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাবগুলি কেন্দ্রের অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাবগুলির অনুরূপ পদ্ধতিতে পাস করা হয়। যে বিলগুলি নিম্নলিখিত বিষয়বস্তু সম্বলিত হয়, কেবলমাত্র সেই বিলগুলি অর্থ বিল বলিয়া গণ্য হয়, যথা, কোন কর স্থাপন, বিলোপ, পরিবর্তন বা নিয়ন্ত্রণ, ঋণ গ্রহণ, আথিক দায়িত্ব সম্পর্কিত কোন আইনের সংশোধন, সঞ্চিত অথবা আকস্মিক ব্যয় তহবিলে অর্থ জমা দেওয়া বা উঠাইয়া লওয়া ইত্যাদি।

রাষ্ট্রপতির ন্যায় রাজ্যপাল প্রত্যেক আর্থিক বৎসরের আয়-ব্যয়-সংক্রান্ত একটি বিবরণী আইনসভায় উপস্থিত করাইবেন। ব্যয়-বরাদ্দগুলি কেন্দ্রীয় ব্যয়-বরাদ্দগুলির অনুরূপভাবে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যথা—সঞ্চিত তহবিলের উপর ধার্য ব্যয় এবং অন্যান্য। প্রথমোক্ত ব্যয়গুলি আইনসভার বাৎসরিক অনুমোদন সাপেক্ষ নহে, তবে এগুলি সম্পর্কে আইনসভায় আলোচনা চলিতে পারে। রাজ্যপালের বেতন ও অন্যান্য রাহা খরচ, স্পীকার ও সহ-স্পীকারের বাবদ খরচ, উচ্চ বিচারালয়ের বিচারপতিগণের বেতন, ঋণ-পরিশোধ প্রভৃতি এই ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত। অন্যান্য ব্যয়-বরাদ্দগুলি লইয়া আলোচনা চলে এবং ভোট গ্রহণ করা হয়। অবশ্য রাজ্যপালের সুপারিশ ব্যতীত এই ব্যয়-বরাদ্দের প্রস্তাব কেহই করিতে পারে না। ইহার পর অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাবগুলি কেন্দ্রে অনুসৃত পদ্ধতির অনুরূপভাবে পরিচালিত হয়। কেন্দ্রের অনুরূপভাবে, রাজ্যপালও অতিরিক্ত ব্যয় ও অন্যান্য ব্যয়ের প্রস্তাব অনুমোদন করিতে পারেন।

মন্ত্রিপরিষদের সহিত আইনসভার সম্পর্ক (Relation of the Ministers to the State Legislature)

আইনসভার সহিত মন্ত্রিপরিষদ অধিকতর নিকট সম্পর্কযুক্ত। প্রত্যেক মন্ত্রিকেই আইনসভার সদস্য হইতে হইবে। কার্যতঃ মন্ত্রিপরিষদ হইল আইন-সভার একটি প্রধান কার্যকরী সংস্থা। মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণ আইনসভায় উপস্থিত থাকিয়া ইহার কার্যে অংশ গ্রহণ করেন। মন্ত্রিগণ আইনের খসড়া উত্থাপন করেন, আয়-ব্যয়ের হিসাব (Budget) প্রস্তুত করেন এবং শাসন-নীতি নির্ধারণ করেন। কিন্তু তাহাদের প্রত্যেক কার্যের জন্য তাহারা আইন-সভার নিকট দায়ী। আইনসভার সদস্যগণ শাসন সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করিলে মন্ত্রিগণের জবাব দিতে হয়। মন্ত্রিগণের কার্য যদি আইনসভার নিকট অবাঞ্ছিত বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলে আইনসভা অনাস্থাসূচক প্রস্তাব পাস করিয়া মন্ত্রিগণকে পদচ্যুত করিতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে মন্ত্রিসভাও আইনসভা ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য রাজ্যপালকে অনুরোধ করিতে পারে। আইনসভা ভাঙ্গিয়া দিলে পরবর্তী নির্বাচনের ফলাফলের উপর মন্ত্রিসভার স্থায়িত্ব নির্ভর করে।

জম্মু ও কাশ্মীরের অবস্থা (Status of Jammu and Kashmir)

ভারত বিভাগের পর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত হইতে উপজাতীয় দস্যুগণ কর্তৃক

আক্রান্ত হইয়া কাশ্মীর ভারতের সহিত যুক্ত হয়। ভারত সরকার এই আক্রমণ প্রতিহত করিয়া কাশ্মীর রক্ষা করেন। পরবর্তী কালে প্রকাশ পায় যে, কাশ্মীরের প্রতি এই আক্রমণ পাকিস্তান সরকার কর্তৃক পরিচালিত হয় এবং জাতিপুঞ্জে কাশ্মীর বিরোধ লইয়া ভারত যে অভিযোগ করে, পাকিস্তান প্রকাশ্যভাবে সেই বিরোধের একটি পক্ষের স্থান গ্রহণ করিয়াছে।

কাশ্মীরের নেতাগণের সহিত দীর্ঘদিনব্যাপী আলোচনার ফলে স্থির হইয়াছে যে, প্রতিরক্ষা, যোগাযোগ ও বৈদেশিক সম্পর্ক ব্যতীতও নাগরিকত্ব, মৌলিক অধিকার, রাজ্যের শাসনকর্তৃপক্ষের পদমর্যাদা, সুপ্রিম কোর্টের এলাকা প্রভৃতি বিষয়ে ভারত সরকারের কাশ্মীরের উপর কর্তৃত্ব করিবার অধিকার থাকিবে।

জম্মু ও কাশ্মীর ভারতের একটি রাজ্য হইলেও অন্যান্য রাজ্যগুলি হইতে এই রাজ্যের কিছু পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়। শুধু জম্মু ও কাশ্মীরের ক্ষেত্রে শাসন প্রধানকে 'সদর-ই-রিয়াসৎ' বলা হয়। তিনি জম্মু ও কাশ্মীরের গণপরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত হন। এইরূপ নির্বাচিত ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি 'সদর-ই-রিয়াসৎ' বলিয়া স্বীকার করিয়া লইবেন। জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের পৃথক জাতীয় পতাকা থাকিবে, তবে ভারতীয় জাতীয় পতাকাও সমান সম্মান পাইবে। রাষ্ট্রপতির জরুরী অবস্থা ঘোষণা যদি জম্মু ও কাশ্মীরে প্রযোজ্য হয়, তাহা হইলে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিবার পূর্বে উক্ত রাজ্যের সম্মতির প্রয়োজন হইবে। ভারতীয় নাগরিকত্বের নিয়মকানুন উক্ত রাজ্যে প্রযোজ্য হইলেও তথাকার রাজ্যসরকার ঐ বিষয়ে বিশেষ নিয়মকানুন প্রবর্তন করিতে পারিবেন। ভারতের সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকারগুলি কাশ্মীর রাজ্যে প্রযোজ্য হইবে, তবে কাশ্মীর সরকার রাজ্যের নিরাপত্তা রক্ষাকল্পে এবং ভূমি সংস্কার উদ্দেশ্যে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

ভারতের সুপ্রিম কোর্ট এই রাজ্যের শেষ আপীল আদালতরূপে কাজ করিবে এবং শাসনতন্ত্রে ১৩১ ধারায় বর্ণিত বিরোধের ক্ষেত্রে এই আদালত ইহার আদিম ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে। মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত বিরোধের ক্ষেত্রেও ইহার বিচার ক্ষমতা থাকিবে।

সংক্ষিপ্তসার

রাজ্য আইনসভা—

প্রত্যেক রাজ্যে একটি করিয়া আইনসভা আছে। ১৬টি রাজ্যের মধ্যে

১০টি রাজ্যের আইনসভা দ্বি কক্ষ বিশিষ্ট। উচ্চ কক্ষ বিধান পরিষদ ও নিম্ন কক্ষ বিধান সভা নামে অভিহিত হয়। উচ্চ কক্ষের সদস্য সংখ্যা নিম্ন কক্ষের সদস্য সংখ্যার ⅓ এর অধিক এবং ৪০ এর কম হইতে পারিবে না। সদস্যগণ পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন। ইহার কিছু সদস্য রাজ্যপাল কর্তৃক মনোনীত হন।

কোন বিধান সভার সদস্য সংখ্যা ৬০ এর কম বা ৫০০ অধিক হইতে পারে না। প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার ভিত্তিতে সাধারণ ভোটদাতৃগণ কর্তৃক এই সভার সদস্যগণ নির্বাচিত হন। এই সভার কার্যকাল পাঁচ বৎসর—তবে জরুরী অবস্থা ঘোষণা কালে ইহার কার্যকাল রাষ্ট্রপতি এক বৎসর বৃদ্ধি করিতে পারেন, অপর পক্ষে কার্যকাল শেষ হইবার পূর্বেও এই সভা ভাঙ্গিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

রাজ্য তালিকাভুক্ত ও যুগ্ম তালিকাভুক্ত বিষয়গুলির উপর রাজ্য আইন-সভাগুলি আইন প্রণয়ন করিতে পারে। তবে পার্লামেণ্টের বিশেষ ক্ষমতার দ্বারা রাজ্য আইনসভাগুলির আইন প্রণয়ন ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে। কোন আইন পাশ করিতে হইলে উভয় কক্ষের ক্ষেত্রে উভয়েরই সম্মতি প্রয়োজন। তবে উচ্চ কক্ষের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাবে উচ্চ কক্ষের কোন ক্ষমতা নাই বলিলেও চলে। প্রত্যেক প্রস্তাব আইনে পরিণত হইতে হইলে রাজ্যপালের সম্মতি প্রয়োজন। রাজ্যপাল সম্মতি না দিলে রাজ্য আইনসভা দ্বিতীয়বার এই প্রস্তাব পাশ করিলে রাজ্যপালকে সম্মতি দিতেই হইবে। রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য কোন প্রস্তাব স্থগিত রাখিতে পারেন।

রাজ্য মন্ত্রিপরিষদ আইনসভার নিকট ইহার নীতি ও কার্যের জন্য দায়ী।

জম্মু ও কাশ্মীরের অবস্থা—

জম্মু ও কাশ্মীর ভারতের একটি রাজ্য হইলেও অন্যান্য রাজ্যগুলি হইতে এই রাজ্যের কিছু পার্থক্য দেখা যায়। শুধু জম্মু ও কাশ্মীরের ক্ষেত্রে শাসক-প্রধানকে 'সদর-ই-রিয়াসত' বলা হয়। তিনি জম্মু ও কাশ্মীরের গণপরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত হন। এইরূপ নির্বাচিত ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি 'সদর-ই-রিয়াসৎ' বলিয়া স্বীকার করিয়া লইবেন। জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের পৃথক জাতীয় পতাকা থাকিবে, তবে ভারতীয় জাতীয় পতাকাও সমান সম্মান পাইবে। রাষ্ট্রপতির জরুরী ঘোষণা যদি জম্মু ও কাশ্মীরে প্রযোজ্য হয়, তাহা হইলে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিবার পূর্বে উক্ত রাজ্যের সম্মতির প্রয়োজন হইবে। ভারতীয় নাগরিকত্বের নিয়ম-

কানুন উক্ত রাজ্যে প্রযোজ্য হইলেও সেখানকার রাজ্যসরকার ঐ বিষয়ে নিয়ম-কানুন প্রবর্তন করিতে পারিবেন।

প্রশ্নাবলী

1. Describe the composition and functions of the Legislative Council in West Bengal. Is it necessary to maintain a second chamber in the States of the Indian Union ?

2. Examine the case for and against Bi-Cameralism in Indian States. Mention in this connection the States in which there are no second chambers and point out the constitutional provision for the abolition of the Bi-Cameralism in a State.

3. Discuss the procedure for passing Money Bills in the State Legislatures of India.

———

দ্বাদশ অধ্যায়

কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এবং তপশীলিভুক্ত ও উপজাতীয় এলাকার শাসনব্যবস্থা

(Administration of Union Territories and Scheduled and Tribal Areas)

কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল (Union Territories)

১৯৫৬ সালের রাজ্য পুনর্গঠন আইন, ১৯৫৬ সালের শাসনতান্ত্রিক সপ্তম সংশোধন আইন, ১৯৬০ সালের দশম সংশোধন আইন, ১৯৬২ সালের দ্বাদশ সংশোধন আইন ও ১৯৬২ সালের চতুর্দশ সংশোধন আইন দ্বারা ভারতে নয়টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল (Union territory) গঠিত হয়—যথা, ১। দিল্লী, ২। হিমাচল প্রদেশ, ৩। মণিপুর, ৪। ত্রিপুরা, ৫। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, ৬। লাক্ষা, মিনিকয় ও আমিনদিভ দ্বীপপুঞ্জ, ৭। দাদ্রা ও নগর হেভেলি, ৮। গোয়া, দমন ও দিউ, ৯। পণ্ডিচেরি, ইয়েনান্ ও মাহে।

সাধারণভাবে বলিতে গেলে সকল কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলই সম-পর্যায়ভুক্ত। কিন্তু শাসনতান্ত্রিক বিধান ও পার্লামেণ্ট কর্তৃক প্রণীত আইন অনুযায়ী এই কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির শাসনব্যবস্থায় কিছু পার্থক্য দেখা যায়।

সাধারণতঃ, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির শাসনভার রাষ্ট্রপতির হস্তে ন্যস্ত। তিনি ইচ্ছা করিলে এই শাসনভার অন্য একজন শাসক নিযুক্ত করিয়া তাঁহার হস্তে ন্যস্ত করিতে পারেন। হিমাচল প্রদেশ ব্যতীত অন্য সকল অঞ্চলের শাসককে চীফ কমিশনার বলা হয়। হিমাচল প্রদেশের শাসক ডেপুটি গভর্ণর নামে অভিহিত হন। চীফ কমিশনার বা ডেপুটি গভর্ণর নিযুক্ত না করিয়া রাষ্ট্রপতি সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় অঞ্চলের নিকটবর্তী কোন রাজ্যের রাজ্যপালের হস্তেও সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের শাসনভার অর্পণ করিতে পারেন। কেন্দ্রীয় অঞ্চলের শাসন পরিচালনা ব্যাপারে রাজ্যপাল রাজ্যমন্ত্রিসভা-নিরপেক্ষভাবে অর্থাৎ মন্ত্রিসভার পরামর্শ গ্রহণ না করিয়া শাসন পরিচালনা করিতে পারেন।

১৯৬২ সালের শাসনতান্ত্রিক চতুর্দশ সংশোধন আইনের বলে পার্লামেণ্ট সভা হিমাচল প্রদেশ, মণিপুর, ত্রিপুরা, গোয়া, দমন, দিউ ও পণ্ডিচেরী—এই পাঁচটি কেন্দ্র-

শাসিত অঞ্চলের প্রত্যেকটির জন্য একটি আইনসভা অথবা মন্ত্রিসভা কিম্বা উভয়ই গঠন করিতে পারিবে। ১৯৬৩ সালে কেন্দ্রীয় অঞ্চল আইনের দ্বারা (Union Territories Act, 1963) এই পাঁচটি অঞ্চলের জন্য পাঁচটি মন্ত্রিসভা ও পাঁচটি আইনসভা গঠন করা হইয়াছে। এই সভাগুলি অঞ্চলগুলির শাসককে পরামর্শ দান করে। অঞ্চলগুলির উপর রাজ্যতালিকাভুক্ত যে-কোন বিষয় সম্পর্কে পার্লামেণ্ট সভার আইন প্রণয়ন করিবার অবাধ ক্ষমতা আছে। আন্দামান ও লাকাডিভ দ্বীপপুঞ্জদ্বয়ের শান্তি-শৃঙ্খলা ও সুশাসনের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপতি এই দুইটি অঞ্চলে বিশেষ বিধি প্রবর্তন করিতে পারেন।

কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের জন্য বিশেষ বিচার-ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। পার্লামেণ্ট আইন প্রণয়ন করিয়া যে-কোন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের জন্য উচ্চ বিচারালয় (High Court) গঠন করিতে পারে অথবা পূর্ব অবস্থিত কোন বিচারালয়কে উচ্চ বিচারালয়ের মর্যাদা দান করিতে পারে। পার্লামেণ্ট এরূপ আইন না করা পর্যন্ত পূর্ব ব্যবস্থা বলবৎ থাকিবে, যথা, দিল্লী অঞ্চল পাঞ্জাব উচ্চ বিচারালয়ের অধীন থাকিবে। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ কলিকাতা উচ্চ বিচারালয়ের বিচারাধীন থাকিবে। হিমাচল প্রদেশ, মণিপুর ও ত্রিপুরার জন্য ১৯৫০ সালের বিশেষ আইনে জুডিসিয়াল কমিশনারের আদালত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই আদালত-গুলি নির্ধারিত বিষয়ে উচ্চ বিচারালয়ের কাজ করিতে পারে।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলের শাসনভার রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধি হিসাবে আসামের রাজ্যপাল কর্তৃক পরিচালিত হয়। ভারতের সহিত নূতন কোন অঞ্চল যুক্ত হইলে উক্ত অঞ্চল কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিণত হয়, যথা, পণ্ডিচেরি।

তপশীলিভুক্ত ও উপজাতীয় এলাকা (Scheduled and Tribal Areas)

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ভারতে বহু অনুন্নত জাতি ও অনুন্নত এলাকা আছে। এই অনুন্নত উপজাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলি কোন রাজ্য বা কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত হইলেও এই এলাকাগুলির শাসনের জন্য শাসনতন্ত্র কর্তৃক বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। কোন এলাকাকে তপশীলিভুক্ত অথবা উপজাতীয় এলাকা বলিয়া ঘোষণা করিবার অধিকার রাষ্ট্রপতির হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে এবং এই ক্ষমতার বলে রাষ্ট্রপতি ১৯৫০ সালে তপশীলি এলাকা সম্পর্কে একটি আদেশ জারী করেন।

এই সমস্ত তপশীলিভুক্ত এলাকা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যসরকারগুলিকে নির্দেশ দান করিতে পারিবেন। এই সমস্ত এলাকায় তপশীলিভুক্ত সম্প্রদায়-গুলির উন্নয়ন ও কল্যাণের জন্য উপজাতীয় পরামর্শ সভা (Tribal Advisory Councils) গঠন করিতে হইবে এবং রাজ্যপালগণ এই পরামর্শ সভার সহিত আলোচনা করিয়া উপজাতীয় সম্প্রদায়গুলির উন্নয়নের ব্যবস্থা করিবেন। পার্লামেণ্ট সভা বা রাজ্য আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইন এই এলাকাগুলিতে বলবৎ হইবে কিনা অথবা পরিবর্তিত আকারে বলবৎ হইবে তাহা সংশ্লিষ্ট রাজ্যপালগণ স্থির করিবেন। রাষ্ট্রপতির সম্মতি অনুসারে রাজ্যপালগণ এই এলাকাগুলিতে জমির হস্তান্তর ও অর্থলগ্নী কারবার নিয়ন্ত্রণ করিতে পারেন। অবশ্য পার্লামেণ্ট আইন প্রণয়ন করিয়া উপরিউক্ত বিধিগুলির পরিবর্তন করিতে পারে। শাসনতন্ত্র বলবৎ হইবার দশ বৎসর অন্তে এই এলাকাগুলির শাসন সম্পর্কে বিবরণী দিবার জন্য পার্লামেণ্ট কমিশন গঠন করিবে এবং এই বিধান অনুসারে ১৯৬০ সালে একটি কমিশন গঠিত হয় এবং ১৯৬১ সালে কমিশন ইহার সিদ্ধান্ত রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করে।

আসামের উপজাতীয় এলাকাগুলির জন্য বিশেষ শাসনব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই এলাকাগুলিকে ক ও খ এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে। ক শ্রেণীতে খাসিয়া ও জয়ন্তীয়া পার্বত্য অঞ্চল, মিকির পার্বত্য অঞ্চল প্রভৃতি পাঁচটি এলাকা আছে ও খ শ্রেণী উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চল, মিশমি পার্বত্য অঞ্চল প্রভৃতি চারিটি অঞ্চল লইয়া গঠিত।

ক শ্রেণীর অঞ্চলগুলি স্বাধীন অঞ্চল হইলেও আসামের রাজ্যপালের শাসনাধীনে পরিচালিত হয়। এই অঞ্চলগুলিতে আঞ্চলিক ও জিলা পরিষদ (Regional and District Councils) গঠনের ব্যবস্থা হইয়াছে। এই পরিষদগুলি বিবাহ, সম্পত্তি উত্তরাধিকার, অসংরক্ষিত বন প্রভৃতি সম্পর্কে আইন প্রণয়ন করিতে পারে। এই পরিষদ কতিপয় ক্ষেত্রে কর স্থাপন ও কর আদায় করিতে পারে এবং ছোটখাট মামলার বিচার করিতে পারে। পরিষদ কর্তৃক প্রণীত আইন অবশ্য আসামের রাজ্যপালের সম্মতি সাপেক্ষ। রাজ্যপাল বিশেষ নির্দেশ না দিলে, পার্লামেণ্ট ও রাজ্য আইনসভা প্রণীত আইন এই এলাকাগুলিতে প্রযুক্ত হইতে পারে।

আসামের রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধি হিসাবে খ শ্রেণীর এলাকাগুলির শাসনকার্য পরিচালনা করিবেন। রাষ্ট্রপতিও এই এলাকাগুলির জন্য বিশেষ নিয়ম

প্রবর্তন করিতে পারিবেন। রাষ্ট্রপতির পূর্ব সম্মতি লইয়া রাজ্যপাল খ শ্রেণীভুক্ত কোন এলাকায় সমগ্রভাবে অথবা আংশিকভাবে ক শ্রেণীর অনুরূপ শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে পারেন। এরূপ ক্ষেত্রে অবশ্য তাঁহাকে মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুসারে শাসনকার্য পরিচালনা করিতে হইবে।

সংক্ষিপ্তসার

কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল

কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের জন্য কোনরূপ গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয় নাই। এই অঞ্চলগুলি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত শাসনকর্তা দ্বারা শাসিত হইবে এবং এই অঞ্চলগুলির জন্য একমাত্র পার্লামেণ্ট সভা আইন প্রণয়ন করিতে পারিবে। ১৯৫৬ সালের শেষভাগে একটি নূতন আইন পাস করিয়া হিমাচল প্রদেশ, মণিপুর, ত্রিপুরা এই তিনটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের জন্য স্থানীয় সভা গঠন করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সার্বজনীন ভোটাধিকার ভিত্তিতে জনগণ দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধি লইয়া এই সভাগুলি গঠিত হইবে। হিমাচল অঞ্চলের সভা ৪১ জন সদস্য লইয়া গঠিত হইবে এবং ইহার মধ্যে বারটি আসন তপশীলী শ্রেণীর জন্য সংরক্ষিত থাকিবে। মণিপুর ও ত্রিপুরার স্থানীয় সভাগুলিতে ৩০ জন সদস্য থাকিবে। কেন্দ্রীয় সরকার এই সভাগুলিতে ৪ জন পর্যন্ত সদস্য মনোনীত করিতে পারিবেন। এই সভাগুলি স্থানীয় সমস্যা সম্পর্কে ব্যবস্থা করিতে পারিবে। স্থানীয় সমস্যা সমাধান করিবার উদ্দেশ্যে দিল্লীতে একটি কর্পোরেশন গঠন করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। রাজ্য পুনর্গঠনের ফলে বিভিন্ন রাজ্যের আইনসভার গঠনে ও কেন্দ্রীয় আইনসভায় এই রাজ্যগুলি প্রতিনিধিত্বের বিষয় যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা ও রাজ্য আইনসভার অধ্যায়গুলিতে আলোচনা করা হইয়াছে।

তপশীলিভুক্ত ও উপজাতীয় এলাকা

এই সমস্ত এলাকার শাসন ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারগুলিকে নির্দেশ দান করিতে পারিবেন। এই সম্প্রদায়গুলির উন্নয়নের জন্য উপজাতীয় পরামর্শ সভা গঠন করিতে হইবে এবং রাজ্যপালগণ এই সভার সহিত আলোচনা করিয়া উপজাতীয় সম্প্রদায়গুলির উন্নতির ব্যবস্থা করিবেন।

আসামের উপজাতীয় এলাকাগুলির জন্য বিশেষ শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইয়াছে। এই এলাকাগুলিকে ক ও খ শ্রেণীতে ভাগ করিয়া প্রথম শ্রেণী আঞ্চলিক ও জিলা পরিষদ গঠন করিয়া ইহাদের হাতে স্থানীয় শাসন ব্যাপারে কিছু দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর এলাকাগুলি রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধি হিসাবে আসামের রাজ্যপাল কর্তৃক পরিচালিত হয়।

প্রশ্নাবলী

1. What are the "Union Territories"? Enumerate them and give a brief account of the legislative and executive systems existing in such territories.

2 Enumerate the special provisions of the Indian Constitution regarding the administration of (a) scheduled areas and (b) tribal areas.



ত্রয়োদশ অধ্যায়

রাজ্যের বিচার-ব্যবস্থা

(State Judiciary)

প্রত্যেক রাজ্যে একটি করিয়া উচ্চ আদালত (হাইকোর্ট) আছে। এই আদালত দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয়বিধ মামলার বিচার করে। অন্যান্য নিম্ন বিচারালয়গুলি ফৌজদারী ও দেওয়ানী এই দুই ভাগে বিভক্ত। গুরুতর ফৌজদারী মামলাগুলি জুরীর সাহায্যে বিচার করা হয়। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ ধরনের আদালত গঠিত হয়। ইহা ছাড়া, শ্রমিক-মালিক বিরোধ প্রভৃতির নিষ্পত্তির জন্য বিশেষ আদালত আছে। আইনের চক্ষে সব নাগরিকই সমান। নিম্নে আদালতগুলির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল।

দেওয়ানী আদালত (Civil Courts)

(১) গ্রামের পঞ্চায়েৎ আদালতই হইল দেওয়ানী সর্বনিম্ন আদালত। এখানে ছোট-খাট মামলার বিচার হয়। ইহার উপর হইল (২) মনসেফের আদালত। প্রত্যেক চৌকি, মহকুমা ও জেলার সদরে মনসেফী আদালত থাকে। মনসেফগণ সরকার কর্তৃক যোগ্যতার ভিত্তিতে নিযুক্ত কর্মচারী। সাধারণতঃ ইহারা দুই হাজার বা বিশেষ ক্ষেত্রে তিন হাজার টাকা সম্পর্কিত দেওয়ানী মামলা পরিচালনা করিতে পারেন। ইহার উপর হইল (৩) জেলা জজের (District Judge) আদালত। তিনিই হইলেন জেলার দেওয়ানী মামলা-সংক্রান্ত সর্বোচ্চ বিচারক। জেলা জজ তাঁহার সহকারী সাবজজের সাহায্যে বিচারকার্য পরিচালনা করেন। মুনসেফের আদালত হইতে জেলা জজের আদালতে আপীল করা যায় এবং যে সমস্ত মামলার বিষয় দুই হাজার টাকার অধিক তাহাদের সরাসরি প্রথমেই জেলা জজ বা সাবজজের আদালতে শুনানী হয়। জেলা জজের রায়ের বিরুদ্ধে রাজ্যের (৪) উচ্চ আদালতে আপীল করা যায়। কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ শহরে দেওয়ানী মামলার জন্য ছোট আদালত (Small Causes Court) আছে। দেওয়ানী মামলার দাবীর পরিমাণ ২০ হাজার টাকার বেশী হইলে উচ্চ আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে (৫) সুপ্রিম কোর্টে আপীল করা যায়।

ফৌজদারী আদালত (Criminal Courts)

ফৌজদারী মামলার জন্য সর্বনিম্ন আদালত হইল (১) গ্রাম পঞ্চায়েৎ আদালত। পঞ্চায়েতী আদালত ছোট-খাট মামলার বিচার করে ও অল্পপরিমাণ জরিমানা করিতে পারে। অপেক্ষাকৃত গুরুতর অপরাধের জন্য প্রত্যেক মহকুমা ও জেলা-সদরে (২) প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর বিচারক (Magistrate) থাকে। খুন, গৃহদাহ প্রভৃতি গুরুতর অপরাধের বিচার সর্বোপরি (৩) জেলার দায়রা জজের (Sessions Judge) আদালতে হয়। প্রত্যেক জেলায় একজন দায়রা জজ থাকেন। ইনি জেলা জজ ও দায়রা জজ উভয়রূপেই কাজ করেন। দায়রা জজ ও তাঁহার সহকারী দায়রা জজের (Assistant Sessions Judge) সাহায্যে ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্ট হইতে আনীত গুরুতর ফৌজদারী মামলার বিচার করেন। সাধারণ ম্যাজিস্ট্রেটগণ গুরুতর ফৌজদারী মামলার বিবরণ শুনিয়া এই মামলাগুলি দায়রা আদালতে সোপর্দ করেন, কারণ, তাঁহাদের এই মামলাগুলি বিচার করিবার ক্ষমতা নাই। দায়রা জজ অপরাধীকে প্রাণদণ্ড দিতে পারেন, কিন্তু এই দণ্ডাদেশ উচ্চ আদালত কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া চাই। দায়রা জজ নিম্ন আদালতগুলি হইতে আনীত আপীলগুলিরও বিচার করেন। গুরুতর মামলার বিচারকালে দায়রা জজকে জুরীর সাহায্য লইতে হয়। জুরীগণ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দোষী বা নির্দোষ সাব্যস্ত করেন, কিন্তু দণ্ড সম্বন্ধে তাঁহাদের কোন হাত নাই। জজ ও জুরীগণের মধ্যে মতভেদ ঘটিলে এই মামলা উচ্চ আদালতে পাঠাইতে হয় এবং বিশেষ ক্ষেত্রে জজ পুনঃ জুরী নিযুক্ত করিয়া মামলার পুনর্বিচার করিতে পারেন। দায়রা আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে (৪) উচ্চ আদালতে আপীল করা যায়। উচ্চ আদালত হইতে মাত্র নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে (৫) সুপ্রিম কোর্টে আপীল করা যায়।

কলিকাতা প্রভৃতি বড় শহরে ফৌজদারী মামলার জন্য প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত আছে। ইহা ছাড়া, কলিকাতা প্রভৃতি বড় বড় শহরে নগর আদালত (City Court) সৃষ্টি হইয়াছে।

উচ্চ আদালত (The High Court)

শাসনতন্ত্রের ২১৪ নং ধারায় বলা হইয়াছে যে, প্রত্যেক রাজ্যে একটি উচ্চ আদালত থাকিবে, কিন্তু পার্লামেণ্ট ইচ্ছা করিলে একাধিক রাজ্যের জন্য একটিমাত্র উচ্চ আদালত প্রতিষ্ঠা করিতে পারে। এইরূপে আসাম ও

নাগাভূমির জন্য একটিমাত্র আদালত প্রতিষ্ঠিত আছে। উচ্চ আদালতই হইল রাজ্যের বিচার-ব্যবস্থার উচ্চতম প্রতিষ্ঠান।

প্রত্যেক উচ্চ আদালত একজন প্রধান বিচারপতি (Chief Justice) সহ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যক বিচারপতি লইয়া গঠিত হয়। অসমাপ্ত কার্য শেষ করিবার জন্য রাষ্ট্রপতি দুই বৎসরের জন্য অতিরিক্ত বিচারপতি (Additional Judge) নিয়োগ করিতে পারেন। কোন বিচারপতির সাময়িক অনুপস্থিতির কালে রাষ্ট্রপতি অস্থায়ী বিচারপতি নিয়োগ করিতে পারেন। এই উভয় শ্রেণীর বিচারপতিগণ ৬২ বৎসর পর্যন্ত কার্যে নিযুক্ত থাকিতে পারেন।

বিচারপতি নিয়োগ ব্যাপারে রাষ্ট্রপতি সাধারণতঃ ভারতের প্রধান বিচারপতি, সংশ্লিষ্ট রাজ্যপাল ও সংশ্লিষ্ট উচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতির সহিত পরামর্শ করিয়া নিয়োগ করেন।

বিচারপতিগণ মাসিক ৩,৫০০্ টাকা এবং প্রধান বিচারপতি ৪,০০০্ টাকা বেতন পান। বিচারপতিগণের অবসরকালীন ভাতা ও পেন্সন পার্লামেণ্ট কর্তৃক নির্ধারিত হয়। বিচারপতি নিযুক্ত হইবার পর পার্লামেণ্ট বিচারপতিগণের অসুবিধা সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদের বেতন ও কার্যের আনুষংগিক সুবিধার পরিবর্তন করিতে পারে না।

উচ্চ আদালতের বিচারপতির যোগ্যতা হইল যে, তাঁহাকে অনধিক ষাট বৎসর বয়স্ক ভারতীয় নাগরিক হইতে হইবে। ভারতের যে-কোন অংশে তাঁহাকে বিচারপতির কার্য করিতে হইয়াছে কিংবা এক বা একাধিক উচ্চ বিচারালয়ে তিনি ব্যবহারজীবী হিসাবে কার্য করিয়াছেন।

কার্য ও ক্ষমতা (Powers and Functions)

প্রত্যেক উচ্চ আদালতের এলাকা সেই রাজ্যের এলাকার সমান। আবার অনেক ক্ষেত্রে একই উচ্চ আদালতের এলাকা একাধিক রাজ্যের উপর বিস্তৃত হইতে পারে এবং কতিপয় ক্ষেত্রে রাজ্যের এলাকা বহির্ভূত কেন্দ্রীয়শাসন অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত হইতে পারে। কলিকাতা উচ্চ বিচারালয়ের এলাকা রাজ্যসীমা অতিক্রম করিয়া আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত প্রসারিত।

আদিম ক্ষমতা (Original jurisdiction)

পূর্বে বোম্বাই, মাদ্রাজ ও কলিকাতা এই তিনটি প্রেসিডেন্সি শহরের উচ্চ

বিচারালয়ের আদিম ফৌজদারী ক্ষমতা ছিল অর্থাৎ এই তিনটি শহরের এলাকায় অনুষ্ঠিত গুরুতর ফৌজদারী মামলার প্রথম বিচার এই আদালতগুলিতে অনুষ্ঠিত হইত। বড বড দেওয়ানী মামলার বিচারও এই আদালত প্রথম বিচারালয় হিসাবে পরিচালিত করিত। কিন্তু এই তিনটি শহরে নগর আদালত (City Court—Civil and Criminal) প্রতিষ্টার সঙ্গে সঙ্গে বোম্বাই ও মাদ্রাজ উচ্চ বিচারালযের ফৌজদারী মামলার প্রথম বিচারালয় হিসাবে কাজ করিবার কর্তব্য অর্থাৎ আদিম ক্ষমতা লোপ করা হইয়াছে। দেওয়ানী মামলার ক্ষেত্রে আদিম ক্ষমতা অতি স্বল্প পরিমাণে আছে। কিন্তু নগর আদালত প্রতিষ্টার পরেও কলিকাতা উচ্চ বিচারালয়ের ফৌজদারী ও দেওয়ানী উভয় বিষয়ে আদিম ক্ষমতা কিছু সংকুচিত হইলেও একেবারে বিলোপ করা হয় নাই।

আপীল ক্ষমতা (Appellate Jurisdiction)

উচ্চ বিচারালয়ের ফৌজদারী ও দেওয়ানী উভয়বিধ মামলার আপীল শুনিবার ক্ষমতা আছে। ফৌজদারী মামলার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত আদালত-গুলি হইতে আনীত আপীল মামলার বিচার করিতে পারে :—(১) দায়রাজজ, অতিরিক্ত বা সহকারী দায়রাজজ, (২) প্রেসিডেন্সী বা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, (৩) উচ্চ আদালতের আদিম ক্ষমতার বিরুদ্ধেও আপীল শুনিতে পারে।

দেওয়ানী বিষয়-সংক্রান্ত মামলায় উচ্চ আদালত প্রথম ও দ্বিতীয় আপীল বিচারালয় হিসাবে কাজ করে। প্রথম আপীল আদালত হিসাবে এই বিচারালয় আইন ও তথ্য উভয় বিষয়ে বিচার করিতে পারে কিন্তু দ্বিতীয় আপীল আদালত হিসাবে শুধু আইন সংক্রান্ত বিষয়ের বিচার করে। ইহা ছাড়া বোম্বাই, মাদ্রাজ, কলিকাতা, এলাহাবাদ, পাটনা প্রভৃতি উচ্চ বিচারালয়গুলি বিশেষ ক্ষমতা বলে উচ্চ আদালতের একজন মাত্র বিচারপতি কর্তৃক বিচার করা মামলার আপীল শুনিতে পারে।

ইহা ছাড়া, একমাত্র সামরিক বিচারালয়গুলি ব্যতীত অন্যান্য বিচারালয়-গুলির উপর তদারক করিবার বিস্তৃত ক্ষমতা উচ্চ বিচারালয়ের আছে। রাজ্যের সাধারণ বিচারালয়গুলি ব্যতীত বাড়ী ভাড়া নিয়ন্ত্রণ আদালত, উদ্বাস্তু-সম্পত্তির রক্ষক প্রভৃতি আধা-বিচারালয়গুলির উপরেও উচ্চ আদালতের নিয়ন্ত্রণ

ক্ষমতা আছে। কোন ক্ষেত্রে ব্যক্তি বিশেষের মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হইলে বা ক্ষুণ্ণ হইবার সম্ভাবনা থাকিলে এই বিচারালয় নানা আদেশ ও নির্দেশ জারী করিয়া মৌলিক অধিকার রক্ষা করিতে পারে।

রাজ্যের মধ্যে অবস্থিত নিম্ন আদালতগুলির উপরও এই বিচারালয়ের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা আছে। জেলাজজের নিয়োগ, পদোন্নতি প্রভৃতি ব্যাপারে রাজ্যপাল এই বিচারালয়ের সহিত পরামর্শ করেন। জেলা আদালত ও অন্যান্য নিম্ন আদালতগুলির নিয়োগ, পদোন্নতি, ছুটি প্রদান প্রভৃতি এই বিচারালয়ের ক্ষমতাভুক্ত বিষয়।

উচ্চ আদালতের বিচারপতিগণ ৬২ বৎসর পর্যন্ত কাজ করিতে পারেন। তাঁহারা লিখিতভাবে রাষ্ট্রপতির নিকট পদত্যাগপত্র পেশ করিতে পারেন। অকর্মণ্যতা বা অসদাচারের হেতু পার্লামেণ্ট সভার উভয় কক্ষের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের অভিযোগে রাষ্ট্রপতি কোন বিচারপতিকে পদমুক্ত করিতে পারেন।

বিচার-ব্যবস্থার স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতার উপরই সু-শাসনব্যবস্থা অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। উচ্চ বিচারালয়ের বিচারপতিগণ যাহাতে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে বিচারকার্য পরিচালনা করিতে পারেন সেজন্য তাঁহাদের কার্যের স্থায়িত্ব সংবিধান কর্তৃক দৃঢ়ভাবে সংরক্ষিত হইয়াছে। তাঁহাদের বেতনাদিও পার্লামেণ্টের বাৎসরিক অনুমোদন সাপেক্ষ নহে। নিয়োগের পর বিচারপতিগণের বেতন, ভাতা বা অন্যান্য অধিকারগুলির পরিবর্তন পার্লামেণ্ট করিতে পারে না। অবসর গ্রহণ করিবার পর কোন বিচারপতি সংশ্লিষ্ট উচ্চ বিচারালয়ে আর ব্যবহারজীবীর কাজ করিতে পারিবেন না।

পার্শ্ববর্তী রাজ্যের উচ্চ বিচারালয়গুলি সাধারণতঃ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের আপীল আদালতের কাজ করিয়া থাকে। এইরূপ দিল্লী অঞ্চলের আপীল আদালত হইল পাঞ্জাব উচ্চ বিচারালয়, এবং কলিকাতা উচ্চ বিচারালয় আন্দামান ও নিকোবর অঞ্চলের আপীল শুনিয়া থাকে। কেবলমাত্র হিমাচল প্রদেশ, মণিপুর ও ত্রিপুরা অঞ্চলের জন্য তিনটি জুডিশিয়াল কমিশনারের আদালত আছে। এই আদালতগুলি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে উক্ত অঞ্চলগুলির উচ্চ বিচারালয়ের কার্য সম্পাদন করে এবং আদালতগুলির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আপীল করা যায়।

ভারতে বিচারবিভাগের স্বাধীনতা (Independence of the Judiciary in India)

গণতন্ত্রে শাসনব্যবস্থার সকল বিভাগের উপরই জনগণের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থাকে। এরূপ অবস্থায় বিচারবিভাগের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা সম্ভবও নহে, কাম্যও নহে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও বলিতে হইবে যে, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় বিচার-বিভাগের স্বাধীনতা এরূপ অপরিহার্য যে, এই স্বাধীনতা ব্যতীত ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইয়া গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রহসনে পর্যবসিত হয়। বিচারবিভাগের স্বাধীনতার অর্থ হইল যে, বিচারকগণ নিরপেক্ষভাবে আইন প্রয়োগ করিয়া যাহাতে দোষী ও নির্দোষ স্থির করিয়া অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে শাস্তি বিধান করিতে পারেন। সেজন্য বিচারকগণ জনমত, শাসন কর্তৃপক্ষ বা আইনসভা-নিরপেক্ষ হইবেন। বিচারপতিগণ যদি ভয় বা অনুগ্রহের জন্য কাহারও মুখাপেক্ষী হন, তাহা হইলে এরূপ বিচারপতির দ্বারা ন্যায় বিচার সম্ভব নহে। যে শাসনব্যবস্থায় ন্যায় বিচার সম্ভব নহে, সে শাসনব্যবস্থাকে কোন মতেই গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বলা যাইতে পারে না।

তিনটি উপায়ে বিচারবিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা সৃষ্টি করা হয়। প্রথমতঃ, বিচারপতিগণের স্বাধীনতা তাঁহাদের নিয়োগ পদ্ধতির উপর নির্ভর করে। নিয়োগ পদ্ধতি এরূপ হইবে যে, একবার বিচারক নিযুক্ত হইলে তাঁহাদের স্বাধীন মতের জন্য যেন কোন কর্তৃপক্ষই তাঁহাদের পদচ্যুত করিতে না পারে। দ্বিতীয়তঃ, কার্যকালের স্থায়িত্বের উপরও তাঁহাদের স্বাধীনতা নির্ভর করে। এইজন্য অন্যায় ও দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত অন্য কোন কারণে তাঁহাদের অপসারিত হইবার ভয় না থাকিলে তাঁহারা নির্ভীক ও নিরপেক্ষ-ভাবে তাঁহাদের গুরু দায়িত্ব পালনে সক্ষম হন। তৃতীয়তঃ, তাঁহারা যাহাতে কোন প্রলোভনের দ্বারা আকৃষ্ট না হন, সেজন্য তাঁহাদের উপযুক্ত পরিমাণ বেতন দেওয়া উচিত এবং কার্যকালে তাঁহাদের বেতন পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধি না করা উচিত। এখন দেখা যাউক, ভারতে উপরি-উক্ত উপায়গুলির সাহায্যে বিচারবিভাগকে কতদূর স্বাধীন ও নিরপেক্ষ করা হইয়াছে।

ভারতে বিচারপতিগণের নিয়োগ পদ্ধতি বহুলাংশে বৃটিশ ও মার্কিণ ব্যবস্থার অনুরূপ। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। কিন্তু এরূপ নিয়োগ ব্যাপারে রাষ্ট্রপতিকে সুপ্রিম কোর্টের ও রাজ্যের উচ্চ বিচারালয়ের কিছু সংখ্যক বিচারপতিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া নিয়োগ

করিতে হয়। প্রধান বিচারপতি ব্যতীত অন্য বিচারপতি নিয়োগ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিকে অবশ্যই ভারতের প্রধান বিচারপতির সহিত পরামর্শ করা বাধ্যতামূলক। রাজ্যের উচ্চ বিচারালয়ের বিচারপতিগণের নিয়োগ ক্ষেত্রেও তাঁহাকে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের রাজ্যপাল, প্রধান বিচারপতি প্রভৃতির সহিত পরামর্শ করিতে হয়।

ইংলণ্ড, মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে বিচারপতিগণ যতদিন সদাচারী থাকেন ততদিন পর্যন্ত কার্যে বহাল থাকেন। ভারতে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিগণ ৬৫ বৎসর ও উচ্চ বিচারালয়ের বিচারপতিগণ ৬২ বৎসর পর্যন্ত কার্যে নিযুক্ত থাকিতে পারেন। বিচারপতিগণের এরূপ ঊর্ধ্ব বয়ঃসীমা নির্ধারণ করিবার কারণ হইল যে, তাহারা যাহাতে দীর্ঘদিন কাজ করিয়া আইন প্রয়োগের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে পারেন।

ভারতে বিচারপতিগণের অপসারণ পদ্ধতিও সহজসাধ্য নহে। সুপ্রিম কোর্ট বা উচ্চ বিচারালয়ের কোন বিচারপতিকে একমাত্র অবধারিত অসদাচরণ বা অক্ষমতার কারণে অপসারণ করা চলে। এরূপ ক্ষেত্রে পার্লামেণ্টের প্রত্যেক কক্ষ ইহার ⅔ সংখ্যক সদস্যের উপস্থিতিতে ও সংখ্যা গরিষ্ঠের ভোটে এই অপসারণের প্রস্তাব পাস করিয়া রাষ্ট্রপতি সকাশে উপস্থাপিত করিতে হইবে এবং রাষ্ট্রপতি এই অপসারণের আদেশ জারি করিবেন।

বিচারপতিগণকে প্রলোভনের ঊর্ধ্বে রাখিবার উদ্দেশ্যে উপযুক্ত পরিমাণ বেতন দেওয়া প্রয়োজন। ভারতে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ৫,০০০ টাকা ও অন্যান্য বিচারপতিগণ ৪,০০০ টাকা বেতন পান। উচ্চ বিচারালয়ের প্রধান বিচারপতি ৪,০০০ টাকা ও অন্যান্য বিচারপতিগণ ৩,৫০০ টাকা বেতন পাইয়া থাকেন। ভারতের ন্যায় দরিদ্র দেশে বিচারপতিগণের এই বেতন যথেষ্ট বলা যাইতে পারে। তবে এস্থলে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে, যদিও অন্যান্য দেশের ব্যবস্থার ন্যায় ভারতের বিচারপতিগণের বেতন পরিমাণ তাঁহাদের কার্যকালে পরিবর্তন করা যায় না, তবুও শাসনতন্ত্রের বিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অর্থ-সংক্রান্ত জরুরী অবস্থা ঘোষণা কালে বিচারপতিগণের বেতন পরিমাণ হ্রাস করা যাইতে পারে।

ভারতে বিচারবিভাগকে স্বাধীন করিবার উদ্দেশ্যে আর একটি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। সুপ্রিম কোর্ট ও উচ্চ বিচারালয়গুলির কর্মচারীবৃন্দকে সম্পূর্ণরূপে এই বিচারালয়গুলির কর্তৃত্বাধীন করা হইয়াছে। এই কর্মচারীবৃন্দের

নিয়োগ, বেতন পরিমাণ ও কার্যের অন্যান্য শর্তাদি প্রধান বিচারপতি বা অন্য কোন বিচারপতির দ্বারা নির্ধারিত হয়। এই বিচারালয়গুলির জন্য যে ব্যয় হয়, তাহাও পার্লামেন্ট সভার বাৎসরিক অনুমোদন সাপেক্ষ নহে। এতদ্ব্যতীত আইনসভার সদস্যগণও তাহাদের বাক্‌স্বাধীনতার বলেও সুপ্রিম কোর্ট অথবা উচ্চ বিচারালয়ের কোন বিচারপতির আচরণ সম্পর্কে কোনরূপ মন্তব্য করিতে পারেন না।

ভারতে বিচারপতিগণের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা রক্ষার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইলেও এ স্থলে একটি বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন। ভারতের শাসন কর্তৃপক্ষ নিয়োগ করিতে পারিলেও বিচারপতিগণকে পদচ্যুত করিতে পারেন না। আইনসভা ইঁহাদের বেতন পরিমাণ হ্রাস করিতে না পারিলেও পার্লামেন্ট আইন প্রণয়ন করিয়া বিচারপতিগণের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারে এবং এইরূপে সংখ্যাবৃদ্ধি দ্বারা সরকারের মনোমত বিচারপতি নিয়োগ করিয়া সরকার বিচারালয়গুলিতে আপন আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন। ইহার ফলে বিচারবিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ণ হইবার সম্ভাবনা থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে একমাত্র সজাগ ও সক্রিয় জনমত এই দুর্নীতির প্রতিবিধান করিতে সক্ষম।

ভারতে বিচার-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য (Features of the Indian Judicial System)

ভারতে বিচার-ব্যবস্থার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। প্রায় দেড়-শতাব্দীকাল পর্যন্ত বৃটিশ শাসনাধীনে থাকার ফলে ভারতের বিচার-ব্যবস্থায় বৃটিশ বিচার ব্যবস্থার কতিপয় লক্ষণ দেখা যায়।

প্রথমতঃ, ভারতে আইনের চক্ষে সকল নাগরিকই সমান। সকল নাগরিকের একদফা নাগরিকত্বের অনুরূপভাবে সকলের জন্যই একই আইন ও একই বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত আছে। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ বিচারালয় গঠিত হইলেও ফরাসী দেশের মত ভারতে কোন শাসন বিভাগীয় বিচারালয় (Administrative Court) নাই। সাধারণ নাগরিক ও সরকারী কর্মচারী উভয় শ্রেণীর লোকই একই বিচারালয়ের বিচারাধীন—যদিও রাষ্ট্রপতি, উপ-রাষ্ট্রপতি বা সুপ্রীম কোর্ট এবং উচ্চ বিচারালয়ের বিচারপতিগণের বিচারের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা আছে।

দ্বিতীয়তঃ, ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হইলেও এখানকার বিচারব্যবস্থার কেন্দ্রীকরণ করা হইয়াছে। সর্বভারতের জন্য একমাত্র আপীল আদালত হইল সুপ্রিম কোর্ট। এই বিচারালয় রাজ্যগুলি হইতে আনীত ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলাগুলির আপীল শুনিয়া থাকে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থায় সুপ্রিম কোর্টের এরূপ আপীল শুনিবার ক্ষমতা নাই।

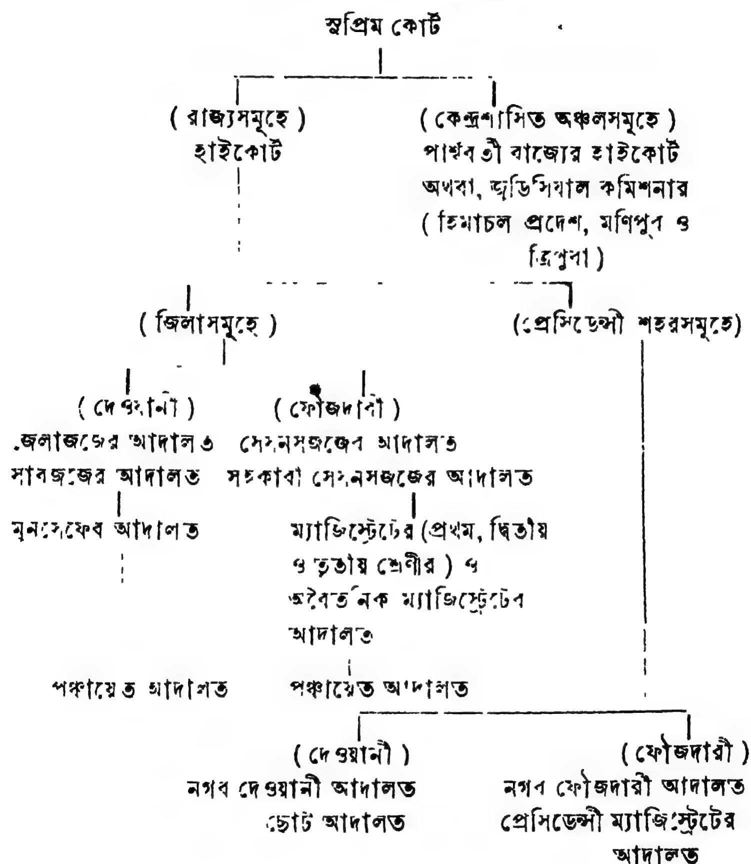
তৃতীয়তঃ, সর্বভারতের জন্য প্রায় একই ফৌজদারী ও দেওয়ানী বিধি প্রবর্তিত হইয়াছে।

চতুর্থতঃ, গুরুতর ফৌজদারী মামলা জুরীর সাহায্যে পরিচালিত হয়। জুরীগণ তথ্য সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করিতে পারিলেও আইন সম্পর্কিত বিষয়ে তাহাদের কোনরূপ ক্ষমতা নাই। বিচারপতি তথ্য সম্পর্কে জুরীর মত গ্রহণ না করিয়া অভিযোগের বিষয়টি উচ্চ বিচারালয়ে প্রেরণ করিতে পারেন। সুতরাং ভারতে সোভিয়েত বিচার-ব্যবস্থার অনুরূপভাবে কোন নাগরিক বিচারকের (Citizen Judge) স্থান ত নাই, পরন্তু জুরীগণের বিচারক্ষমতাও অতি সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ। সুতরাং এ দিক দিয়া বিচার করিলে ভারতের বিচার-ব্যবস্থাকে জনপ্রিয় বিচার-ব্যবস্থা বলা যায় না। এতদ্ব্যতীত বিচার-ব্যবস্থা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইংরেজী ভাষায় ও ইংরেজী পদ্ধতিতে পরিচালিত হয় বলিয়া অধিকাংশ বিচারপ্রার্থী বিচার-ব্যবস্থার সহিত পরিচিত হইয়া বিচার-ব্যবস্থার নিরপেক্ষতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ আস্থাবান হইতে পারে না। বিচারকের সিদ্ধান্তও ইংরেজী ভাষায় দেওয়া হয়। সুতরাং অধিকাংশ বিচারপ্রার্থী তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। কাজেই বিচার-ব্যবস্থার উদ্দেশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিফল হয়। তবে এ স্থলে একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তনের ফলে গ্রামে যে পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা প্রসারলাভ করিতেছে, সেই ব্যবস্থার সাহায্যে অন্ততঃ ছোট-খাট ব্যাপারে জনগণ দ্বারা পরিচালিত জনপ্রিয় বিচার-ব্যবস্থার প্রবর্তন হইয়াছে।

পঞ্চমতঃ, ভারতে বিচার-ব্যবস্থার আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল ইহার দীর্ঘায়িত ও ব্যয়-বহুল পদ্ধতি। একটি ছোট-খাট অভিযোগের নিষ্পত্তি হইতেও অন্ততঃ-পক্ষে ছয় মাস সময় অতিবাহিত হয়। যে সমস্ত অভিযোগ জটিল ও গুরুতর এবং আপীল-সাপেক্ষ সেগুলি নিষ্পত্তি হইতে দশ বার বৎসর সময় অতিবাহিত হয়। এই মামলাগুলি পরিচালনার ব্যয়ও এত অধিক যে, ভারতের ন্যায় দরিদ্র দেশের অধিকাংশ লোকই ন্যায় বিচার ক্রয় করিতে অসমর্থ। ভারতে বিচার-

ব্যবস্থাকে ত্বরান্বিত করা, ব্যয়-ভার বিশেষরূপে লাঘব করা এবং জনসাধারণের বোধগম্য পদ্ধতিতে পরিচালনা করা আশু প্রয়োজন।

ভারতে বিচার-ব্যবস্থা



সংক্ষিপ্তসার

বিচার-ব্যবস্থা

· গ্রামের পঞ্চায়েৎ আদালতই হইল দেওয়ানী সর্বনিম্ন আদালত। এখানে ছোট-খাট মামলার বিচার হয়। ইহার উপর হইল মুনসেফের আদালত।

প্রত্যেক চৌকী, মহকুমা ও জেলার সদরে মুনসেফী আদালত থাকে। ইহার উপর হইল জেলা জজের আদালত। ইনিই হইলেন জেলায় দেওয়ানী মামলা-সংক্রান্ত সর্বোচ্চ বিচারক। জেলা জজ তাঁহার সহকারী সব্‌জজের সাহায্যে বিচারকার্য পরিচালনা করেন। কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ সহরে দেওয়ানী মামলার জন্য ছোট আদালতও আছে।

ফৌজদারী মামলার জন্য সর্বনিম্ন আদালত হইল গ্রামের পঞ্চায়েৎ আদালত। অপেক্ষাকৃত গুরুতর অপরাধের জন্য প্রত্যেক মহকুমা ও জেলা-শহরে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট থাকেন। খুন, গৃহদাহ প্রভৃতি গুরুতর অপরাধের বিচার সরাসরি জেলার দায়রা জজের আদালতে হয়। প্রত্যেক জেলায় একজন দায়রা জজ থাকেন। গুরুতর মামলার বিচারকালে দায়রা জজকে জুরীর সাহায্য লইতে হয়।

কলিকাতা প্রভৃতি বড় বড় সহরে ফৌজদারী মামলার জন্য প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত আছে। ইহা ছাড়া, কলিকাতা প্রভৃতি বড় বড় সহরে নগর আদালত সৃষ্টি হইয়াছে।

উচ্চ আদালত

প্রত্যেক রাজ্যে একটি করিয়া উচ্চ আদালত আছে। এই আদালতই হইল রাজ্যের দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার সর্বোচ্চ আদালত। একজন প্রধান বিচারপতি ও অন্য কয়েকজন বিচারপতি লইয়া এই আদালত গঠিত হয়। রাষ্ট্রপতি সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি, রাজ্যের রাজ্যপাল ও উচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতির সহিত পরামর্শ করিয়া অন্য বিচারপতিগণকে নিযুক্ত করেন। বিচারপতিগণ ৬২ বৎসর পর্যন্ত কাজ করিতে পারেন এবং অবসর গ্রহণ করিবার পর ভারতের কোন বিচারালয়ে আইনজীবী হিসাবে কাজ করিতে পারেন না। একমাত্র অসদাচরণ ও অকর্মণ্যতাহেতু আইন-সভার দুই-তৃতীয়াংশের অভিযোগে রাষ্ট্রপতি কোন বিচারপতিকে পদচ্যুত করিতে পারেন। উচ্চ আদালতের বিচারপতি হইতে হইলে কোন নিম্ন আদালতে অন্ততঃপক্ষে ১০ বৎসর কাল জজ হিসাবে কাজ করিতে হইবে অথবা কোন উচ্চ আদালতে অন্ততঃপক্ষে ১০ বৎসর ওকালতি বা ব্যারিস্টারি করিতে হইবে।

উচ্চ আদালত নিম্ন আদালতগুলি হইতে আনীত আপীল মামলাগুলি পরিচালনা করে। কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ এই তিনটি প্রেসিডেন্সির

উচ্চ আদালতের আদিম ক্ষমতাও আছে। প্রেসিডেন্সি এলাকাস্থিত গুরুতর ফৌজদারী মামলাগুলির বিচার সরাসরি এখানে হয়। বিশেষ ক্ষেত্রে দেওয়ানী মামলার প্রথম বিচারও এই আদালতে হয়।

বিচার-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

ভারত একটি যুক্তরাষ্ট্র হইলেও সমগ্র ভারতের জন্য একটি সর্বোচ্চ বিচারালয় (সুপ্রিম কোর্ট) আছে। প্রত্যেক রাজ্যে একটি করিয়া উচ্চ আদালত (হাই কোর্ট) আছে। এই উভয় আদালতই দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয়বিধ মামলার বিচার করে। অন্যান্য নিম্ন বিচারালয়গুলি ফৌজদারী ও দেওয়ানী এই দুই ভাগে বিভক্ত। গুরুতর ফৌজদারী মামলাগুলি জুরীর সাহায্যে বিচার করা হয়। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ ধরণের আদালত গঠিত হয়। ইহা ছাড়া, শ্রমিক-মালিক বিরোধ প্রভৃতির নিষ্পত্তির জন্য বিশেষ আদালত আছে। আইনের চক্ষে সব নাগরিকই সমান।

প্রশ্নাবলী

1. Give an account of the judicial system in West Bengal.

2. Discuss the composition and importance of the High Courts. How are the judges of the High Courts appointed?

3. What appears to you to be the striking features of the Indian judicial system? Discuss in this connection the power of the judiciary in relation to the acts of the legislature in India.

চতুর্দশ অধ্যায়

শাসনতন্ত্রের সংশোধন

(Amendment of the Constitution)

শাসনতন্ত্র সংশোধনের পদ্ধতি (Methods of Amendment of the Constitution)

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় লিখিত ও অনমনীয় শাসনতন্ত্র অপরিহার্য বলিয়া পরিগণিত হয়। ভারতের শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় ক্ষমতার আধিক্য থাকিলেও শাসনব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রীয় আদর্শে গঠিত হইয়াছে। সুতরাং ভারতের শাসনতন্ত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের মত অত্যধিক অনমনীয় না হইলেও ইহাকে অনমনীয় পর্যায়ভুক্ত করা যায়।

একাধিক পদ্ধতিতে ভারতের শাসনতন্ত্রের সংশোধন করা যায়।

১। সাধারণতঃ, শাসনতন্ত্রের সংশোধন করিতে হইলে একটি বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হয়। প্রত্যেক সংশোধন প্রস্তাব একটি বিলের আকারে পার্লামেণ্টের যে-কোন পরিষদে উত্থাপন করিতে হইবে। এইরূপ উত্থাপিত সংশোধন বিল প্রত্যেক পরিষদে উপস্থিত দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটাধিক্যে এবং সমগ্র সদস্যের সংখ্যাধিক্যের ভোটে গৃহীত হওয়া চাই। আইনসভা কর্তৃক অনুমোদিত সংশোধন বিল রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়া সংশোধিত আইনে পরিণত হয়।

২। কতকগুলি নির্দিষ্ট বিষয়ে সংশোধন বিল আইনে পরিণত করিতে হইলে পার্লামেণ্ট কর্তৃক গৃহীত প্রথম তপশীলভুক্ত 'ক' ও 'খ' ভাগে বর্ণিত রাজ্য আইনসভাগুলির অর্ধেক কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া প্রয়োজন ছিল। এই বিষয়-গুলি হইল : (১) রাষ্ট্রপতির নির্বাচনব্যবস্থা ; (২) কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতার পরিধি ; (৩) রাজ্য সরকারের ক্ষমতার পরিধি ; (৪) গ-শ্রেণীর রাজ্যের উচ্চ বিচারালয় ; (৫) শাসনতন্ত্রের সংশোধনব্যবস্থা ; (৬) সুপ্রিম কোর্ট-সংক্রান্ত বিষয় ; (৭) উচ্চ বিচারালয় সংক্রান্ত বিষয় ; (৮) আইনপ্রণয়ন ক্ষমতা ও এই ক্ষমতার বণ্টন ; (৯) পার্লামেণ্টে রাজ্যগুলির প্রতিনিধিত্ব।

উপরি-উক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কিত সংশোধন বিল অর্ধেক সংখ্যক রাজ্য আইনসভা কর্তৃক অনুমোদিত হইলে রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ করা হয় এবং তাঁহার সম্মতি পাইলে বৈধ বলিয়া বিবেচিত হয়।

৩। তৃতীয়তঃ, এমন অনেকগুলি বিষয় আছে, যে বিষয়গুলি সম্পর্কে কোন সংশোধন করিতে হইলে আদৌ কোন ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হয় না। পার্লামেণ্ট সভা সাধারণ আইন প্রণয়ন পদ্ধতিতে ঐ বিষয়গুলির সংশোধন করিতে পারে। নূতন রাজ্যগঠন বা বর্তমান রাজ্যগুলির পুনর্গঠন, প্রথম তপশীলভুক্ত 'গ'-শ্রেণীর রাজ্যগুলির শাসনতন্ত্র প্রণয়ন, কোন রাজ্যে উচ্চ পরিষদ গঠন করা বা বাতিল করা ইত্যাদি ব্যাপার পার্লামেণ্ট সভা সাধারণ আইন প্রণয়ন পদ্ধতিতে নিষ্পন্ন করিতে পারে। এই বিষয়গুলি সম্পর্কে ভারতীয় শাসনতন্ত্রকে আংশিকভাবে নমনীয় বলা যাইতে পারে।

ভারতে শাসনতন্ত্রের সংশোধন পদ্ধতি বিশ্লেষণ করিলে এই পদ্ধতির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ, একমাত্র কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্ট সভা এই শাসনতন্ত্র পরিবর্তনের প্রস্তাব উত্থাপন করিতে পারে—রাজ্য আইনসভাগুলির এ সম্পর্কে কোন ক্ষমতা নাই। দ্বিতীয়তঃ, মার্কিণ বা সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের আংগিক রাজ্যগুলির ন্যায় ভারতের রাজ্যগুলির নিজস্ব কোন স্বতন্ত্র শাসনতন্ত্র নাই বা পরিবর্তন করিতে পারেনা। তৃতীয়তঃ, সুইজারল্যাণ্ডের ন্যায় ভারতের ভোটদাতৃগণও শাসনতন্ত্র পরিবর্তন সম্পর্কে কোন ক্ষমতার অধিকারী নহে। চতুর্থতঃ, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের কতিপয় বিষয়বস্তু একেবারেই অপরিবর্তনীয়, যেমন, রাজ্যগুলি ইহাদের প্রজাতন্ত্রী গঠনতন্ত্র পরিবর্তন করিতে পারে না। কিন্তু ভারতের শাসনতন্ত্রের এমন কোন অংশ নাই যাহা নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে পরিবর্তন করা যায় না।

এখন প্রশ্ন হইল ভারতের শাসনতন্ত্র কি নমনীয় না অনমনীয়? বৃটিশ শাসনতন্ত্র নমনীয়, কারণ সাধারণ আইনসভা অর্থাৎ বৃটিশ পার্লামেণ্ট সাধারণ আইন প্রণয়ন পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন করিতে পারে। আবার মার্কিণ শাসনতন্ত্র অনমনীয় কারণ মার্কিন আইনসভা কংগ্রেস সাধারণ আইন প্রণয়ন পদ্ধতিতে শাসনতন্ত্র পরিবর্তন করিতে পারে না—শাসনতন্ত্র সংশোধনের জন্য পৃথক এক জটিল পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু ভারতের শাসনতন্ত্র নিছক নমনীয় বা নিছক অনমনীয় বলিয়া অভিহিত হইতে পারে না। আবার সুইজারল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্রের ন্যায় ভারতের শাসনতন্ত্র

পরিবর্তনের জন্য ভোটদাতৃগণের অনুপ্রেরণার বা সম্মতির কোন প্রয়োজন হয় না।

ভারতের শাসনতন্ত্রের বিষয়-বস্তু দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা, নমনীয় বা সহজ পরিবর্তনীয় ভাগ এবং অনমনীয় বা দুষ্পরিবর্তনীয় ভাগ। নমনীয় ভাগ পার্লামেণ্ট সভা সাধারণ আইন প্রণয়ন পদ্ধতিতে অর্থাৎ উভয় কক্ষের সাধারণ সংখ্যাধিক্যের ভোটে সংশোধন করিতে পারে। নাগরিকতা সম্পর্কিত বিষয়, নূতন রাজ্য গঠন অথবা অবস্থিত রাজ্যের পুনর্গঠন, পার্লামেণ্টের সদস্যগণের অধিকার, উভয় কক্ষের কার্যপরিচালনা সম্পর্কিত নিয়ম প্রভৃতি বিষয়গুলি এই নমনীয় অংশের অন্তর্ভুক্ত। শাসনতন্ত্রের এই নমনীয় অংশের পরিমাণ ও গুরুত্ব অপেক্ষাকৃত কম।

শাসনতন্ত্রের অপেক্ষাকৃত বৃহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ হইল অনমনীয়। আবার এই অনমনীয় অংশকেও দুইটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়, যথা, সাধারণভাবে অনমনীয় এবং বিশেষভাবে অনমনীয়। সাধারণভাবে অনমনীয় অংশ পরিবর্তন করিতে হইলে দুইটি বিশেষ শর্ত পূরণ করা প্রয়োজন। প্রথমতঃ, কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্ট সভার উভয় কক্ষের সমগ্র সদস্যসংখ্যার নিরংকুশ সংখ্যাধিক্যের উপস্থিতি এবং উভয় কক্ষের উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশের সম্মতি। এইরূপে উভয় কক্ষের দুই তৃতীয়াংশ সদস্যগণ কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাব রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লাভ করিলে সংশোধিত আইন বলিয়া পরিগণিত হয়। শাসনতন্ত্রের এক প্রধান অংশ এই পদ্ধতিতে সংশোধন করা যায়। ১৯৫১ সালে কয়েকটি মৌলিক অধিকারের বিধি, যথা, সাম্যের অধিকার, সম্পত্তি অর্জনের অধিকার প্রভৃতি এই পদ্ধতিতে সংশোধন করা হয়।

বিশেষভাবে অনমনীয় অংশ পরিবর্তন করিতে হইলে কেন্দ্রীয় আইনসভার দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাধিক্যের ভোট ব্যতীতও ক ও খ ভাগে বর্ণিত রাজ্য আইন-সভাগুলির অন্ততঃ অর্ধেকের সম্মতি প্রয়োজন। রাষ্ট্রপতির নির্বাচন, কেন্দ্রীয় সরকারের শাসন ক্ষমতা, আইন প্রণয়ন বিষয়ক ক্ষমতার বণ্টন, পার্লামেণ্ট সভায় রাজ্যগুলির প্রতিনিধিত্ব প্রভৃতি বিষয়গুলি এই অংশের অন্তর্ভুক্ত। যে পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া শাসনতন্ত্র সংশোধন হউক না কেন, প্রত্যেকটি সংশোধন প্রস্তাব একটি বিলের আকারে উত্থাপিত করিতে হইবে।

লিখিত শাসনতন্ত্র-যুক্ত অন্যান্যদেশের শাসনতন্ত্রের সহিত তুলনা করিলে দেখা যায় যে, ভারতে শাসনতন্ত্রের রচয়িতাগণ শাসনতন্ত্র যাহাতে ক্ষণভঙ্গুর না হয়, তজ্জন্য যথেষ্ট সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন। জনসাধারণের

মৌলিক অধিকারগুলি যাহাতে সহসা ক্ষুণ্ণ না হয় এবং আঞ্চলিক সরকারগুলির মতামত যাহাতে একেবারে উপেক্ষিত না হয়, তজ্জন্য শাসনতন্ত্রের রচয়িতাগণ শাসনতন্ত্রের সংশ্লিষ্ট অংশ বিশেষ রূপে দুষ্পরিবর্তনীয় করিয়াছেন। সংশ্লিষ্ট অংশ বিশেষের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া দুষ্পরিবর্তনীয়তারও মাত্রা স্থির করিয়াছেন। কেবল ভোটদাতাগণকে শাসনতন্ত্র সংশোধন ব্যাপারে কোন ক্ষমতা দান করেন নাই।

ভারতের শাসনতন্ত্রের সংশোধন আইনসমূহ (Amendments to the Indian Constitution)

১৯৫০ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী ভারতে নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হয়। এই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান কাল পর্যন্ত এই শাসনতন্ত্র কতকগুলি সংশোধন আইন ও শাসনতন্ত্র-সংক্রান্ত নির্দেশ (Constitution orders) দ্বারা পরিবর্তিত হইয়াছে। প্রধান প্রধান সংশোধনগুলির বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

১। শাসনতান্ত্রিক প্রথম সংশোধন আইন, ১৯৫১—Constitution (First Amendment) Act, 1951.

এই সংশোধন দ্বারা শাসনতন্ত্র প্রদত্ত নাগরিকগণের বাক্-স্বাধীনতা কিয়ং-পরিমাণে সংকুচিত করা হয়। শাসনতন্ত্রের ১৯নং ধারায় বর্ণিত বাক্-স্বাধীনতা এরূপভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় যে, ভারত সরকার রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষাকল্পে বা পররাষ্ট্রের সহিত মৈত্রীভাব অব্যাহত রাখিবার জন্য, বা শান্তিশৃংখলা রক্ষাকল্পে, নৈতিক আবহাওয়া রক্ষাকল্পে অথবা অনুরূপ অবস্থায় প্রয়োজন বোধ করিলে যুক্তিসম্মতভাবে নাগরিকগণের বাক্-স্বাধীনতা সংকুচিত করিতে পারিবেন।

এই সংশোধন দ্বারা রাষ্ট্রকে কোন অনুন্নত শ্রেণীর নাগরিকগণের বা তপশীল জাতির উন্নতিবিধানের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত এই সংশোধিত আইনের বলে জনস্বার্থের উন্নতিকল্পে রাষ্ট্রের উপর ক্ষতিপূরণ দিয়া ব্যক্তিগত সম্পত্তি, শিল্প ও ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান দখল বা পরিচালনা করিবার ব্যাপক ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে।

২। শাসনতান্ত্রিক দ্বিতীয় সংশোধন আইন, ১৯৫২—Constitution (Second Amendment) Act, 1952.

এই সংশোধন আইনের বলে লোকসভার প্রতিনিধিত্বের ঊর্ধ্ব সীমা অর্থাৎ সাড়ে সাত লক্ষ তুলিয়া দেওয়া হয়। বর্তমানে প্রতি ৫ লক্ষে একজন প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবেন।

৩। শাসনতান্ত্রিক তৃতীয় সংশোধন আইন, ১৯৫৪—Constitution (Third Amendment) Act, 1954.

এই সংশোধনের বলে কতকগুলি দেশজাত ও বিদেশ হইতে আমদানীকৃত প্রয়োজনীয় দ্রব্যের নিয়ন্ত্রণ যুগ্ম তালিকা (Concurrent List) ভুক্ত করিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের ঐ সমস্ত শিল্পের উপর নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়।

৪। শাসনতান্ত্রিক চতুর্থ সংশোধন আইন, ১৯৫৫—Constitution (Fourth Amendment) Act, 1955

এই সংশোধন আইনের বলে রাষ্ট্র জনস্বার্থের খাতিরে বা উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থাপনা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে বিনা ক্ষতিপূরণে যে-কোনও শিল্প বা ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান বা অন্যবিধ ব্যক্তিগত সম্পত্তি সাময়িকভাবে রাষ্ট্র পরিচালনাধীন করিতে পারে। এই আইনের দ্বারা প্রথম সংশোধন আইনের ত্রুটি দূর করা হয়।

৫। শাসনতান্ত্রিক পঞ্চম সংশোধন আইন, ১৯৫৫—Constitution (Fifth Amendment) Act, 1955.

এই আইনের দ্বারা পার্লামেণ্ট সভার 'ক' বা 'খ' শ্রেণীর কোন রাজ্যের আয়তন, সীমানা বা নাম পরিবর্তন সম্পর্কিত আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা সংকুচিত করা হয়।

৬। শাসনতান্ত্রিক ষষ্ঠ সংশোধন আইন, ১৯৫৬—Constitution (Sixth Amendment) Act, 1956.

এই সংশোধন শাসনতন্ত্রের সপ্তম তপশীলে যুক্তরাষ্ট্রীয় তালিকায় ৯২ (ক) নামক এক নূতন বিষয় যোগ করিয়াছে। এই নূতন বিষয়টি অন্তর্ভুক্তির ফলে এক সংবাদপত্র ক্রয়-বিক্রয় ব্যতীত আন্তঃরাজ্য বাণিজ্যের অন্যান্য দ্রব্য ক্রয়-

বিক্রয়ের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের কর স্থাপনের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কর হইতে প্রাপ্ত আয় অবশ্য বাণিজ্যরত রাজ্যগুলির মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক বণ্টন করিয়া দেওয়া হইবে।

৭। শাসনতান্ত্রিক সপ্তম সংশোধন আইন, ১৯৫৬—Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956.

এই আইনের দ্বারা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের রাজ্যগুলির পুনর্গঠন করা হইয়াছে। 'ক', 'খ' ও 'গ' এই তিন শ্রেণীর রাজ্যের বিলোপ সাধন করিয়া ভারতকে জম্মু ও কাশ্মীর সহ ১৪টি সমপর্যায়ভুক্ত রাজ্য ও ৬টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে বিভক্ত করা হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত সমগ্র ভারত ৫টি অঞ্চলে বিভক্ত হইয়া প্রত্যেকটি অঞ্চলের জন্য একটি আঞ্চলিক মন্ত্রণাসভা গঠিত হইয়াছিল। প্রত্যেকটি রাজ্যে একটি উচ্চ বিচারালয় প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থাও হইয়াছিল। এ সম্পর্কে পূর্বে বিশদভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

৮। শাসনতান্ত্রিক অষ্টম সংশোধন আইন, ১৯৫৯—Constitution (Eighth Amendment) Act, 1959

এই আইনের সাহায্যে শাসনতন্ত্রের ৩৩৪ নং ধারার পরিবর্তন করা হয়। এই সংশোধন আইনের ভিত্তিতে তপশীলী শ্রেণীভুক্ত জাতি ও তপশীলী শ্রেণীভুক্ত উপজাতিসমূহের জন্য কেন্দ্রীয় লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভায় ১৯৬০ খৃষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া আরও ১০ বৎসর পর্যন্ত আসন সংরক্ষণের বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায়ের জন্যও পূর্বতন মনোনয়ন পদ্ধতিও আরও ১০ বৎসর চলিতে থাকিবে।

৯। শাসনতান্ত্রিক নবম সংশোধন আইন, ১৯৬০—Constitution (Ninth Amendment) Act, 1960.

১৯৬০ খৃষ্টাব্দের নবম সংশোধন আইনের সাহায্যে আদি শাসনতন্ত্রের প্রথম তপশীলের পরিবর্তন করা হয়। ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকার ও পাকিস্তান সরকারের মধ্যে স্থান বিনিময়ের যে চুক্তি হয়, সেই চুক্তি বলবৎ করিবার উদ্দেশ্যেই এই সংশোধন আইন পাস হয়। এই আইনের বলে ভারতীয় রাষ্ট্রের বেরুবাড়ি অঞ্চলের পাকিস্তানভুক্তির সিদ্ধান্ত আইনসম্মত করা হয়।

১০। শাসনতান্ত্রিক দশম সংশোধন আইন, ১৯৬০—Constitution (Tenth Amendment) Act, 1960.

দশম সংশোধন আইনের বলে স্বাধীন দাদ্রা ও নগর হেভেলি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গীভূত হইয়া কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিণত হয়।

১১। শাসনতান্ত্রিক একাদশ সংশোধন আইন, (Eleventh Amendment) Act, 1961.

এই সংশোধন আইনের সাহায্যে উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষের যুক্ত অধিবেশনের প্রয়োজনীয়তা দূর করিয়া উভয় কক্ষকে একটি নিবাচন কেন্দ্রে পরিণত করা হয়। ইহার সাহায্যে রাষ্ট্রপতি এবং উপ-রাষ্ট্রপতির নির্বাচন সম্পর্কে শাসনতন্ত্রের ৭১নং ধারারও পরিবর্তন করা হয়।

১২। শাসনতান্ত্রিক দ্বাদশ সংশোধন আইন, (Twelfth Amendment) Act, 1962.

এই সংশোধন আইনের সাহায্যে পূর্বতন পোর্তুগীজ অধিকৃত গোয়া, দমন ও দিউ ভারতের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিণত হয়।

১৩। শাসনতান্ত্রিক ত্রয়োদশ সংশোধন আইন, tion (Thirteenth Amendment) Act, 1962.

শাসনতন্ত্রের এই সংশোধন আইন দ্বারা নাগাভূমিকে ভারতের ষোড়শ রাজ্যে উন্নীত করা হয়।

১৪। শাসনতান্ত্রিক চতুর্দশ সংশোধন আইন, (Fourteenth Amendment) Act, 1962.

এই সংশোধন সাহায্যে দিল্লী ব্যতীত অন্যান্য কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে মন্ত্রি-পরিষদ ও আইনসভা গঠনের ক্ষমতা পার্লামেণ্টের উপর অর্পিত হয়। ভূতপূর্ব ফরাসী অধিকৃত অঞ্চলগুলি পণ্ডিচেরি নামে গঠিত হয়।

১৫। শাসনতান্ত্রিক পঞ্চদশ সংশোধন আইন, (Fifteenth Amendment) Act, 1963. 1

এই সংশোধন আইনের দ্বারা উচ্চ বিচারালয়ের বিচারপতিগণের অবসর গ্রহণ করিবার বয়স ৬০ হইতে ৬২-তে বৃদ্ধি করা হয় এবং তাঁহাদিগকে এক

উচ্চ বিচারালয় হইতে অন্য বিচারালয়ে বদলী করিলে তাঁহাদের ক্ষতিপূরণ ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

১৬। শাসনতান্ত্রিক ষোড়শ সংশোধন আইন, ১৯৬৩—Constitution (Sixteenth Amendment) Act, 1963.

ভারতের সার্বভৌমিকতার স্বার্থে ১৯নং ধারার অন্তর্ভুক্ত ১নং উপধারার ক, খ, গ অনুচ্ছেদে বর্ণিত অধিকারগুলির যুক্তিসম্মত সংকোচন করিবার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রের উপর উপরি-উক্ত ১৯নং ধারার যথাক্রমে ২, ৩ ও ৪নং উপধারার সংশোধন করিবার ক্ষমতা দেওয়া হয়।

১৭। শাসনতান্ত্রিক সপ্তদশ সংশোধন আইন, ১৯৬৩—Constitution (Seventeenth Amendment) Act

সপ্তদশ সংশোধন দ্বারা ৫১ (ক) ধারাকে আরও ব্যাপক করা হইয়াছে এবং নবম তপশীলে আরও কতিপয় রাজ্য আইন এরূপভাবে যোগ করা হইয়াছে যাহাতে এইগুলি মৌলিক অধিকার বিরোধী বলিয়া অভিযুক্ত না হইতে পারে।

সংক্ষিপ্তসার

শাসনতন্ত্রের সংশোধন পদ্ধতি—সাধারণভাবে বলিতে গেলে ভারতের শাসনতন্ত্রকে অনমনীয় আখ্যা দেওয়া হয়। পার্লামেণ্ট সভা সাধারণ আইন-প্রণয়ন পদ্ধতিতে এই শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন সাধন করিতে পারে না। ১। শাসনতন্ত্র সংশোধন করিতে হইলে পার্লামেণ্টের যে কোন কক্ষে সংশোধন প্রস্তাব একটি বিল আকারে উত্থাপন করিতে হইবে। সংশোধন-প্রস্তাব বৈধ বলিয়া বিবেচিত হইলে প্রত্যেক কক্ষে উপস্থিত দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সংখ্যাধিক্য ভোটে ও সমগ্র সদস্যবৃন্দের সংখ্যাধিক্যে অনুমোদিত হওয়া এবং রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করা চাই। ২। কতিপয় নির্দিষ্ট-ক্ষেত্রে যথা, রাষ্ট্রপতি নির্বাচন-ব্যবস্থা, সুপ্রিম কোর্ট ও উচ্চ বিচারালয়-সংক্রান্ত বিষয়, আইন-প্রণয়ন ক্ষমতার বণ্টনপদ্ধতি প্রভৃতি পার্লামেণ্ট কর্তৃক গৃহীত সংশোধন প্রস্তাব রাজ্য আইনসভাগুলির অর্ধেক কর্তৃক গৃহীত হওয়া চাই। ৩। নূতন রাষ্ট্রগঠন বা বর্তমান রাষ্ট্রগুলির পুনর্গঠন প্রভৃতি কয়েকটি বিষয় আবার পার্লামেণ্ট সভা সাধারণ অধিবেশনে সাধারণ আইন-প্রণয়ন পদ্ধতিতে সংশোধন করিতে পারে।

ভারতের নূতন সংবিধান ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী প্রবর্তিত হয়। ইহার পর হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমানকাল পর্যন্ত ভারতীয় সংবিধান কতকগুলি সংশোধন আইন দ্বারা পরিবর্তিত হইয়াছে।

প্রশ্নাবলী

1. What is the method of amendment of the Constitution of India ? Is the Indian Constitution rigid of flexible ? State your reasons fully.

2. Examine critically the different procedures according to which the provision of the Constitution of India can be amended.



পঞ্চদশ অধ্যায়

ক্ষমতা বণ্টন

(Distribution of Powers)

যুক্তরাষ্ট্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে ক্ষমতা-বিভাজন (Distribution of Powers between the Indian Union and the States)

কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতার বিভাজন হইল প্রত্যেক যুক্তরাষ্ট্রের একটি বৈশিষ্ট্য। সাধারণতঃ দুইটি বিভিন্ন পদ্ধতি অনুযায়ী ক্ষমতার এই ভাগ হয়। প্রথম পদ্ধতি অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকারকে কতকগুলি নির্ধারিত ক্ষমতা দিয়া অবশিষ্ট ক্ষমতাসমূহ রাজ্য সরকারগুলিকে দেওয়া হয়। এই নীতি অনুসারে ক্ষমতা বণ্টন কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্বলতা সূচিত করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ও অস্ট্রেলিয়াতে এই নীতি অনুযায়ী ক্ষমতার বিভাগ হইয়াছে।

অপরপক্ষে দ্বিতীয় নীতি অনুযায়ী রাজ্য সরকারগুলিকে নির্ধারিত ক্ষমতার অধিকারী করিয়া অবশিষ্ট ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে অর্পিত হয়। এই ব্যবস্থা রাজ্য সরকারগুলির দুর্বলতা সূচিত করে। ক্যানাডায় এই নীতি অনুযায়ী ক্ষমতা বণ্টিত হইয়াছে।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতা বণ্টন-নীতি প্রধানতঃ ক্যানাডার ক্ষমতা বণ্টন নীতি অনুসরণ করিলেও এই নীতির কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। ভারত সরকারের সমুদয় ক্ষমতাকে তিন ভাগে ভাগ করা হইয়াছে, যথা, ১। যুক্তরাষ্ট্রীয় তালিকা (সর্বভারতীয়) (Federal or All-India List), ২। রাজ্য তালিকা (State List) ও ৩। যুগ্ম তালিকা (Concurrent List)। সর্বভারতীয় তালিকাভুক্ত বিষয়গুলির উপর একমাত্র ভারত সরকার আইন-প্রণয়ন করিতে পারেন। রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়গুলির উপর সাধারণতঃ রাজ্য সরকারগুলি আইন-প্রণয়ন করিবে এবং যুগ্ম তালিকাভুক্ত বিষয়গুলির উপর কেন্দ্রীয় ও রাজ্য উভয় সরকারকেই আইন-প্রণয়ন ক্ষমতার অধিকারী করা হইয়াছে। তবে বলা হইয়াছে যে, যুগ্ম তালিকাভুক্ত কোন বিষয়ের উপর রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রণীত কোন আইন যদি কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক

প্রণীত আইনের বিরোধী হয় তাহা হইলে রাজ্য সরকারের আইন বাতিল হইয়া কেন্দ্রীয় আইন বলবৎ হইবে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় তালিকা—ভারতে ৯৭টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যুক্তরাষ্ট্রীয় তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। এই তালিকার প্রধান প্রধান বিষয়গুলি হইল:—দেশরক্ষা, অস্ত্র-শস্ত্র ও গোলা-বারুদ নির্মাণ, কূটনৈতিক ও বাণিজ্য সম্পর্ক, রেলপথ ও বন্দর পরিচালনা, ডাক, তার ও টেলিফোন, মুদ্রা-ব্যবস্থা, নাগরিকত্ব, আদমসুমারী, ওজন স্থির করা, তামাক, গাঁজা, আফিম প্রভৃতি মাদক দ্রব্যের উপর কর স্থাপন, সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের গঠনতন্ত্র ও এলাকা বিস্তার, জাতীয় পাঠাগার, ভারতীয় যাদুঘর, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, প্রভৃতি যাবতীয় জাতীয় প্রতিষ্ঠান সংরক্ষণ, উচ্চ শিক্ষার মান নির্ণয়, আন্তঃ-সরকার ব্যবসায়-বাণিজ্য, ইউনিয়ন ও রাজ্য সরকারগুলির হিসাব পরীক্ষা, খনি, আয়কর, পাসপোর্ট ও ভিসা, দ্বিতীয় ও তৃতীয় তালিকায় অনুল্লিখিত বিষয় ইত্যাদি।

রাজ্য তালিকা—৬৬টি বিষয় রাজ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। রাজ্য তালিকার প্রধান প্রধান বিষয়গুলি হইল:—শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা, সাধারণ ও রেলপুলিস, জেলখানা, নিম্ন আদালতগুলির গঠন ও পরিচালনা, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, জনস্বাস্থ্য, কৃষি, ভূমি-ব্যবস্থা, বনসম্পদ, রাজ্যগুলির আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য, জুয়াখেলা ও বাজীবাখা, কৃষি আয়কর, বিক্রয়কর, বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষাব্যবস্থা, শিল্প, ভূমি রাজস্ব, মৎস্যের চাষ ইত্যাদি।

যুগ্ম তালিকা—৪৭টি বিষয় যুগ্ম তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে। এই তালিকার প্রধান প্রধান বিষয়গুলি হইল:—ফৌজদারী আইন, বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ, দেউলিয়া, সম্পত্তি হস্তান্তর, খাদ্যে ভেজাল, শ্রমিক কল্যাণ, জন্মমৃত্যুর হিসাব, সংবাদপত্র, পুস্তক ও ছাপাখানা, বাস্তুত্যাগীর সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও বিলি-ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক ও সমাজ পরিকল্পনা, ঔষধ ও বিষ, দাতব্য প্রতিষ্ঠান, শ্রমিক সংঘ, কারখানা, বিদ্যুৎ, মূল্য নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি।

কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকারের মধ্যে আইন-প্রণয়ন ক্ষমতার বণ্টন (Distribution of Legislative powers between the Union and the States)

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল, কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকারগুলির মধ্যে আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা ও শাসনক্ষমতার বণ্টন।

সকল যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতাবণ্টনের অন্তর্নিহিত নীতির মধ্যে কিছুটা সামঞ্জস্য থাকিলেও দেশভেদে বিভিন্ন দেশের ক্ষমতাবণ্টন নীতির মধ্যে কার্যক্ষেত্রে পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতাগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করা হইয়াছে এবং অনুল্লিখিত ক্ষমতাগুলি রাজ্যসরকারের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। ক্যানাডায় আবার ক্ষমতাগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করিয়া অনুল্লিখিত ক্ষমতাগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে ন্যস্ত করা হইয়াছে।

ভারতে ক্ষমতাবণ্টন বিষয়ে অনেক পরিমাণে ক্যানাডার নীতি অনুসৃত হইয়াছে। ভারতে আইন প্রণয়ন বিষয়গুলিকে তিনটি তালিকায় ভাগ করা হইয়াছে: (১) কেন্দ্রীয় তালিকা, (২) রাজ্য তালিকা ও (৩) যুগ্ম তালিকা। কেন্দ্রীয় তালিকা ও রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়গুলির উপর যথাক্রমে কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্ট ও রাজ্য আইনসভাগুলি আইন প্রণয়ন করিবে এবং উভয় সরকারই স্ব স্ব এলাকায় সাধারণতঃ অন্যনিরপেক্ষভাবে আইন-প্রণয়ন করিবার অধিকারী। যুগ্মবিষয়গুলির উপর কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকার—উভয় সরকারই আইন প্রণয়ন করিতে পারে। কিন্তু যুগ্ম তালিকাভুক্ত কোন বিষয়ে রাজ্য আইনসভা দ্বারা প্রণীত কোন আইনের সহিত যদি পার্লামেণ্ট কর্তৃক প্রণীত আইনের সংঘাত হয়, তাহা হইলে রাজ্য আইন বাতিল হইবে। সুতরাং ভারতে পার্লামেণ্ট হইল আইন-প্রণয়ন বিষয়ে অনুল্লিখিত ক্ষমতার অধিকারী।

সংবিধানে ব্যবস্থা আছে যে, এক বা একাধিক রাজ্য তালিকাভুক্ত যে-কোন বিষয়ে আইন-প্রণয়নের ক্ষমতা স্বেচ্ছায় পার্লামেণ্টের হস্তে সমর্পণ করিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, সংবিধানে লিখিত আছে যে, পার্লামেণ্ট যদি মনে করে যে, কোন রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয় জাতীয় গুরুত্বসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে তাহা হইলে ঐ বিষয়টি রাজ্য তালিকাভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও ঐ বিষয়ে পার্লামেণ্ট আইন প্রণয়ন করিতে পারে। তৃতীয়তঃ, পার্লামেণ্টের উচ্চ পরিষদ অর্থাৎ রাজ্যসভা যদি দুই-তৃতীয়াংশ ভোটাধিক্যে প্রস্তাব পাস করিয়া পার্লামেণ্ট সভাকে কোন রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়ের উপর আইন প্রণয়ন করিতে অনুরোধ করে তাহা হইলেও পার্লামেণ্ট সভা ঐ রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়ের উপর আইন প্রণয়ন করিতে পারে। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জরুরী অবস্থা ঘোষণাকালে পার্লামেণ্ট যে-কোনও বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে পারে এবং কোন রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থার সৃষ্টি হইলে পার্লামেণ্ট রাজ্য আইনসভার স্থান অধিকার করিতে পারে। 'গ'-শ্রেণীর রাজ্য ও 'ঘ'-শ্রেণীর অঞ্চলের উপর আইন-

প্রণয়ন ব্যাপারে পর্লামেণ্টের পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল। বর্তমানে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির জন্যও পার্লামেণ্ট আইন প্রণয়ন করে।

উপরি-উক্ত বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত অন্য সময়ে উভয় সরকারই স্ব স্ব এলাকায় স্বাধীনভাবে আইন-প্রণয়নের অধিকারী। একের অধিকারভুক্ত এলাকায় অন্যে হস্তক্ষেপ করিলে সুপ্রিম কোর্ট এই অন্যায় হস্তক্ষেপ নিরোধ করিবে।

কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে শাসন-ক্ষমতার বণ্টন (Distribution of Executive Powers between the Union and the States)

আইন-প্রণয়ন ক্ষমতার বণ্টনের অনুরূপভাবেই কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে শাসন-ক্ষমতার বণ্টন করা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় (সর্বভাবতীয) তালিকাভুক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে যাবতীয শাসন-ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকার প্রয়োগ করিবে এবং রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়গুলির উপর রাজ্য সরকারগুলি ক্ষমতা প্রয়োগ করিবে।

যুগ্ম তালিকাভুক্ত বিষয়গুলির শাসন সম্পর্কে একটু অভিনবত্ব দেখা যায়। সাধারণতঃ, যুগ্ম তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে শাসন-ক্ষমতা রাজ্যগুলিই প্রয়োগ করিবে, কিন্তু এ সম্পর্কে কেন্দ্র সময় সময় রাজ্যগুলিকে নির্দেশ দান করিতে পারে।

প্রথমতঃ পার্লামেণ্ট আইন প্রণয়ন করিয়া কোন বিষয়ের শাসন-ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে ন্যস্ত করিতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে পার্লামেণ্ট আনীত আইনের বলে যুগ্ম তালিকাভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও উক্ত বিষয়ের শাসনকার্য কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃকই পরিচালিত হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, যে সমস্ত ক্ষেত্রে সংবিধান স্পষ্টভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর শাসনক্ষমতা অর্পণ করিয়াছে, সে সমস্ত ক্ষেত্রেও কেন্দ্রীয় সরকার যুগ্মতালিকাভুক্ত বিষয়ের উপর ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, (ক) কোন সন্ধি বা আন্তর্জাতিক চুক্তি যাহা কেন্দ্রীয়, রাজ্য বা যুগ্ম তালিকাভুক্ত হউক না কেন, (খ) কতকগুলি নির্ধারিত বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যসরকারগুলিকে তাহাদের শাসন ক্ষমতা প্রয়োগ সম্পর্কে স্বাভাবিক অবস্থায় অথবা জরুরী অবস্থায় নির্দেশ দান করিতে পারে। স্বাভাবিক অবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে রাজ্যসরকারগুলিকে নির্দেশ দান করিতে পারে।

১। কেন্দ্র প্রণীত আইনগুলির রাজ্যগুলিতে যথাযথ প্রয়োগ;

২। রাজ্যসরকারগুলি এরূপভাবে তাহাদের শাসন-ক্ষমতা প্রয়োগ করিবে যাহাতে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ক্ষমতা প্রয়োগের কোন অন্তরায় না ঘটায় ;

৩। জাতীয় ও সামরিক গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ ব্যবস্থার নির্মাণ ও সংরক্ষণ ;

৪। রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত রেলপথের সংরক্ষণ ;

৫। তপশীলিভুক্ত সম্প্রদায়গুলির কল্যাণের উদ্দেশ্যে নির্দেশনামায় উল্লিখিত উপায়গুলি বলবৎ করা ;

৬। ভাষা-ভিত্তিক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা মাতৃ-ভাষার মাধ্যমে পরিবেশন করিবার জন্য যথোপযুক্ত সুবিধা দান করা ,

৭। হিন্দী ভাষার উন্নতিসাধন করা। জরুরী অবস্থাকালে নিম্নলিখিত উপায়ে কেন্দ্রীয় নির্দেশ রাজ্যসরকারগুলির উপর বলবৎ করা যাইবে।

(১) জরুরী অবস্থা ঘোষণাকালে যে কোন বিষয়ে রাজ্যের শাসনকার্য কিভাবে পরিচালিত হইবে, কেন্দ্রীয় সরকার তাহার নির্দেশ দান করিতে পারিবে।

(২) কোন রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচল পরিস্থিতিজনিত জরুরী অবস্থা ঘোষণাকালে রাজ্যের সমুদয় অথবা যে-কোন শাসনক্ষমতা রাষ্ট্রপতি স্বয়ং গ্রহণ করিতে পারেন।

অর্থ-সংক্রান্ত জরুরী অবস্থা ঘোষণাকালে কেন্দ্রীয় সরকার নিম্নলিখিতভাবে নির্দেশ দান করিতে পারে।

(১) নির্দেশ-নির্ধারিত পদ্ধতিতে আয়-ব্যয়-সংক্রান্ত বিষয় পরিচালিত করিতে হইবে।

(২) কেন্দ্র শাসন সম্পর্কিত সুপ্রিম কোর্ট ও উচ্চ বিচারালয়ের বিচারপতিসহ যে-কোন শ্রেণীর কর্মচারিগণের বেতন হ্রাস করা যাইতে পারে।

(৩) রাজ্যসরকার কর্তৃক অনুমোদিত আয় ও ব্যয়-বরাদ্দগুলি রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য সংরক্ষিত থাকিবে ;

ইহা ছাড়া, শাসন-সংক্রান্ত ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকার পারস্পরিক সম্মতির মাধ্যমে উভয়েই উভয়ের উপর নিজ নিজ শাসন-ক্ষমতার কোন অংশ পরিচালনার ভার অর্পণ করিতে পারে।

কতিপয় ক্ষেত্রে রাজ্যসরকারের সম্মতি ছাড়াও পার্লামেণ্ট প্রণীত কোন আইনের বলে কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্যসরকার অথবা ইহার কর্মচারীবৃন্দের উপর কেন্দ্রীয় শাসনকার্যের অন্তর্ভুক্ত কাজ বা কর্তব্য সম্পাদনের ভার অর্পণ করিতে পারে।

কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত রাজ্য সরকারগুলির রাজস্ব-বিষয়ক সম্পর্ক (Financial Relation between the Union and the States)

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় সাধারণ সরকার ও আঞ্চলিক সরকারসমূহের হাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে রাজস্ব না থাকিলে তাহাদের পক্ষে নিজ নিজ দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করা সম্ভব হয় না। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় ও রাজ্য এই উভয় প্রকার সরকার যাহাতে তাহাদের নিজ নিজ কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করিতে পারে, এই উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ভারতীয় সংবিধানে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে রাজস্ব বণ্টন করা হইয়াছে।

ভারতে শাসনতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে কর ধার্য করিবার ক্ষমতা (power to levy taxes) বণ্টন করা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় বা সরভারতীয় তালিকাভুক্ত বিষয়সমূহের উপর কর ধার্য করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর। রাজ্য সরকারগুলি হইলেন রাজ্য-তালিকাভুক্ত বিষয়গুলির উপর কর ধার্য করিবার অধিকারী। ইহা ছাড়া কোন নূতন বিষয়ে কর ধার্য করিবার ক্ষমতা থাকিবে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে।

শাসনতন্ত্রের ২৮৫ ধারা অনুসারে পার্লামেণ্টের কোন আইন ব্যতীত কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পত্তি রাজ্যসরকার কর্তৃক ধার্য কর হইতে অব্যাহতি পাইবে। অনুরূপভাবে রাজ্য সরকারের সম্পত্তি ও আয় কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ধার্য কর হইতে অব্যাহতি পাইবে। কিন্তু কোন রাজ্য যদি পার্লামেণ্টের অনুমোদন ব্যতীত কোন ব্যবসা করে তাহা হইলে উহা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ধার্য কর হইতে রেহাই পাইবে না।

রাজ্য সরকার কর্তৃক ধার্য করগুলি হইতে যে আয় হয় উহা সম্পূর্ণভাবে রাজ্য সরকারগুলি ভোগ করে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ধার্য করসমূহকে চারিভাগে ভাগ করা যায়:—

প্রথমতঃ, কতিপয় কর কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ধার্য ও সংগৃহীত হয় এবং উহা

হইতে প্রাপ্ত অর্থ কেন্দ্রীয় সরকার স্বয়ং ভোগ করেন। যথা, আমদানী-রপ্তানী শুল্ক, কর্পোরেশন কর ইত্যাদি।

দ্বিতীয়তঃ, নিম্নলিখিত করগুলি কেন্দ্রীয় সরকার ধার্য ও আদায় করিবেন, কিন্তু সংগৃহীত আয়ের একাংশ রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতে হইবে। যথা, আয় কর, আবগারী শুল্ক ইত্যাদি।

তৃতীয়তঃ, নিম্নলিখিত করগুলি কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ধার্য ও সংগৃহীত হইবে, কিন্তু উহা হইতে প্রাপ্ত সমগ্র রাজস্ব রাজ্যসমূহের মধ্যে ভাগ করিয়া দিতে হইবে, যথা, সম্পত্তি কর।

চতুর্থতঃ, নিম্নলিখিত করগুলি কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ধার্য হইবে, কিন্তু করগুলি সংগ্রহ ও ভোগ করিবেন রাজ্য সরকার যথা—স্ট্যাম্প কর, প্রসাধন সামগ্রীর উপর আবগারী শুল্ক ইত্যাদি।

বর্তমানে রাষ্ট্রসমূহ পুলিশী রাষ্ট্র হইতে জনকল্যাণকর রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার সংগে সংগে রাষ্ট্রের কার্য বহুগুণে সম্প্রসারিত হইয়াছে। ভারত একটি অনুন্নত দেশ। এই দেশে বর্তমানে নানাবিধ সমস্যা রহিয়াছে যেগুলির আশু সমাধান করা একান্ত প্রয়োজনীয়। এই সমস্যাগুলি কেন্দ্রীয় সরকার অপেক্ষা রাজ্য সরকারগুলি অধিকতর সুষ্ঠুভাবে সমাধান করিতে পারে। কিন্তু ভারতে রাজ্য সরকারগুলির রাজ্যের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য ব্যয় করিবার মত উপযুক্ত আর্থিক সংগতি নাই। অতএব দেখা যাইতেছে যে, প্রয়োজনের তুলনায় রাজ্য সরকারগুলির আর্থিক সংগতি নিতান্তই নগণ্য। ইহা ছাড়া ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত সকল রাজ্য আর্থিক দিক দিয়া সমান সংগতিপন্ন নহে। রাজ্য সরকারগুলির কার্য ও আর্থিক সংগতির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা ও আন্তঃ রাজ্য আর্থিক তারতম্য দূর করিবার জন্য ভারতের শাসনতন্ত্র অনুযায়ী নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি বলবৎ করা হইয়াছে: প্রথমতঃ, রাজ্যসমূহ, কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ধার্য কতিপয় করের একাংশ ভোগ করে। দ্বিতীয়তঃ, কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ধার্য কতিপয় করের সমগ্র অংশ রাজ্য সরকারগুলি ভোগ করে। তৃতীয়তঃ, ইহা ছাড়া কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যসরকার সমূহকে অর্থ সাহায্য করে। এই অনুদান আবার দুই প্রকারের হইতে পারে—শর্তসাপেক্ষ অনুদান (Conditional Grants) এবং সাধারণ অনুদান (Grants-in-Aid)। ইহা ছাড়া আসামের উপজাতিদের কল্যাণার্থে আসাম সরকারকে বিশেষ অনুদান দেওয়া হয়।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, রাজস্বের দিক দিয়া ভারতে রাজ্য সরকারগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। এই কারণে ভারতের শাসনতন্ত্র অনুযায়ী রাষ্ট্রপতিকে একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর একটি ফিনান্স কমিশন গঠন করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। এই ফিনান্স কমিশন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির অর্থনৈতিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিবার পর কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে রাজস্ব বণ্টন বিষয়ে কতিপয় সুপারিশ করে, যথা, আয়কর হইতে প্রাপ্ত রাজস্বের কি পরিমাণ রাজ্যগুলি পাইবে এবং কি নীতিতে ঐ প্রাপ্য রাজস্ব রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টন করা হইবে, কোন্ রাজ্য কি পরিমাণ কেন্দ্রীয় সাহায্য পাইবে ইত্যাদি। এই কমিশনের অনুমোদনগুলি আবার তিন ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমতঃ, কতিপয় সুপারিশ, যথা, আয়কর সম্পর্কিত অনুমোদন, ভারতের রাষ্ট্রপতির আদেশে কার্যকরী হয়। দ্বিতীয়তঃ, কতিপয় সুপারিশ পার্লামেণ্টের আইন দ্বারা বলবৎ করা হয়, যথা, আবগারী শুল্ক ও সম্পত্তি কর বিষয়ক অনুমোদন ইত্যাদি। তৃতীয়তঃ, রেলওয়ে ভাড়ার পরিবর্তে অনুদান বিষয়ক সুপারিশ শাসন বিভাগীয় আদেশ (Executive orders) দ্বারা কার্যকরী হয়।

১৯৫১ সালে শ্রী কে, সি, নিয়োগীর সভাপতিত্বে প্রথম ফিনান্স কমিশন গঠন করা হয়। ইহার পর ১৯৫৬ ও ১৯৬২ সালে যথাক্রমে শ্রী কে, শান্থানাম ও শ্রী এ, কে, চন্দের সভাপতিত্বে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ফিনান্স কমিশন গঠিত হয়। ১৯৬৪ সালের এপ্রিল মাসে শ্রী পি, ভি, রাজামান্নারকে সভাপতি করিয়া একটি চতুর্থ ফিনান্স কমিশন গঠন করা হয় এবং ১৯৬৫ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর এই কমিশন ইহার বিবরণী প্রকাশ করে। ১৯৬৬ সালের ১লা এপ্রিল হইতে আগামী পাঁচ বৎসরকাল ইহার সুপারিশ কার্যকরী থাকিবে।

কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে রাজস্ব বণ্টনের এই ব্যবস্থা জরুরী অবস্থায় রাষ্ট্রপতি পরিবর্তন করিতে পারেন। ইহা ব্যতীত অর্থসংক্রান্ত জরুরী অবস্থা ঘোষণাকালে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারগুলিকে নানাভাবে নির্দেশদান করিতে পারে। প্রথমতঃ, কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নির্দেশ নির্ধারিত পদ্ধতিতে রাজ্য সরকারগুলিকে আয় ব্যয় সংক্রান্ত বিষয় পরিচালিত করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতিসহ যে কোন শ্রেণীর কর্মচারিগণের বেতন হ্রাস করা যাইতে পারে। এতদ্ব্যতীত, এই ঘোষণা

বলবৎ থাকাকালে রাজ্য সরকারের আয় ও ব্যয়বরাদ্দ প্রস্তাবসমূহ রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য সংরক্ষিত থাকিবে।

ঋণ গ্রহণ করিবার ক্ষমতার দিক দিয়া দেখা যায় যে, কেন্দ্রীয় সরকারের দেশের অভ্যন্তর ও বিদেশ হইতে ঋণ গ্রহণ করিবার অবাধ ক্ষমতা রহিয়াছে। কিন্তু রাজ্য সরকারগুলি বিদেশ হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে পারে না। রাজ্য-সরকারগুলি কতিপয় শর্তাধীনে কেবলমাত্র দেশের অভ্যন্তর হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে পারে।

পরিশেষে বলা যায় যে, আইন প্রণয়ন ক্ষমতা ও শাসনক্ষমতার ন্যায় অর্থ-সংক্রান্ত ক্ষমতার দিক দিয়াও ভারতে রাজ্য সরকারগুলির ক্ষমতা অনেক কম এবং রাজ্যসরকারগুলি বহুলাংশে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নির্ভরশীল।

সংক্ষিপ্তসার

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় সরকারের ক্ষমতাসমূহ কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে শাসনতন্ত্র কর্তৃক ভাগ করিয়া দেওয়া হয় ও প্রত্যেকটি সরকার স্বাধীনভাবে এই ক্ষমতাগুলি পরিচালনা করে। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন থাকে। যুক্তরাষ্ট্র হিসাবে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র অপেক্ষা ক্যানাডার সহিত ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বেশী সাদৃশ্য দেখা যায়। উভয় যুক্তরাষ্ট্রেই শাসনক্ষমতাগুলিকে দুই ভাগে ভাগ না করিয়া তিন ভাগে ভাগ করা হইয়াছে এবং উভয় যুক্তরাষ্ট্রেই অনুল্লিখিত ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে ন্যস্ত করিয়া কেন্দ্রীয় সরকারকে অধিকতর শক্তিশালী করা হইয়াছে। ভারতে শাসন-ক্ষমতাগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা হইয়াছে; যথা, ১। যুক্তরাষ্ট্রীয় তালিকা (সর্বভারতীয়), ২। রাজ্য তালিকা ও ৩। যুগ্ম তালিকা।

যুক্তরাষ্ট্রীয় তালিকা—ভারতে ৯৭টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যুক্তরাষ্ট্রীয় তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। এই তালিকাগুলির প্রধান প্রধান বিষয়গুলি হইল—দেশরক্ষা, অস্ত্র-শস্ত্র ও গোলা-বারুদ নির্মাণ, কূটনৈতিক ও বাণিজ্য সম্পর্ক, ডাক, তার ও টেলিফোন, মুদ্রাব্যবস্থা, নাগরিকত্ব, আদমসুমারী, শিল্পনিয়ন্ত্রণ, ওজন স্থির করা, সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের গঠনতন্ত্র ও এলাকা-বিস্তার, জাতীয় প্রতিষ্ঠান সংরক্ষণ, উচ্চশিক্ষার মান নির্ণয়, আন্তঃসরকার ব্যবসায়-বাণিজ্য

ইউনিয়ন ও রাজ্য সরকারগুলির হিসাব-পরীক্ষা, দ্বিতীয় ও তৃতীয় তালিকায় অনুল্লিখিত ক্ষমতাগুলি ইত্যাদি।

রাজ্য তালিকা—৬৬টি বিষয় লইয়া রাজ্য তালিকা গঠিত হইয়াছে। প্রধান প্রধান বিষয় হইল—শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করা, সাধারণ ও রেল পুলিশ, জেলখানা, নিম্ন আদালতগুলির গঠন ও পরিচালনা, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, জনস্বাস্থ্য ইত্যাদি।

যুগ্ম তালিকা -৪৭টি বিষয় যুগ্ম তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে। যুগ্ম তালিকার অর্থ হইল যে, এই বিষয়গুলি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার উভয়েই আইন প্রণয়ন করিতে পারিবে, কিন্তু এই উভয় সরকার-প্রণীত আইনের মধ্যে যদি বিরোধ ঘটে তাহা হইলে কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্ট কর্তৃক প্রণীত আইন বলবৎ হইবে। যুগ্ম তালিকাভুক্ত প্রধান প্রধান বিষয়গুলি হইল—ফৌজদারী আইন, বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ, খাদ্যে ভেজাল, শ্রমিক-কল্যাণ, জন্মমৃত্যুর হিসাব, সংবাদপত্র, অর্থনৈতিক ও সমাজ পরিকল্পনা, মূল্যনিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি।

প্রশ্নাবলী

1. Describe and comment on the legislative relationship between the Union on the one hand and the States on the other.

2. Explain clearly the principles followed in respect of the distribution of powers between the parliament and the legislatures of States in India.

3. Give an account of the financial arrangements between the Union on the one hand and the States on the other under the Constitution of India.

ষোড়শ অধ্যায়

যুক্তরাষ্ট্রের সহিত রাজ্যসরকারের শাসন সম্পর্ক

(Administrative Relation between the Union and the States)

শাসন সম্পর্ক (Administrative Relation)

কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকারগুলির শাসনব্যবস্থার সমন্বয় সাধনের ফলে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্ভব হয় এবং যুক্তরাষ্ট্রের স্থায়িত্ব ও সাফল্য এই উভয় শাসনব্যবস্থার সহযোগিতার উপর বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। ভারতের নূতন শাসনতন্ত্রে এই শাসন সম্পর্ক বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত রাজ্যসরকারগুলির শাসন সম্পর্ক দুই দিক দিয়া আলোচিত হইয়াছে। প্রথমতঃ, স্বাভাবিক অবস্থায় (Normal times) উভয় সরকারের শাসন সম্পর্ক কিরূপ হইবে এবং দ্বিতীয়তঃ, জরুরী অবস্থায় (Emergency) এই সম্পর্ক কি হইবে। ইহা ছাড়াও, উভয় সরকারের শাসন সম্পর্ক সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করিতে হইলে রাজ্যসরকারগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কিরূপ হইবে তাহাও জানা প্রয়োজন।

স্বাভাবিক অবস্থায় রাজ্যসরকারগুলির উপর যুক্তরাষ্ট্রের প্রাধান্য ও প্রভাব বলবৎ রাখিবার উদ্দেশ্যে ভারতের সংবিধানে নানারূপ ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে। ছয়টি বিভিন্ন উপায়ে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যসরকারগুলির উপর ইহার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারে।

প্রথমতঃ, নির্দেশদানের মাধ্যমে (Directions to the State Government) কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যসরকারগুলির শাসনকার্য নিয়ন্ত্রণ করিতে পারেন। এ সম্পর্কে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, ক্ষমতা হস্তান্তরিত করিয়া (Delegation of functions) কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যসরকারগুলির উপর কেন্দ্রীয় কোন বিষয়ের শাসনভার অর্পণ করিতে পারে। পার্লামেণ্ট আইন প্রণয়ন করিয়াও রাজ্যসরকার ও ইহার কর্মচারিবৃন্দের উপর কোন বিষয়ের শাসনভার অর্পণ করিতে পারে। রাজ্য-

সরকারগুলিও কেন্দ্রীয় সরকারের সম্মতিক্রমে ইহার শাসন-ক্ষমতার কিছু অংশ কেন্দ্রের উপর ন্যস্ত করিতে পারে।

তৃতীয়তঃ, কেন্দ্র ও রাজ্যসরকারগুলির শাসন সম্পর্ক সর্বভারতীয় কৃত্যকের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য কৃত্যক ব্যতীতও সর্বভারতীয় একটি কৃত্যক সংবিধান কর্তৃক গঠিত হইয়াছে। এই কৃত্যক কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকার—উভয় সরকার-সংশ্লিষ্ট। ভারতীয় শাসন পরিচালনা কৃত্যক (I. A. S.) ও ভারতীয় পুলিশ কৃত্যক (I. P. S.) এই সর্বভারতীয় কৃত্যকের অন্তর্ভুক্ত। এ জাতীয় আরও সর্বভারতীয় কৃত্যক রাজ্যসভা বিশেষ পদ্ধতিতে প্রস্তাব পাস করিয়া গঠন করিতে পারে। সর্বভারতীয় কৃত্যকের কর্মচারিবৃন্দের নিয়োগবিধি, বেতন, কার্যের শর্ত প্রভৃতি ভারত সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইলেও তাহারা রাজ্যসরকারের কার্য পরিচালনা করেন এবং কেন্দ্রীয় সরকার এই সর্বভারতীয় কর্মচারিবৃন্দের মাধ্যমে রাজ্য শাসন পরিচালনার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন।

চতুর্থতঃ, আর্থিক সাহায্য (Grant-in-aid) দান করিয়াও কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যসরকারগুলির শাসন নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। রাজ্যগুলির মধ্যে আর্থিক অবস্থার বৈষম্য দূর করিবার উদ্দেশ্য ছাড়াও কেন্দ্রীয় সরকার উন্নয়ন উদ্দেশ্যে এবং তপশীলী সম্প্রদায় ও তপশীলী এলাকার কল্যাণ সাধনের জন্যও অর্থ সাহায্য করিতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও কেন্দ্রীয় সরকার এইরূপ আর্থিক সাহায্যের মাধ্যমে রাজ্য সরকারগুলির উপর প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার করে।

পঞ্চমতঃ, বিভিন্ন রাজ্যের শাসনকার্যের সংহতি সাধনের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপতি প্রয়োজন বোধ করিলে একটি আন্তঃরাজ্য পরিষদ (Inter State Council) গঠন করিতে পারেন। এই উদ্দেশ্যে আজ পর্যন্ত পাঁচটি আন্তঃরাজ্য পরিষদ গঠিত হইয়াছে। এই পরিষদগুলির কর্তব্য হইল বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে বিরোধের কারণ অনুসন্ধান করিয়া তাহার প্রতিকারের সুপারিশ করা এবং যাহাতে রাজ্যগুলির মধ্যে ঐক্য স্থাপিত হয় তাহার উপায়সমূহ সম্পর্কে নির্দেশ গ্রহণের জন্য সুপারিশ করা।

ষষ্ঠতঃ, ভারতীয় এলাকার মধ্যে ব্যবসায়-বাণিজ্য ও অন্যান্য আদান-প্রদানের অবাধ অধিকার সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে পার্লামেণ্ট একটি আন্তঃরাজ্য ব্যবসা' পরিষদ গঠন করিয়া ইহার উপর উপযুক্ত ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারে।

শাসনতন্ত্রে বর্ণিত উপরি-উক্ত উপায়গুলি ব্যতীতও অন্য নানা উপায়ে কেন্দ্রীয়

সরকার ও রাজ্যসরকারগুলির ক্ষমতার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া সর্বভারতীয় উন্নয়নের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকারের পর্যায়ে কয়েকটি উপদেষ্টা সমিতির সাহায্যে কেন্দ্রীয় সরকার নির্ধারিত নীতি ও রাজ্য শাসননীতির মধ্যে বিরোধ দূর করিয়া সংহতি সাধন করাই হইল এই সমিতিগুলির প্রধান কাজ। শাসনতন্ত্রে উল্লিখিত না হইলেও পরিকল্পনা সমিতি ইহাদের অন্যতম। ইহা ছাড়াও কেন্দ্রীয় সরকারের অনুপ্রেরণায় বাৎসরিক নানাজাতীয় সম্মেলন হয়। এইগুলির মধ্যে রাজ্যপাল সম্মেলন, মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলন, প্রধান বিচারপতিগণের সম্মেলন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সম্মেলনগুলি কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য-সরকারগুলি—উভয় দিক দিয়াই গুরুত্বপূর্ণ। রাজ্যসরকারগুলির পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া তাহাদের মধ্যে সংহতি স্থাপনে এই সম্মেলনগুলি সাহায্য করে।

এতদ্ব্যতীত, পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে উভয় সরকারই নিজ নিজ ক্ষমতার কিয়দংশ অপরের উপর অর্পণ করিয়া সহযোগিতা সৃষ্টি করিতে পারে। পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে উভয় সরকারই অপরকে দেয় দান কর হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে।

তিনটি কারণে জরুরী অবস্থার উদ্ভব হইতে পারে। (১) আভ্যন্তরীণ বিশৃংখলা অথবা যুদ্ধ বা যুদ্ধের সম্ভাবনা ক্ষেত্রে, (২) রাজ্যগুলির শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থা সৃষ্টি হইলে ও (৩) ভারত বা ইহার কোন অংশের আর্থিক স্থায়িত্ব বা সুনাম নষ্ট হইলে রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিতে পারেন।

১নং ঘোষণাকালে ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন এককেন্দ্রীয় শাসনে পরবর্তিত হয়। এই সময়ে পার্লামেণ্ট রাজ্য তালিকাভুক্ত যে-কোন বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে পারে। এই সময়ে রাষ্ট্রপতি কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে পূর্ব-নির্ধারিত রাজস্ব বণ্টন ব্যবস্থা ও পরিবর্তন করিতে পারেন এবং নাগরিকগণকে মৌলিক অধিকারগুলি হইতে বঞ্চিত করিতে পারেন।

২নং ঘোষণাকালে রাষ্ট্রপতি সংশ্লিষ্ট রাজ্যের সমুদয় শাসনক্ষমতা নিজ হস্তে গ্রহণ করিতে পারেন এবং সেই রাজ্যের আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা পার্লামেণ্ট কর্তৃক গৃহীত হইবে।

৩নং ঘোষণাকালে রাজ্য সরকারের আয় ও ব্যয়-বরাদ্দ প্রস্তাবসমূহ রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য সংরক্ষিত থাকিবে এবং রাজ্য সরকারগুলির সকল শ্রেণীর কর্মচারীর বেতন হ্রাস করা যাইবে।

যুক্তরাষ্ট্র ও রাজ্যগুলির শাসন সম্পর্ক বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, কেন্দ্রীয় সরকার কি স্বাভাবিক অবস্থায় কি জরুরী অবস্থায় এত বিভিন্ন উপায়ে রাজ্য-সরকারগুলির শাসনকার্য নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে যে, এই ব্যবস্থার দ্বারা রাজ্যগুলির যুক্তরাষ্ট্র-সুলভ স্বাধীন সত্তা বহুল পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। তবে শাসনতন্ত্রের রচয়িতাগণ ভারতের পূর্ব-ইতিহাসের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ভারতের অসংখ্য অনৈক্যের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার মহৎ উদ্দেশ্যে সংবিধানে কেন্দ্রীয় প্রাধান্য ও অগ্রাধিকার প্রতিষ্ঠায় ইতস্ততঃ করেন নাই।

সংক্ষিপ্তসার

শাসন সম্পর্ক—শাসনতন্ত্র কর্তৃক স্বাভাবিক অবস্থায় ও জরুরী অবস্থায় কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে কিরূপ শাসন সম্পর্ক হইবে তাহা স্থির করিয়া দিয়াছে। স্বাভাবিক অবস্থায় নিম্নলিখিত উপায়গুলির মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারগুলির উপর উহার প্রভাব বিস্তার করে:— ১। নির্দেশ দান, ২। ক্ষমতা হস্তান্তরিত করিয়া, ৩। সর্বভারতীয় কৃত্যকের মাধ্যমে, ৪। আর্থিক সাহায্য দান করিয়া, ৫। আন্তঃরাজ্য পরিষদ গঠনের মাধ্যমে ও ৬। আন্তঃরাজ্য বাণিজ্য পরিষদ গঠন।

জরুরী অবস্থায় রাষ্ট্রপতি কোন রাজ্যের সমুদয় শাসন ক্ষমতা নিজহস্তে গ্রহণ করিতে পারেন।

প্রশ্নাবলী

1. Indicate clearly the administrative relations between the Union and the States in India.

2. State and comment on the administrative Relationship between the Union and the States of India.

সপ্তদশ অধ্যায়

ভারত যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃতি

(Nature of the Indian Federation)

ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় রাজ্যগুলির স্থান ও অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রের রাজ্যগুলির সহিত তুলনা (Position of the States in the Indian Union and a comparative study with the Position of the States in other Federations)

ভারতের নূতন শাসনতন্ত্র অনুসারে ভারতে একটি যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উপজাতি-অধ্যুষিত কয়েকটি বিশেষ এলাকা ব্যতীত ভারতরাষ্ট্রের আঞ্চলিক অংশগুলিকে রাজ্য বলা হয়। দুইটি বিভিন্ন পদ্ধতিতে সাধারণতঃ যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয়। পূর্ব-অবস্থিত কতকগুলি স্বাধীন রাষ্ট্র তাহাদের পৃথক রাষ্ট্রীয় সত্তা পরিত্যাগ করিয়া নূতন এক সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হইতে পারে। ইহাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় পদ্ধতি বলা হয়। অপরপক্ষে একটি এক-কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থাকে কতকগুলি আঞ্চলিক রাজ্যে বিভক্ত করিয়া একটি যুক্তরাষ্ট্রের সৃষ্টি হইতে পারে। ক্যানাডার যুক্তরাষ্ট্র এই পদ্ধতিতে গঠিত হইয়াছে। গঠনপদ্ধতির দিক দিয়া দেখিতে গেলে ভারতের যুক্তরাষ্ট্রকে ক্যানাডার যুক্তরাষ্ট্রের অনুরূপ বলিয়া মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভারতের যুক্তরাষ্ট্র মার্কিন ও ক্যানাডীয়—এই উভয় পদ্ধতির সংমিশ্রণে গঠিত হইয়াছে। বৃটিশ-শাসিত ভারতে মূলতঃ এককেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত ছিল। নূতন শাসনতন্ত্র এই এককেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থাকে কতকগুলি 'ক' শ্রেণীর আঞ্চলিক রাজ্যে পরিবর্তিত করিয়া ক্যানাডীয় পদ্ধতিতে একটি যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। অপরপক্ষে বৃটিশ-শাসিত ভারত সরকারের ক্ষমতা-বহির্ভূত দেশীয় রাজ্যগুলিকে 'খ' ও 'গ' শ্রেণীর আঞ্চলিক রাজ্যে পরিবর্তিত করিয়া পূর্বতন বৃটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যগুলির সমবায়ে এক নূতন যুক্তরাষ্ট্রের সৃষ্টি হইয়াছিল। সুতরাং গঠনপদ্ধতির দিক দিয়া দেখিতে গেলে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অভিনবত্ব সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

দ্বিতীয়তঃ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা প্রভৃতি দেশে যে সমুদয় আঞ্চলিক

রাজ্য লইয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় তাহারা সমক্ষমতা ও সমমর্যাদার অধিকারী। ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতের যুক্তরাষ্ট্র চারিটি বিভিন্ন শ্রেণীর আঙ্গিক রাজ্য লইয়া গঠিত হইয়াছিল এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত সম্পর্কে এই বিভিন্ন শ্রেণীর রাজ্যগুলির ক্ষমতা ও মর্যাদার তারতম্য পরিলক্ষিত হইত। এতদ্ব্যতীত ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের এমন কতকগুলি বিশেষ অংশ আছে যেগুলি সম্পূর্ণরূপে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল বলিয়া পরিচিত। এদিক দিয়া দেখিতে গেলে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের আঙ্গিক রাজ্যগুলির সহিত সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের পনেরটি প্রধান আঙ্গিক রাজ্য ব্যতীত অন্য তিন শ্রেণীর উপ বিভাগের সহিত একটি ক্ষীণ সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যাইত। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের পনেরটি প্রধান আঙ্গিক রাজ্য ব্যতীতও স্ব-শাসিত প্রজাতন্ত্র, স্ব-শাসিত প্রদেশ ও জাতীয় অঞ্চল বলিয়া পরিচিত তিন শ্রেণীর উপ-বিভাগ আছে এবং এই প্রত্যেকটি উপ বিভাগের পৃথক প্রতিনিধি-নির্বাচন অধিকার বর্তমান।

তৃতীয়তঃ, ক্ষমতা-বিভাগের দিক দিয়া দেখিতে গেলেও ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অভিনবত্ব প্রকটিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অস্ট্রেলিয়া সাধারণতন্ত্র হইতে পৃথক পদ্ধতিতে ভারতে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতার ভাগ করা হইয়াছে। মার্কিন দেশের ও অস্ট্রেলিয়ার কেন্দ্রীয় সরকার শাসনতন্ত্র-নির্ধারিত নির্দিষ্ট ক্ষমতার অধিকারী, আর রাজ্যসরকারগুলিকে অনুল্লিখিত ক্ষমতার অধিকারী করা হইয়াছে। সুইস্ দেশেও শাসনতন্ত্র কর্তৃক অর্পিত ক্ষমতাসমূহ ব্যতীত অবশিষ্ট ক্ষমতাসমূহের অধিকারী হইল ক্যান্টন সরকার-গুলি। কিন্তু ভারতের শাসনতন্ত্র ক্যানাডীয় পদ্ধতি অনুসারে সরকারের সমুদয় ক্ষমতাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় তালিকা, রাজ্য তালিকা ও যুগ্ম তালিকা—এই তিনভাগে ভাগ করিয়াছে। ভারতে কেন্দ্রীয় সরকারই হইল অনুল্লিখিত ক্ষমতার অধিকারী। ভারতে রাজ্যসরকারগুলির মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্র বা অস্ট্রেলিয়ার রাজ্যসরকারগুলির শাসনতন্ত্রের ন্যায় কোন নিজস্ব শাসনতন্ত্র নাই, যাহা তাহারা নিজ ইচ্ছানুসারে সংশোধন করিতে পারে। এ বিষয়ে ভারতের রাজ্য-গুলির পদমর্যাদা ক্যানাডীয় যুক্তরাষ্ট্রের সদস্য রাজ্যগুলির অনুরূপ। ভারতের রাজ্যসরকারগুলির গঠনপদ্ধতি ও ক্ষমতাসমূহ ভারতের শাসনতন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলিয়া পরিগণিত হয়।

চতুর্থতঃ, ভারতের শাসনতন্ত্রের একটি সম্পূর্ণ নিজস্ব বৈশিষ্ট্য হইল যে, এই

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা আদৌ অনমনীয় নহে। প্রয়োজন ক্ষেত্রে এই শাসন-ব্যবস্থাকে এককেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থায় সহজেই পরিবর্তিত করা যাইতে পারে। এই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া শাসনতন্ত্রের রচয়িতাগণ কেন্দ্রীয় সরকারকে বিশেষ অবস্থার সম্মুখীন হইবার জন্য বহু ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছেন। এই বিশেষ ক্ষমতার বলে রাষ্ট্রপতি ও কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্ট সভা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে রাজ্য-সরকারগুলির উপর প্রদত্ত ক্ষমতাসমূহ পরিচালনা করিতে পারিবেন। অন্য কোন দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের এরূপ ক্ষমতা-বাহুল্য পরিদৃষ্ট হয় না।

পঞ্চমতঃ, ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীভাবের এরূপ আতিশয্য দেখা যায়, যাহা অস্ট্রেলিয়া এমন কি ক্যানাডা বা সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থায়ও দেখা যায় না। ভারতে যে সর্বভারতীয় নিয়োগ সংসদ (Union Public Service Commission) আছে, তাহা কেন্দ্রীয় সরকারের কার্য সম্পাদনের জন্য লোক নিয়োগ করে। কিন্তু সর্বভারতীয় নিয়োগ সংসদ কর্তৃক মনোনীত কর্মচারী রাজ্যসরকারগুলির শাসনকার্য পরিচালনা করিয়া থাকেন। দ্বিতীয়তঃ, সমগ্র ভারতের (যুক্তরাষ্ট্রীয় ও রাজ্য সম্পর্কিত) জন্য একটিমাত্র নির্বাচন সংসদ (Election Commission) আছে। এই সংসদ সমুদয় নির্বাচন ব্যাপার পরিচালনা করেন। তৃতীয়তঃ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত কেন্দ্রীয় প্রধান হিসাব পরীক্ষক রাজ্যসরকারগুলির আয়ব্যয়ের পরীক্ষা করিয়া থাকেন। চতুর্থতঃ রাজ্যপালগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া থাকেন এবং রাজ্যপাল ইচ্ছা করিলে রাজ্য আইনসভাগুলি কর্তৃক অনুমোদিত খসড়া আইনগুলিকে রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করিতে পারেন। একমাত্র ক্যানাডা ব্যতীত অন্য কোন যুক্তরাষ্ট্রে এরূপ ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায় না। উপরি উক্ত কেন্দ্রপ্রাধান্য ভারতের রাজ্য সরকারগুলির দুর্বলতা ও অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট পদমর্যাদা সূচিত করে।

ষষ্ঠতঃ, সমগ্র ভারতে এক অখণ্ড ভারতীয় নাগরিকত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সুইস দেশে নাগরিকগণের দ্বিবিধ নাগরিকত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতের নাগরিকত্ব অর্জন বা বর্জন-সম্পর্কিত আইন-প্রণয়ন ও পরিবর্তন করিবার একমাত্র অধিকারী হইল পার্লামেণ্ট সভা। এতদ্ব্যতীত যুক্তরাষ্ট্রগুলির মধ্যে ভারতের শাসনতন্ত্র অনমনীয় হইলেও ইহাই একমাত্র শাসনতন্ত্র যাহার পরিবর্তন অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য।

পরিশেষে বলা যায় যে, ভারতের শাসনতন্ত্র সমগ্র ভারতের জন্য একই প্রকারের ফৌজদারী ও দেওয়ানী কার্যবিধি প্রবর্তন করিয়াছে এবং সমগ্র ভারতের জন্য একই বিচারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। ভারতের সুপ্রিম কোর্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টের ন্যায় শুধুমাত্র শাসনতন্ত্রের রক্ষক নহে। ইহা ভারতের রাজ্যগুলি হইতে আনীত আপীল মামলার বিচার করিবার সর্বোচ্চ আদালত।

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে স্বভাবতঃই মনে হয় যে, যুক্তরাষ্ট্রের যে প্রচলিত সংজ্ঞা আছে, ভারতে প্রতিষ্ঠিত যুক্তরাষ্ট্র সে সংজ্ঞা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীভাবের আতিশয্যের জন্য ইহাকে একটি নিখুঁত যুক্তরাষ্ট্র আখ্যা না দিয়া যুক্তরাষ্ট্রের অনুরূপ একটি শাসনব্যবস্থা বলা অধিকতর যুক্তিযুক্ত। ভারতের অতীত ও বর্তমান ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিলে মনে হয় যে, শাসনতন্ত্রের রচয়িতাগণ এই নবীন যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া দূরদর্শিতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। অসংখ্য অনৈক্যের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করিবার প্রচেষ্টা রাষ্ট্রব্যবস্থায় স্থায়িত্ব ও দৃঢ়তা আনয়ন করিবে। সকল যুক্তরাষ্ট্রেই অল্পবিস্তর পরিমাণ কেন্দ্রপ্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। এমন কি যুক্তরাষ্ট্রগুলির মধ্যে আদর্শস্থানীয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমান যুগে কেন্দ্র-প্রাধান্য বিচারবিভাগীয় নির্দেশ দ্বারা অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারতের ক্ষেত্রে এই কেন্দ্রপ্রাধান্য অপরিহার্য। যে সমস্ত বৈশিষ্ট্যের দ্বারা যুক্তরাষ্ট্রকে এককেন্দ্রীয় রাষ্ট্র হইতে পৃথক করা যায়, যথা, ক্ষমতার বিভাগ, লিখিত ও অনমনীয় শাসনতন্ত্র, নিরপেক্ষ উচ্চ বিচারালয়—তাহার সবগুলিই ভারতে বর্তমান। একমাত্র কেন্দ্রপ্রাধান্যের জন্য ইহাকে যুক্তরাষ্ট্র আখ্যা না দেওয়া সমীচীন নহে।

ভারতের শাসনতন্ত্রের যুক্তরাষ্ট্রীয় ও এককেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্য (Federal and Unitary Features of the Indian Constitution)

ভারতের শাসনতন্ত্রের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি বিশ্লেষণ করিলে স্পষ্টতঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার অন্তরালে এই শাসনতন্ত্রে এককেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার একাধিক নিদর্শন বর্তমান রহিয়াছে। বস্তুতঃ, এই শাসনতন্ত্র এককেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা ও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার সংমিশ্রণে গঠিত হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি এই শাসনতন্ত্রে স্থান পাইলেও ইহার কেন্দ্রীভাবের আতিশয্য কাহারও দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারে না।

যুক্তরাষ্ট্রীয় বৈশিষ্ট্য (Federal Features)

ভারতের যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম ও প্রধান যুক্তরাষ্ট্রীয় বৈশিষ্ট্য হইল যে, অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় এই যুক্তরাষ্ট্রেও কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতার ভাগ ও বণ্টন (Division and Distribution of Powers) হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, একটি বিশদভাবে লিখিত শাসনতন্ত্র কর্তৃক ক্ষমতা বিভক্ত হইয়াছে। অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রের ন্যায় ভারতের শাসনতন্ত্র শুধু লিখিত নয়, সাধারণভাবে বলিতে গেলে এই শাসনতন্ত্র অনমনীয়ও বটে। তৃতীয়তঃ, অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার মত ভারতেও একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই বিচারালয় শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে এবং কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকারগুলির মধ্যে শাসনতন্ত্র-সম্পর্কিত বিবাদের মীমাংসা করে। চতুর্থতঃ, এই শাসনতন্ত্রে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকারগুলির মধ্যে কিছু পরিমাণে রাজস্ব বণ্টনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি ইহাতে স্থান পাইয়াছে।

এককেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য (Unitary Features)

ভারতের শাসনতন্ত্রের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি হইতে ইহার মূলতঃ এককেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার প্রবণতা প্রকটিত হয়।

প্রথমতঃ, বলা যায় যে, ভারতের শাসনতন্ত্র একটি পূর্ণাঙ্গ লিখিত শাসনতন্ত্র। এই শাসনতন্ত্র দ্বারা শুধু কেন্দ্রীয় সরকারের গঠন, প্রকৃতি ও কার্যক্ষেত্র নির্ধারিত হয় নাই, পরন্তু রাজ্যসরকারগুলিও এই একই শাসনতন্ত্র দ্বারা নির্ধারিত হয়। রাজ্যসরকারগুলির নিজস্ব কোন পৃথক শাসনতন্ত্র গঠন বা পরিবর্তন করিবার ক্ষমতা নাই। দ্বিতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল সদস্য রাজ্যগুলির রাজনৈতিক সমতা (Political equality of States); ভারতের যুক্তরাষ্ট্রে এই নীতি সম্পূর্ণভাবে কার্যকরী করা হয় নাই। তৃতীয়তঃ, ভারতের যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতা-বণ্টন-নীতি যেরূপভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে তাহাতে কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির শাসনভার অর্পিত হইয়া কেন্দ্রীয় সরকারের একাধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। চতুর্থতঃ, ভারতের শাসনতন্ত্রে একটি সুদীর্ঘ যুগ্ম বিষয়ের তালিকা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে এবং ক্ষমতা-বণ্টন ব্যাপারে অবশিষ্ট ক্ষমতাসমূহ কেন্দ্রীয় সরকারের উপর ন্যস্ত হইয়াছে। এই উভয় ব্যবস্থা দ্বারা রাজ্যসরকারগুলির যুক্তরাষ্ট্র-

সুলভ স্বাধীন সত্তা ক্ষুণ্ণ করা হইয়াছে। পঞ্চমতঃ, সমগ্র ভারতের জন্য একদফা নাগরিকত্ব, একটি মাত্র আপীল আদালত ও একটিমাত্র নির্বাচন সংসদ প্রতিষ্ঠা দ্বারা এই শাসনতন্ত্রের কেন্দ্রীভাবের আতিশয্য সূচিত হয়। ষষ্ঠতঃ, রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জরুরী অবস্থা ঘোষণাকে এই যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থাকে অনায়াসে এককেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থায় পরিবর্তিত করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক রাজ্য সরকারগুলির শাসনকার্য পরিচালিত হইতে পারে। অন্য কোন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। পরিশেষে ভারতের শাসনতান্ত্রিক আইনানুসারে ভারতের যে কোন রাজ্যের সীমানা কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্ট সভা কর্তৃক পরিবর্তিত হইতে পারে। উপরি-উক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি হইতে স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয় যে, ভারতের যুক্তরাষ্ট্র মূলতঃ এককেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার আদর্শে গঠিত হইয়াছে।

সংক্ষিপ্তসার

নূতন শাসনতন্ত্র অনুসারে ভারতে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল একসঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার ও ১৬টি রাজ্য সরকারের অবস্থিতি এবং অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতার ভাগ ও বন্টন হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, একটি লিখিত শাসনতন্ত্র দ্বারা ক্ষমতা বিভক্ত হইয়াছে। অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রের ন্যায় ভারতের শাসনতন্ত্র শুধু লিখিত নয়, সাধারণভাবে বলিতে গেলে এই শাসনতন্ত্র অনমনীয়ও বটে। তৃতীয়তঃ, অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় ভারতেও একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। চতুর্থতঃ, এই শাসনতন্ত্রের কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে কিছু পরিমাণে রাজস্ব বন্টনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি ভারতের শাসনব্যবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়।

কিন্তু ভারতের শাসনতন্ত্রের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার অন্তরালে এই শাসনতন্ত্রে এককেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার একাধিক নিদর্শন রহিয়াছে। প্রথমতঃ, ভারতে একই শাসনতন্ত্র দ্বারা কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির গঠন, প্রকৃতি ও কার্যক্ষেত্র স্থির হইয়াছে রাজ্য সরকারগুলির নিজস্ব কোন পৃথক শাসনতন্ত্র গঠন বা পরিবর্তনের ক্ষমতা

নাই। দ্বিতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য—রাজ্যগুলির মধ্যে রাজনৈতিক সমতা—এই শাসনতন্ত্রে কার্যকরী করা হয় নাই। তৃতীয়তঃ, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতা-বণ্টন নীতি এরূপভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে যে, কেন্দ্রীয় সরকারের উপর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির শাসনভার অর্পিত হইয়া কেন্দ্রীয় সরকারের একাধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। চতুর্থতঃ ভারতের শাসনতন্ত্রের একটি যুগ্ম বিষয়ের তালিকা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে ও ক্ষমতা বণ্টন ব্যাপারে অবশিষ্ট ক্ষমতাসমূহ কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। এই উভয় ব্যবস্থার দ্বারা রাজ্য সরকারগুলির যুক্তরাষ্ট্র-সুলভ স্বাধীন সত্তা ক্ষুণ্ণ করা হইয়াছে। পঞ্চমতঃ, সমগ্র ভারতের জন্য একদফা নাগরিকত্ব, একটি মাত্র আপীল আদালত ও একটিমাত্র নির্বাচন সংসদ প্রতিষ্ঠা দ্বারা এই শাসনতন্ত্রের এককেন্দ্রীয় ভাব সূচিত হয়। ষষ্ঠতঃ, রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জরুরী অবস্থা ঘোষণা কালে এই যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থাকে এককেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থায় পরিবর্তিত করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক রাজ্যসরকারগুলির শাসনকার্য পরিচালিত হইতে পারে। অন্য কোন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল।

প্রশ্নাবলী

1. Discuss the nature of Indian Federation.

2. Would we be justified in stating that Indian Federalism is not federalism proper?

3. "Indian constitution is federal in form but unitary in substance." Discuss.

অষ্টাদশ অধ্যায়

ভারতে দলব্যবস্থা

(Party System in India)

যে সমস্ত দেশে পার্লামেণ্টারি শাসনব্যবস্থা প্রচলিত আছে সেখানে দলীয় শাসনের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। বৃটেনে দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থার সাফল্যের প্রধান কারণ হইল তাহার দলীয় ব্যবস্থা—বিশেষ করিয়া তাহার দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার জন্যই বৃটেনের রাজনৈতিক জীবনের স্বাভাবিক গতি খুব কমই ব্যাহত হইয়াছে। অপরপক্ষে, বহুদলের অস্তিত্বের জন্য ফরাসী দেশের শাসন-ব্যবস্থা অনেক পরিমাণে দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। পার্লামেণ্টারি পদ্ধতিতে ভারতের শাসনব্যবস্থা গঠিত হইয়াছে, সুতরাং শক্তিশালী ও কর্মক্ষম সরকার গঠন করিবার জন্য ভারতে যে রাজনৈতিক দলের প্রয়োজনীয়তা আছে একথা অস্বীকার করা চলে না।

পরাধীন জাতির কোন রাজনীতি থাকিতে পারে না বলিয়া যে উক্তিটি প্রচলিত আছে তাহা অংশতঃ সত্য বলিয়া মনে হয়। ভারত যতদিন পরাধীন ছিল, ততদিন প্রকৃতপক্ষে এদেশে কোন প্রকৃত রাজনৈতিক দলের অভ্যুত্থান হইতে পারে নাই। বৃটিশ শাসনকালে ভারতে যে-সমস্ত রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব দেখা যাইত, তন্মধ্যে এক জাতীয় কংগ্রেস সভা ব্যতীত অন্যান্য তথাকথিত রাজনৈতিক দলগুলি তাহাদের দলীয় অথবা সাম্প্রদায়িক স্বার্থসাধনের নিমিত্ত অধিকতর যত্নবান্ ছিল। অশিক্ষা, পরাধীনতা ও সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির জন্য ভারতীয় জনগণের মধ্যে প্রকৃত দেশাত্মবোধ জাগ্রত হইতে পারে নাই। দেশাত্মবোধের অভাবে কোন রাজনৈতিক দল গঠিত হইতে পারে না, কারণ, রাজনৈতিক দলের প্রধান উদ্দেশ্য হইল জাতীয় স্বার্থের উৎকর্ষ সাধন করা। সুতরাং যে দেশের জনসাধারণের মধ্যে এই জাতীয়তাবোধের অভাব থাকে, সে দেশে প্রকৃত রাজনৈতিক দল গঠিত হইতে পারে না। দেশ স্বাধীন হওয়ার ফলে ধীরে ধীরে জনসাধারণের মধ্যে এই জাতীয়তাবোধ জাগরিত হইতেছে। বর্তমানে ভারতে যে কয়েকটি রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে কংগ্রেস সভাই হইল সর্বপ্রধান।

জাতীয় মহাসভা কংগ্রেস (The National Congress)

একাধিক কারণে ভারতের জাতীয় জীবনে কংগ্রেস সভা একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে কংগ্রেস সভা যে শুধু সর্বাপেক্ষা প্রাচীন তাহা নয়, এই বিশাল দেশের অজ্ঞ ও দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগরিত করিয়া পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন করিতে এই রাজনৈতিক দলটি যে ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে, পৃথিবীর ইতিহাসে তাহা বিরল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, পরবর্তী যুগের উগ্রজাতীয়তাবাদী কংগ্রেস তাহার সৃষ্টির প্রথম পর্যায়ে অত্যধিক পরিমাণে একটি রাজভক্ত প্রতিষ্ঠান ছিল। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে য়্যালান্ অক্টাভিয়ান হিউম নামক জনৈক ইংরাজ কর্মচারীর উদ্যোগে এই প্রতিষ্ঠানটির জন্ম হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরে মহাত্মা গান্ধী যখন কংগ্রেসে যোগদান করিয়া ইহার অবিসংবাদী নেতারূপে স্বীকৃত হইলেন, তখন হইতেই কংগ্রেসের জীবনেতিহাসের দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু হইল। সমগ্র জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস সভার মধ্য দিয়া মূর্ত হইয়া উঠিল। বৃটিশ শাসনকালে কংগ্রেস সভাই ছিল একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান যাহা সমগ্র জাতির মুখপাত্র হিসাবে বিশ্বের দরবারে ভারতের জাতীয় অধিকারের দাবী জানাইতে সক্ষম ছিল। কংগ্রেস সভা ভারতের সর্বসম্প্রদায়, সর্বশ্রেণীর, সর্বধর্মমতাবলম্বী ও বিভিন্ন স্বার্থের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত হইয়াছিল। জাতিধর্মনির্বিচারে যে-কোন ব্যক্তি বাৎসরিক চার আনা চাঁদা দিতে সমর্থ, সেই কংগ্রেসের সদস্য হইবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইত। বৃটিশ শাসনকালে কংগ্রেস সভার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ভারতে বৃটিশ শাসনের অবসান। পরাধীন ও নিরস্ত্র জাতির পক্ষে বৃটিশ সরকারের মত একটি প্রথম শ্রেণীর ক্ষমতাশালী সরকারের সহিত যুদ্ধ করিয়া স্বাধীনতা অর্জন করা যে কতটা দুঃসাধ্য কংগ্রেস তাহা ভারতীয় জনসাধারণের অধিকাংশকে বুঝাইতে সমর্থ হইয়াছিল। এইজন্য মহাত্মা গান্ধী-প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলন, প্রভৃতি শান্তিপূর্ণ পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া কংগ্রেস নিরস্ত্রভাবে বিদেশী সরকারের সহিত যুদ্ধ পরিচালনা করিয়াছে। অবশ্য অনেকের মতে কংগ্রেস-অনুসৃত নীতি যে সম্পূর্ণ নির্ভুল ছিল তাহা নয় এবং ভারতের বহু জনপ্রিয় নেতা এই অহিংসনীতি বর্জন করিয়া হিংসার পথে দেশের স্বাধীনতা অর্জন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

স্বাধীনতা অর্জনের জন্য কংগ্রেসের ঐকান্তিক চেষ্টা ও ত্যাগস্বীকার ফলপ্রসূ হইলেও স্বাধীনতা লাভকালে কংগ্রেসের মূল আদর্শ অনেক পরিমাণে ক্ষুণ্ণ

হইয়াছে। এত চেষ্টা সত্ত্বেও কংগ্রেস হিন্দু-মুসলমান বিরোধের সন্তোষজনক মীমাংসা করিতে পারে নাই এবং শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসকে বিদেশী শাসকের নির্দেশ অনুসারে ভারতবিভাগ স্বীকার করিয়া লইতে হইয়াছে।

স্বাধীনতালাভের পর সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে কংগ্রেস দলই শাসন-ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইয়াছে। অন্যান্য রাজনৈতিক দল অপেক্ষা কংগ্রেস দলের কেন্দ্রীয় ও রাজ্য আইনসভাগুলিতে এত অধিক সংখ্যক সমর্থক আছে যে, এই দলের পক্ষে সরকার গঠন করিতে কোনরূপ অসুবিধা হয় নাই। ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে সার্বজনীন ভোটাধিকার ভিত্তিতে ভারতে যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে দেখা যায় যে, লোকসভা এবং বিভিন্ন রাজ্যের ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে কংগ্রেস সমগ্র আসনসংখ্যার প্রায় তিন-চতুর্থাংশ অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় আইনসভা ও রাজ্য আইনসভাগুলিতে কংগ্রেস দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেখিয়া ইহা যে সর্বাধিক জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান, এ সিদ্ধান্ত করা যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ, দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, বিগত ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে লোকসভার নির্বাচনে কংগ্রেস শতকরা কিঞ্চিদধিক ৪০ ভোট পাইয়াও শতকরা ৭০টির উপর আসনলাভে সমর্থ হয়। ভারতের অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলি যদি তাহাদের বিভেদ ভুলিয়া সংঘবদ্ধভাবে কংগ্রেসের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিত, তাহা হইলে নির্বাচনে কংগ্রেসের সংখ্যাধিক্য বজায় রাখা কষ্টকর হইত। তবে ইহা সত্ত্বেও বলিতে হইবে যে, কংগ্রেস সভা ভারতের একমাত্র সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় রাজনৈতিক দল এবং কংগ্রেসের এই জনপ্রিয়তার কারণ হইল, কংগ্রেসের মহাত্মা গান্ধীর স্মৃতিবিজড়িত ঐতিহ্য এবং পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর বিরাট ব্যক্তিত্ব—যে ব্যক্তিত্বের প্রভাব বর্তমানে ভারতের সীমা অতিক্রম করিয়া সমগ্র জগতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। ১৯৬২ সালের তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনেও কংগ্রেস কেন্দ্রে ও রাজ্যগুলিতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিয়াছে।

জাতীয় কংগ্রেসের বর্তমান নীতি (Present Policy of the National Congress)

১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের যে নূতন গঠনতন্ত্র রচিত হয় তাহাতে কংগ্রেসের উদ্দেশ্য নিম্নলিখিতভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে: "ভারতের জনগণের কল্যাণ ও অগ্রগতির উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক শান্তি ও সৌহার্দ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সকলের জন্য সমান সুযোগ ও সমান রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক

অধিকারের ভিত্তিতে শান্তিপূর্ণ ও আইনসম্মত পদ্ধতির সাহায্যে ভারতে একটি সহযোগিতামূলক সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা।" সংক্ষেপে বলা যায় যে, ভারতে একটি সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে গঠিত সমাজব্যবস্থা প্রবর্তন করাই হইল কংগ্রেসের বর্তমান নীতি।

১৯৬২ খৃষ্টাব্দের সাধারণ নির্বাচনের পূর্বে কংগ্রেস যে নির্বাচনী ইস্তাহার প্রচার করে তাহাতে নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যগুলি কংগ্রেসের কার্যসূচীতে স্থান পায়।

কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ নীতি হইল ভারতে একটি স্বাধীন, সাম্প্রদায়িকতা-বর্জিত ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র গঠন করা। মদ্যপান বর্জন, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, পরিবার পরিমিতায়ন ও জন্ম-নিয়ন্ত্রণ করিতে জনসাধারণকে উৎসাহিত করা। সম্ভব ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যক্ষেত্র সম্প্রসারণ করা, কর্ম-সংস্থান বৃদ্ধি করা, অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের মূল্য স্থির রাখা, বিলাস ও অনাবশ্যক দ্রব্যের উৎপাদন হ্রাস করা, শিশু মঙ্গল প্রতিষ্ঠা করা। যোগ্য ছাত্রদের শিক্ষাকল্পে সাহায্য করা, বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি করা প্রভৃতি হইল ইহার কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত। সুসম কর-ব্যবস্থার সাহায্যে আয়-বৈষম্য হ্রাস করিয়া সঞ্চয় পরিমাণ বৃদ্ধি করা এবং সঞ্চিত অর্থকে অধিক উৎপাদনে নিয়োজিত করা কংগ্রেসের কার্যসূচীর অন্যতম উদ্দেশ্য। এক কথায় জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান সর্ববিধ উপায়ে উন্নত করাই হইল কংগ্রেসের মূলনীতি।

বৈদেশিক সম্পর্কে কংগ্রেস শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান নীতির উপাসক। কোন সামরিক জোটে যোগদান করা কংগ্রেসের নীতিবিরুদ্ধ এবং এজন্য কংগ্রেস কোন দেশের সহিত সামরিক চুক্তি আবদ্ধ নীতি গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক। নিরপেক্ষ শান্ত হইল কংগ্রেসের পররাষ্ট্র নীতির মূল সূত্র এবং এ সম্পর্কে কংগ্রেস ইহার বিদেশী প্রভাব বর্জিত স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণ করে। কংগ্রেস সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটাইতে চায় এবং যে কোন প্রকারে হউক না কেন পৃথিবীতে নিরস্ত্রীকরণ অবস্থা প্রবর্তনের সমর্থন করে। ভারতের যে সমস্ত অংশগুলি অন্যায়রূপে চীন ও পাকিস্তান কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছে, ভারত সেগুলি পুনরুদ্ধার করিবার জন্য সচেষ্ট।

কংগ্রেসের সংগঠন (Organisation of the Congress)

প্রাথমিক (Primary) ও সক্রিয় (Active) এই দুই জাতীয় সদস্য লইয়া বর্তমানে কংগ্রেস গঠিত। ১৮ বৎসর বয়স্ক যে কোন ব্যক্তি কংগ্রেসের মূলনীতিতে

আস্থাবান এই লিখিত শপথ গ্রহণ করিয়া কংগ্রেসের প্রাথমিক সদস্য হইতে পারে। এরূপ সদস্যকে বাৎসরিক ২৫ পয়সা চাঁদা দিতে হয়। কেবলমাত্র সেই সকল ব্যক্তিই কংগ্রেসের সক্রিয় সদস্য হইতে পারেন, যাঁহাদের বয়স ২১এর উর্ধ্বে এবং যাঁহারা মদ্যপান করেন না, যাঁহারা হস্তনির্মিত খাদি ব্যবহার করেন এবং সকলের সমানাধিকার ও সাম্প্রদায়িক ঐক্যে বিশ্বাস করেন। ইঁহাদের বাৎসরিক ১৲ টাকা চাঁদা দিতে হয় এবং ইঁহারাই গ্রাম বা মহল্লা কংগ্রেসের উপরের পর্যায়ের সংগঠনগুলির সভ্য হইতে পারেন।

গ্রাম বা মহল্লা কংগ্রেস হইল প্রাথমিক সংগঠন। ইহার উপরে জেলা কংগ্রেস কমিটি ও তাহার উপরে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি। সর্বোপরি হইল সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটি। ইহা ছাড়া কংগ্রেসের একজন সভাপতি ও সভাপতির একটি কার্যকরী সংস্থা (Working Committee) আছে। বর্তমানে সভাপতি তিন বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন এবং সভাপতিই তাঁহার কার্যকরী সংস্থার সদস্যগণকে মনোনীত করেন। ইহা ছাড়া, তিনি দুইজন সাধারণ সম্পাদক ও একজন কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। ১৯৭৭ খৃষ্টাব্দ হইতে এলাহাবাদ হইতে কংগ্রেসের প্রধান কার্যালয় দিল্লীতে স্থানান্তরিত হইয়াছে।

সরকারী ও বে-সরকারী কংগ্রেসের সম্পর্ক (Relationship between the Official and Non-Official Congress)

কংগ্রেস দলই ভারতের রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে সর্বপ্রধান। এই দলই শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। সুতরাং এই দলের যে সমস্ত নেতৃ-স্থানীয় ব্যক্তি কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারগুলির শাসনকার্য পরিচালনা করিতেছেন এবং যে সমস্ত নেতা সরকারী কার্যে লিপ্ত না থাকিয়া বাহিরে দল সংগঠনে ও নীতি নির্ধারণে লিপ্ত আছেন—এই উভয়ের সহযোগিতার উপরই দলীয় নীতি ও কার্যসূচীর সাফল্য বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর যখন কংগ্রেস দল ক্ষমতায় আসীন হইল, তখন হইতে সরকারী ও বে-সরকারী কংগ্রেসের মধ্যে প্রায়ই মতানৈক্য ঘটিতে দেখা দিয়াছে এবং এই মতানৈক্য এরূপ চরম আকার ধারণ করে যে, কয়েকজন কংগ্রেস সভাপতি সরকারী কংগ্রেসের অত্যধিক ক্ষমতাপ্রিয়তার জন্য পদত্যাগ করেন। এই মতানৈক্য দূর করিবার উদ্দেশ্যে স্থির হয় যে, পার্লামেন্টে কংগ্রেস দলের নেতাই কংগ্রেস দলের

সভাপতি হইবেন এবং এই সিদ্ধান্তের ফলে পণ্ডিত নেহরু কিছুকাল পর্যন্ত এই উভয়পদ অলংকৃত করিয়াছিলেন। কিন্তু একই ব্যক্তির পক্ষে এইরূপ গুরু-দায়িত্বপূর্ণ দুইটি কাজের ভার বহন করা সম্ভব নয় বলিয়া বর্তমানে দুইজন পৃথক ব্যক্তি এই দুইটি পদের ভার গ্রহণ করেন। কংগ্রেসের সরকারী ও বে সরকারী শাখার বিরোধ সমাধানের উদ্দেশ্যে বর্তমানে স্থির হইয়াছে যে, বে-সরকারী কংগ্রেস সরকারী কার্যে হস্তক্ষেপ না করিয়া প্রচারকার্যের সাহায্যে দলীয় সংগঠনের শক্তি বৃদ্ধি এবং নির্বাচন ব্যাপারে সাফল্য অর্জনের কার্যে নিয়োজিত থাকিবে। অপরপক্ষে সরকারী কংগ্রেস শাসন-সংক্রান্ত কার্য পরিচালনা করিবে।

ভারতের সাম্যবাদী দল (Communist Party of India)

ভারতীয় সাম্যবাদী দল রুশীয় সাম্যবাদী আদর্শের ভিত্তিতে ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে গঠিত হইয়াছিল। ইহারা ভারতে রুশীয় পদ্ধতিতে সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা গঠন করিবার মত পোষণ করেন। বহু উচ্চশিক্ষিত ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি এই দলের সমর্থক। এতদ্ব্যতীত কৃষি, শিল্প, ব্যবসায় বাণিজ্যে নিযুক্ত বহু শ্রমিক এই দলের অনুগামী। এই দলের বহু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি পূর্বে কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন। কিন্তু পরে কংগ্রেস-প্রবর্তিত অহিংসনীতিতে আস্থাহীন হইয়া এবং রুশীয় সাম্যবাদীগণের অনুসৃত কার্যক্রমের বিরাট সাফল্যে আকৃষ্ট হইয়া সাম্যবাদী দলে যোগদান করেন। এই দলের প্রধান উদ্দেশ্য হইল ভারতেও সোভিয়েট ব্যবস্থার অনুরূপ এক শ্রেণীহীন ও শোষণমুক্ত সমাজব্যবস্থা প্রবর্তন করা। ইহাদের কার্যক্রমের তালিকা হইল বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারীপ্রথার উচ্ছেদসাধন শিল্পগুলির জাতীয়করণ, ভাষাভিত্তিক রাজ্যগঠন, অনুন্নত শ্রেণীর উন্নয়ন ও উদ্বাস্তুদের বিনা খরচায় পুনর্বাসন।

বিগত নির্বাচনে ভারতের সাম্যবাদী দল কংগ্রেসের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া আইনসভায় অন্যান্য দল অপেক্ষা অধিক সংখ্যক আসন দখল করিতে সমর্থ হয়। লোকসভায় এই দলের ২৯ জন সদস্য নির্বাচিত হন। মাদ্রাজ, কেরল, হায়দরাবাদ ও পশ্চিমবঙ্গের কলিকাতা প্রভৃতি কতকগুলি স্থানে সাম্যবাদী দলের বিশেষ প্রভাব-প্রতিপত্তি আছে। কেরল রাজ্যে সাম্যবাদী দল কর্তৃক মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছিল। বর্তমানে সাম্যবাদী দলের মধ্যে মত-বিরোধের ফলে দলটি দ্বিধাবিভক্ত হইয়া দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী—দুইটি উপদলের

অভ্যুত্থান ঘটিয়াছে। দক্ষিণপন্থীরা রুশপন্থী, বামপন্থীরা চীনপন্থী। এই বিভেদের জন্য ভারতে সাম্যবাদী দলের সংহতি বিনষ্ট হইয়াছে।

সাম্যবাদী দলের বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইঁহারা দেশের স্বার্থ অপেক্ষা দলীয় স্বার্থের উপর অধিকতর গুরুত্ব দান করেন এবং সোভিয়েত দেশকেই ইঁহারা ইঁহাদের উপদেষ্টা ও পথপ্রদর্শক বলিয়া মনে করেন। সাম্যবাদিগণের প্রধান কর্মসূচী হইল শ্রমিকদের জীবনধারণোপযোগী মজুরী দেওয়া, জাতীয় মূলধন সাহায্যে শিল্পোন্নয়ন করা, বৃটিশ সাধারণতন্ত্রের সহিত ভারতের সম্পর্ক ছেদ করা, বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন, ভাষার ভিত্তিতে রাজ্যগুলির পুনর্গঠন, সিংহল, নেপাল, পাকিস্তান প্রভৃতি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ চুক্তি সম্পাদন ইত্যাদি।

সাম্যবাদী নীতিতে আস্থাবান এবং দলের সক্রিয় কর্মী হিসাবে কাজ করিতে ইচ্ছুক এরূপ ১৮ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তি সাম্যবাদী দলের সদস্য হইতে পারে। ২।৩ জন সদস্য লইয়া দলের প্রাথমিক সংগঠন 'সেল্' (Cell) গঠিত হয়। ইঁহারাই সাম্যবাদী নীতি জনসাধারণের নিকট প্রচার করেন। ইহার উপরে গ্রাম বা জেলার সংগঠন, তাহার উপর রাজ্যসংগঠন। সর্বভারতীয় সাম্যবাদী সংস্থা হইল সাম্যবাদী দলের সর্বোচ্চ জাতীয় সংগঠন। এই সংস্থাই দলের কেন্দ্রীয় কার্যকরী সমিতি (Central Executive Committee) এবং দলের সাধারণ সম্পাদক (General Secretary) নির্বাচন করে।

স্বতন্ত্র দল (Swatantra Party)

১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে শ্রীরাজাগোপালাচারীর নেতৃত্বে এই দল গঠিত হয়। সাম্যবাদীদলের পরই এই দলের স্থান। বিগত নির্বাচনে এই দল লোকসভায় ১৮টি আসন লাভ করিয়াছে।

এই দলের নীতি হইল কংগ্রেস দলের সমাজতান্ত্রিক নীতির বিরোধিতা করা। এই দল ভারতীয় আদর্শে ধর্মের ভিত্তিতে সমাজব্যবস্থার পুনর্গঠনের পক্ষপাতী। ইঁহারা বিদেশী ঋণ গ্রহণের পরিবর্তে দেশীয় মূলধনের সাহায্যে শিল্পের উন্নতি চান এবং কৃষি ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উন্নতির উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেন। পররাষ্ট্র সম্পর্কে ইঁহারা ভারতের বর্তমান নিরপেক্ষ নীতি বর্জন করিবার পক্ষপাতী।

প্রজা-সমাজতন্ত্রী দল (Proja-Socialist Party)

এই দলটি দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বী দলের মিলনে গঠিত হইয়াছে। কৃষক-মজদুর প্রজা দল এবং সমাজতন্ত্রী দল ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের নির্বাচনে বিশেষভাবে পরাজিত হইয়া সম্মিলিতভাবে প্রজা-সমাজতন্ত্রী দল গঠন করিয়াছে। এই দলের নেতৃস্থানীয় অধিকাংশ সদস্যই পূর্বে কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর তিরোভাবের পর কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ মতবিরোধের ফলে ইঁহারা দলত্যাগ করিয়া নূতন দল গঠন করেন। ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে সুভাষবাদী ফরওয়ার্ড ব্লকের এক অংশ এই দলে যোগদান করিয়া ইহার শক্তি বৃদ্ধি করে। ১৯৬২ সালের নির্বাচনে এই দল লোকসভার নির্বাচনে ১২টি আসন দখল করে।

এই দলের সমর্থকগণ মহাত্মা গান্ধী-প্রবর্তিত আদর্শে বিশেষ আস্থাবান। ইঁহারা মহাত্মা গান্ধী-প্রবর্তিত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের পক্ষপাতী এবং এই উদ্দেশ্যে ইঁহারা জমিদারী-প্রথার উচ্ছেদ, কুটির-শিল্পের উন্নতি ও প্রসার এবং মূল শিল্পগুলির জাতীয়করণ নীতি সমর্থন করেন।

হিন্দু মহাসভা (Hindu Mahasava)

ভারতের রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে হিন্দু মহাসভা অপেক্ষাকৃত পুরাতন রাজনৈতিক দল। সমাজব্যবস্থার সংস্কারসাধন করা এই দলের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হইলেও পরবর্তী কালে এই দল ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। পরবর্তী কালে এই দল উগ্র সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন হইয়া উঠে ও মুস্লিম লীগের বিপরীত দল হিসাবে হিন্দুর স্বার্থসংরক্ষণে বিশেষ যত্নবান হয়। ভারতের অখণ্ডতা রক্ষা করিয়া ভারতে স্বাধীন হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা করা ছিল এই দলের প্রধান উদ্দেশ্য।

বর্তমানে এই দল ইহার সাম্প্রদায়িকতা পরিত্যাগ করিয়া সমাজহিতকর কার্যে আত্মনিয়োগ করিতে মনস্থ করিয়াছে। হিন্দু ব্যতীত অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেরাও বর্তমানে এই দলের সদস্য হইতে পারে। কিন্তু বিগত নির্বাচনের ফলে দেখা যায় যে, বর্তমানে এই দলের ভারতীয় জনসাধারণের উপর আর বিশেষ প্রভাব-প্রতিপত্তি নাই।

এতদ্ব্যতীত ভারতে আরও কয়েকটি রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে **ভারতীয় জনসংঘ** বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই দলটি পরলোকগত ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সংগঠিত হয় এবং তাঁহার

জীবদ্দশায় অতি অল্পকালের মধ্যে সমগ্র ভারতে ইহার প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হয়। এই দলের সমর্থকগণের মধ্যে কিছু অ-হিন্দু সদস্যও ছিল। দিল্লী, পাঞ্জাব ও পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জিলায় ইহার বিশেষ প্রভাব ছিল। নেতার মৃত্যুর পর এই দলের প্রভাব কিয়ৎ পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। এই দল অনেক পরিমাণে হিন্দু মহাসভার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল এবং কার্যক্ষেত্রেও হিন্দু মহাসভার সহিত একযোগে কংগ্রেস অনুসৃত নীতির বিরোধিতা করিত।

তপশীলী ফেডারেশন, মুস্লিম লীগ ও রামরাজ্য পরিষদ নামক আরও তিনটি ক্ষুদ্র দল আছে। বর্তমানে এক কেরল ব্যতীত ভারতের অন্য কোন স্থানে মুস্লিম লীগের অস্তিত্ব আছে বলিয়া মনে হয় না।

একমাত্র সাম্যবাদী দল ব্যতীত ভারতের অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলির সংগঠনে বর্তমানে দৌর্বল্য সূচিত হয়। দলগুলির আভ্যন্তরীণ মতবিরোধের ফলে দলগুলির বহু সদস্য কংগ্রেস দলে যোগদান করিতেছেন। সুতরাং অনুমান করা যায় যে, ভারতের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কংগ্রেস দল ও সাম্যবাদী দলের দ্বারা ভারতে দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইতে পারে।

ভারতের শাসনক্ষেত্রে দলীয় ব্যবস্থার ভূমিকা (Role of the Party System in Indian Administration)

বর্তমান যুগে সকল দেশের শাসনব্যবস্থায়ই রাজনৈতিক দলের কিছু না-কিছু প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। গণতান্ত্রিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত দেশগুলির কথা ছাড়িয়া দিলেও এমন কি একনায়কতন্ত্রের শাসনব্যবস্থাও দলীয় প্রভাব মুক্ত নহে। কোন শাসনব্যবস্থাই আজ আর ঈশ্বরানুমোদিত বলিয়া স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে না—স্থায়িত্বের জন্য চাই জনমতের সমর্থন। আর এই সমর্থনের ভিত্তি হইল রাজনৈতিক দল। সুতরাং দলের সমর্থন ছাড়া শাসনব্যবস্থা স্থায়ী বা কার্যকরী হইতে পারে না।

একটি দেশে একটি মাত্র রাজনৈতিক দল বা দুইটি প্রধান দল বা বহু দল থাকিতে পারে। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সাধারণতঃ একাধিক দল থাকে এবং এই দলগুলির মধ্যে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা, মত বিনিময় ও সহযোগিতার ভিত্তিতে শাসনকার্য পরিচালিত হয়। একটি মাত্র দলের সমর্থনপুষ্ট একনায়কতন্ত্রে আলাপ-আলোচনা বা সহযোগিতার কোন স্থান নাই। সুতরাং এই জাতীয় শাসনব্যবস্থায় জনমতের প্রভাব অতি দুর্বল।

নূতন শাসনতন্ত্র অনুসারে ভারতে বৃটিশ শাসনব্যবস্থার অনুরূপ পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই শাসনব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল সার্বজনীন ভোটাধিকার (Adult franchise) ও সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন (Majority rule)। একটু প্রণিধানপূর্বক এই দুইটি বৈশিষ্ট্যের কথা চিন্তা করিলে দেখা যায় যে, একনায়কতন্ত্রেও এই দুইটি বৈশিষ্ট্য বর্তমান থাকিতে পারে। নাৎসী জার্মানী ও ফ্যাসীবাদী ইতালীতে সার্বজনীন ভোটাধিকারের অনুরূপ ব্যবস্থা ও সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের শাসন প্রবর্তিত ছিল। উপরি-উক্ত দুইটি বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, ইংলণ্ডের দলীয় শাসনব্যবস্থা এবং জার্মানী বা ইতালীর দলীয় শাসনব্যবস্থার মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। সুতরাং বলা যায় যে, দলীয় শাসনব্যবস্থা গণতান্ত্রিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে সার্বজনীন ভোটাধিকার ও সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের শাসন ব্যতীতও আরও কয়েকটি অবস্থার সৃষ্টি অপরিহার্য। সত্য বটে যে, দলীয় শাসনব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল শাসনকার্য পরিচালনা করিবে, কিন্তু এই সংখ্যাগরিষ্ঠ দল যাহাতে তাহাদের সংখ্যাধিক্যের বলে জনমত উপেক্ষা করিয়া অসংযতভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করিতে না পারে, সেজন্য দেশে শক্তিশালী বিরোধী দল (Opposition party) থাকা একান্ত আবশ্যক। গণতন্ত্রের একটি অপরিহার্য শর্ত হইল শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন (Alternation of rule)। সংখ্যাগরিষ্ঠ দল শাসন-পরিচালনা করিবে, আর বিরোধী দল গঠনমূলক সমালোচনার দ্বারা সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকে সংযত রাখিবে। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের ভুল-ত্রুটি প্রকাশ করিয়া বিরোধী দল যদি জনমত প্রভাবিত করিতে পারে তাহা হইলে পরবর্তী নির্বাচনে বিরোধী দল ক্ষমতায় আসীন হইতে পারে এবং পূর্ববর্তী সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বিরোধী দলের ভূমিকা গ্রহণ করে। এইরূপে বিভিন্ন দলগুলির মধ্যে গঠনমূলক প্রতিযোগিতার ফলে কোন দলই একচেটিয়াভাবে শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকিতে পারে না। প্রতিযোগিতার ফলে শাসনব্যবস্থার উৎকর্ষ সাধিত হয় এবং জনমত সজাগ ও সচেতন থাকে। বৃটিশ শাসনব্যবস্থায় উপরি-উক্ত লক্ষণগুলি বিশেষভাবে দেখা যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি-প্রধান শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইলেও শাসন ব্যাপারে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা প্রায় বৃটেনের অনুরূপ।

ভারতে পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইলেও ইংলণ্ড বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুরূপভাবে এখানে গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে দলীয় শাসন প্রবর্তিত হয় নাই ;

ইহার কারণ হইল, ভারতে আজ পর্যন্ত কোন শক্তিশালী বিরোধী দল গঠিত হইতে পারে নাই। কাজেই সংখ্যাগরিষ্ঠ কংগ্রেস দল স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী কাল হইতে একাদিক্রমে আজ ১৯।২০ বৎসর ক্ষমতায় আসীন আছে। একমাত্র কেরল রাজ্যে ভারতের সাম্যবাদী দল কিছুদিন ক্ষমতায় আসীন ছিল এবং কিছুকাল পর্যন্ত বিরোধী দলের কার্য করিয়া আসিতেছিল। কিন্তু ১৯৬২ সালের তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনের ফলে কেন্দ্রে ও রাজ্যগুলিতে কংগ্রেস দলের বিপুল সংখ্যাধিক্য বজায় আছে। কাজেই সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে কেন্দ্রে ও রাজ্য-গুলিতে সংখ্যাধিক্যের শাসন অর্থাৎ কংগ্রেসের শাসন অটুট আছে। ১৯৬২ সালের সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস দল শতকরা ৪৫টি ভোট পাইয়াও লোকসভায় শতকরা ৭০ ভাগ আসন দখল করিতে সমর্থ হয় এবং তিনটি রাজ্য ব্যতীত অন্য সর্বত্র সংখ্যালঘিষ্ঠের ভোটেই বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিয়া ক্ষমতায় আসীন আছে। সুতরাং কংগ্রেস দল যে ভারতে সর্বাধিক জনপ্রিয় দল এবং ভারতের সর্বাধিক সংখ্যক ভোটদাতার সমর্থনে ক্ষমতা লাভ করিয়াছে একথা সত্য নহে। কেন্দ্রীয় আইনসভার উভয় কক্ষে এবং রাজ্য আইনসভাগুলিতে সরকারী দলের আপেক্ষিক সংখ্যাধিক্য এত অধিক যে, আইনসভায় পরাজয় বরণ করা দূরের কথা, একমাত্র মৌখিক বিরোধিতা ব্যতীত সরকারের কোন সক্রিয় বিরোধিতার সম্মুখীন হইবার আশংকা নাই। এরূপ অবস্থায় ক্ষমতাসীন সরকার অনায়াসেই দলীয় সমর্থনপুষ্ট হইয়া উহার কার্যসূচীকে ইচ্ছামত রূপদান করিতে পারে। ভারতে বহু দল আছে। কিন্তু শক্তিশালী, সক্রিয় এবং গঠনমূলক কর্মসূচীর অধিকারী কোন বিরোধী দল নাই। এই কারণে ভারতে পার্লামেণ্টারি শাসনব্যবস্থা থাকিলেও ইহার প্রধান শর্ত ক্ষমতার পরিবর্তন সম্ভব নহে। সুতরাং কংগ্রেস দলের একনায়কত্ব সু-প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে। শিক্ষিত ও সচেতন জনমতের অভাব এবং গঠনাত্মক কোন রাজনৈতিক দলের অবর্তমানে এই বিশেষ দলীয় একনায়কত্ব সম্ভব হইয়াছে। ইতালী ও জার্মানীর মত ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একটি মাত্র দল না থাকিলেও ভারতে বহু দলের অস্তিত্ব শাসনব্যবস্থার উৎকর্ষের সহায়ক হয় নাই। ভারতে কংগ্রেস দল ব্যতীত অন্যান্য দলগুলির কোন সংহতি বা বিশেষ কোন গঠনমূলক কর্মসূচী নাই। তাই এই দলগুলি জনসাধারণের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। একমাত্র সাম্যবাদী দলের কিছু প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল। কিন্তু উক্ত দলও আজ অন্তর্দ্বন্দ্বে দ্বিধা-বিভক্ত এবং এই দলের পররাষ্ট্র বিশেষের প্রতি

আনুগত্য দেশের মধ্যে ইহার প্রভাব বৃদ্ধির প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং আপাততঃ ভারতে কংগ্রেস দলের এই একনায়কত্ব যে কিছুদিন প্রতিষ্ঠিত থাকিবে ইহাতে সন্দেহ নাই। গণতান্ত্রিক আদর্শ বিরোধী ও ক্ষতিকর হইলেও এই একদলীয় কায়েমী শাসনকে বর্তমানে অপরিহার্য বলিয়া গ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর নাই।

সংক্ষিপ্তসার

ভারতের রাজনৈতিক দল

ভারত যতদিন পরাধীন ছিল, ততদিন প্রকৃতপক্ষে এদেশে কোন প্রকৃত রাজনৈতিক দলের অভ্যুত্থান হইতে পারে নাই। অশিক্ষা, পরাধীনতা ও সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির জন্য ভারতীয় জনগণের মধ্যে প্রকৃত দেশাত্মবোধ জাগ্রত হইতে পারে নাই। দেশাত্মবোধের অভাবে কোন রাজনৈতিক দল গঠিত হইতে পারে না, কারণ, রাজনৈতিক দলের প্রধান উদ্দেশ্য হইল জাতীয় স্বার্থের উৎকর্ষ সাধন করা। দেশ স্বাধীন হওয়ার ফলে ধীরে ধীরে জনসাধারণের মধ্যে এই জাতীয়তাবোধ জাগরিত হইতেছে। বর্তমানে ভারতে যে কয়েকটি রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে কংগ্রেস সভাই হইল সর্বশ্রেষ্ঠ।

জাতীয় মহাসভা কংগ্রেস

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে য়্যালান্ অক্টাভিয়ান হিউম নামক একজন ইংরাজ কর্মচারীর উদ্যোগে এই প্রতিষ্ঠানটির জন্ম হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরে মহাত্মা গান্ধী যখন কংগ্রেসে যোগদান করিয়া ইহার অবিসংবাদী নেতারূপে স্বীকৃত হইলেন, তখন হইতেই কংগ্রেসের জীবনেতিহাসের দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু হইল। সমগ্র জাতির আশা ও আকাঙ্ক্ষা মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস সভার মধ্য দিয়া মূর্ত হইয়া উঠিল। বৃটিশ শাসনকালে কংগ্রেস ছিল একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান, যাহা সমগ্র জাতির মুখপাত্র হিসাবে বিশ্বের দরবারে ভারতের জাতীয় অধিকারের দাবী জানাইতে সক্ষম ছিল। কংগ্রেস সভা ভারতের সর্বসম্প্রদায়, সর্বশ্রেণী, সর্বধর্মমতাবলম্বী ও বিভিন্ন স্বার্থের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত হইয়াছিল। জাতি-ধর্ম-নির্বিচারে যে-ব্যক্তি বাৎসরিক চার আনা চাঁদা দিতে

সমর্থ, সে-ই কংগ্রেসের সদস্য হইবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইত। বৃটিশ শাসনকালে কংগ্রেস সভার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ভারতে বৃটিশ শাসনের অবসান। পরাধীন ও নিরস্ত্র জাতির পক্ষে বৃটিশ সরকারের মত একটি প্রথম শ্রেণীর ক্ষমতাশালী সরকারের সহিত যুদ্ধ করিয়া স্বাধীনতা অর্জন করা যে কতটা দুঃসাধ্য, কংগ্রেস তাহা ভারতীয় জনসাধারণের অধিকাংশকে বুঝাইতে সমর্থ হইয়াছিল। এইজন্য মহাত্মা গান্ধী-প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলন প্রভৃতি শান্তিপূর্ণ পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া কংগ্রেস নিরস্ত্রভাবে বিদেশী সরকারের সহিত যুদ্ধ পরিচালনা করিয়াছে। অবশ্য অনেকের মতে কংগ্রেস-অনুসৃত নীতি যে সম্পূর্ণ নির্ভুল ছিল তাহা নয় এবং ভারতের বহু জনপ্রিয় নেতা এই অহিংসা নীতি বর্জন করিয়া হিংসার পথে দেশের স্বাধীনতা অর্জন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

স্বাধীনতা অর্জনের জন্য কংগ্রেসের ঐকান্তিক চেষ্টা ও ত্যাগস্বীকার ফলপ্রসূ হইলেও স্বাধীনতা লাভকালে কংগ্রেসের মূল আদর্শ অনেক পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। বহু চেষ্টা সত্ত্বেও কংগ্রেস হিন্দু-মুসলমান বিরোধের সন্তোষজনক মীমাংসা করিতে পারে নাই এবং শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসকে বিদেশী শাসকের নির্দেশ অনুসারে ভারতবিভাগ স্বীকার করিয়া লইতে হইয়াছে।

স্বাধীনতালাভের পর সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে কংগ্রেস দলই শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইয়াছে। অন্যান্য রাজনৈতিক দল অপেক্ষা কংগ্রেস দলের কেন্দ্রীয় ও রাজ্য আইনসভাগুলিতে এত অধিক সংখ্যক সমর্থক আছে যে, এই দলের পক্ষে সরকার গঠন করিতে কোনরূপ অসুবিধা হয় নাই। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সার্বজনীন ভোটাধিকার ভিত্তিতে ভারতে যে দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে দেখা যায় যে, লোকসভা এবং বিভিন্ন রাজ্যের ব্যবস্থাপক সভা-গুলিতে কংগ্রেস সমগ্র আসনসংখ্যার প্রায় তিন-চতুর্থাংশ অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় আইনসভা ও রাজ্য আইনসভাগুলিতে কংগ্রেস দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেখিয়া ইহা যে সর্বাধিক জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান, এ সিদ্ধান্ত করা যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ, দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, বিগত ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে লোকসভার নির্বাচনে কংগ্রেস শতকরা কিঞ্চিদধিক ৪০ ভোট পাইয়াও শতকরা ৭০টির উপর আসনলাভে সমর্থ হয়। ভারতের অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলি যদি তাহাদের বিভেদ ভুলিয়া সংঘবদ্ধভাবে কংগ্রেসের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিত, তাহা হইলে নির্বাচনে কংগ্রেসের সংখ্যাধিক্য বজায় রাখা কষ্টকর

হইত। তবে ইহা সত্ত্বেও বলিতে হইবে যে, কংগ্রেস সভা ভারতের একমাত্র সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় রাজনৈতিক দল এবং কংগ্রেসের এই জনপ্রিয়তার কারণ হইল, কংগ্রেসের মহাত্মা গান্ধীর স্মৃতিবিজড়িত ঐতিহ্য এবং জওহরলাল নেহরুর বিরাট ব্যক্তিত্ব—যে ব্যক্তিত্বের প্রভাব বর্তমানে ভারতের সীমা অতিক্রম করিয়া সমগ্র জগতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে।

কংগ্রেসের বর্তমান নীতি হইল, আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে জনসাধারণের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধন করা। এই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া কংগ্রেস সরকার সমাজ-তান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করিবার উদ্যোগী হইয়াছে এবং প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুসারে দেশের অর্থনৈতিক জীবনে অনেক পরিবর্তন আনয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছে। বর্তমানে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কাযে রূপায়িত কবিবার প্রচেষ্টা চলিতেছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কংগ্রেস চরম ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা পরিহার করিয়া মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের পক্ষপাতী।

আন্তর্জাতিক রাজনীতিব ক্ষেত্রে কংগ্রেস সরকার কোন শক্তিগোষ্ঠীর উপাসক নহে। কংগ্রেস শান্তিপূর্ণ উপায়ে সকল জাতির সহ-অস্তিত্ব নীতিতে বিশ্বাসী। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে যে এই শান্তিপূর্ণ সহ-অস্তিত্ব নীতি বলবৎ করা সম্ভব, কংগ্রেস তাহা বিশ্বাস করে।

কংগ্রেসের একটি কেন্দ্রীয় সংগঠন আছে। সভাপতি ও কতিপয় সদস্য লইয়া কংগ্রেসের এই কার্যনির্বাহক সমিতি গঠিত হয়। কাযনির্বাহক সমিতি দলীয় নীতি নির্ধারণ করে। কাযনির্বাহক সমিতি কর্তৃক নির্ধারিত-নীতি অবশ্য সব ভারতীয় কংগ্রেস সমিতির অনুমোদনসাপেক্ষ। সর্বভারতীয় কংগ্রেস সমিতির সদস্যবর্গ রাজ্য কংগ্রেস সমিতির সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া থাকেন। আর কংগ্রেসের সাধারণ সদস্যগণেব ভোটে রাজ্য কংগ্রেস সমিতির সদস্যগণ নির্বাচিত হন।

প্রজা-সমাজতন্ত্রী দল

কৃষক-মজদুর প্রজা দল এবং সমাজতন্ত্রী দল ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের নির্বাচনে বিশেষ-ভাবে পরাজিত হইয়া সম্মিলিতভাবে প্রজা-সমাজতন্ত্রী দল গঠন করিয়াছে। এই দলের নেতৃস্থানীয় অধিকাংশ সদস্যই পূর্বে কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন।

এই দল মহাত্মা গান্ধী-প্রবর্তিত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের পক্ষপাতী

এবং এই উদ্দেশ্যে ইহারা জমিদারী-প্রথার উচ্ছেদ, কুটির-শিল্পের উন্নতি ও প্রসার এবং মূল শিল্পগুলির জাতীয়করণ নীতি সমর্থন করেন।

ভারতের সাম্যবাদী দল

ভারতীয় সাম্যবাদী দল রুশীয় সাম্যবাদী আদর্শের ভিত্তিতে গঠিত হইয়াছে এবং ইহারা ভারতে রুশীয় পদ্ধতিতে সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা গঠন করিবার মত পোষণ করেন। বহু উচ্চ শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি এই দলের সমর্থক। এতদ্ব্যতীত কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যে নিযুক্ত বহু শ্রমিক এই দলের অনুগামী। এই দলের বহু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি পূর্বে কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন। কিন্তু পরে কংগ্রেস-প্রবর্তিত অহিংস নীতিতে আস্থাহীন হইয়া এবং রুশীয় সাম্য-বাদিগণের অনুসৃত কার্যক্রমের বিরাট সাফল্যে আকৃষ্ট হইয়া সাম্যবাদী দলে যোগদান করেন। এই দলের প্রধান উদ্দেশ্য হইল ভারতেও সোভিয়েত ব্যবস্থার অনুরূপ এক শ্রেণীহীন ও শোষণমুক্ত সমাজব্যবস্থা প্রবর্তন করা। ইহাদের কার্যক্রমের তালিকা হইল বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারীপ্রথার উচ্ছেদসাধন, শিল্পগুলির জাতীয়করণ, ভাষাভিত্তিক রাজ্যগঠন, অনুন্নত শ্রেণীর ও উদ্বাস্তুদের বিনা খরচায় পুনর্বাসন।

বিগত ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের সাধারণ নির্বাচনে ভারতের সাম্যবাদী দল কংগ্রেসের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া আইনসভায় অন্যান্য দল অপেক্ষা অধিক সংখ্যক আসন দখল করিতে সমর্থ হয়। ১৯৫৭ সালের লোকসভার নির্বাচনে এই দল সমগ্র ভোট সংখ্যার ১২,০৬৮,৪৫২ ভোট পাইয়া ২৯টি আসন দখল করিতে সমর্থ হয়। মাদ্রাজ, কেরল, হায়দরাবাদ ও পশ্চিমবঙ্গের কলিকাতা প্রভৃতি কতকগুলি স্থানে সাম্যবাদী দলের বিশেষ প্রভাব প্রতিপত্তি আছে। কেরলে সাম্যবাদী দল সংখ্যাধিক্য লাভ করিয়া মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছিল।

হিন্দু মহাসভা

ভারতের রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে হিন্দু মহাসভা অপেক্ষাকৃত পুরাতন রাজনৈতিক দল। সাধারণ সমাজব্যবস্থার সংস্কার-সাধন করা এই দলের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হইলেও পরবর্তী কালে এই দল ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। পরবর্তী কালে এই দল উগ্র সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন হইয়া উঠে ও মুস্লিম লীগের বিপরীত দল হিসাবে হিন্দু স্বার্থসংরক্ষণে বিশেষ

যত্নবান্ হয়। ভারতের অখণ্ডতা রক্ষা করিয়া ভারতে স্বাধীন হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা করা ছিল এই দলের প্রধান উদ্দেশ্য।

বর্তমানে এই দল ইহার সাম্প্রদায়িকতা পরিত্যাগ করিয়া সমাজহিতকর কার্যে আত্মনিয়োগ করিতে মনস্থ করিয়াছে। হিন্দু ব্যতীত অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেরাও বর্তমানে এই দলের সদস্য হইতে পারে। কিন্তু বিগত নির্বাচনের ফলে দেখা যায় যে, বর্তমানে ভারতীয় জনসাধারণের উপর এই দলের আর বিশেষ প্রভাব-প্রতিপত্তি নাই।

এতদ্ব্যতীত ভারতে আরও কয়েকটি রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে **ভারতীয় জনসংঘ** বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই দলটি পরলোকগত ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক গঠিত হয় এবং তাঁহার জীবদ্দশায় অতি অল্পকালের মধ্যে সমগ্র ভারতে ইহার প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হয়। এই দলের সমর্থকগণের মধ্যে কিছু অ-হিন্দু সদস্যও ছিল। দিল্লী, পাঞ্জাব ও পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেলায় ইহার বিশেষ প্রভাব ছিল। নেতার মৃত্যুর পর এই দলের আর কোন অস্তিত্ব নাই বলিলেও চলে। এই দল অনেক পরিমাণে হিন্দু মহাসভার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল এবং কার্যক্ষেত্রেও হিন্দু মহাসভার সহিত একযোগে কংগ্রেস-অনুসৃত নীতির বিরোধিতা করিত।

তপশীলী ফেডারেশন, মুস্লিম লীগ ও রামরাজ্য পরিষদ নামক আরও তিনটি ক্ষুদ্র দল বিগত নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছিল। বর্তমানে এক কেরল ব্যতীত ভারতের অন্য কোন স্থানে মুস্লিম লীগের অস্তিত্ব আছে বলিয়া মনে হয় না।

প্রশ্নাবলী

1. Give a short account of the Party System in India

2. Explain the functions of political parties in the actual working of the constitutional system in India.

3. Discuss briefly the aims and objects of any two of the political parties in India.

উনবিংশ অধ্যায়

ভারতে ভোটদান ব্যবস্থা

(The Electoral System in India)

নির্বাচকমণ্ডলী (The Electorate)

নির্বাচকমণ্ডলী বলিতে একটি দেশের জনসংখ্যার সেই অংশ বুঝায়, যে অংশ সেই দেশের আইনানুসারে আইনসভায় তাহাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে পারে। বর্তমান যুগে প্রায় সকল সভ্যদেশে জাতি-বর্ণ ধর্ম-স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার প্রবর্তিত হইয়াছে। কিন্তু কাযতঃ দেখা যায় যে, জনসংখ্যার সেই অংশই ভোটদান করিতে সক্ষম হয়, যে অংশ রাষ্ট্র-প্রণীত আইন অনুসারে ভোটদানের যোগ্যতার অধিকারী বলিয়া বিবেচিত হয। ভিন্ন ভিন্ন দেশে এই ভোটদান যোগ্যতা সম্পর্কে আইন বিভিন্ন হয়। অপ্রাপ্ত বয়স্ক, উন্মাদ, দেউলিয়া, ভবঘুরে প্রভৃতি শ্রেণীর লোক কোন দেশেই ভোটদানের অধিকারী হয় না, কিন্তু অপ্রাপ্তবয়স্ক সম্পর্কে কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নাই। সোভিয়েত রাষ্ট্রে ১৮ বৎসর বয়স্ক নর-নারী ভোটদানক্ষম বলিয়া বিবেচিত হয়, কিন্তু ভারত ও ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের আইনানুসারে ২১ বৎসর বয়স্ক না হইলে কোন লোকই ভোটদান করিতে পারে না। জার্মানী, ফরাসী, সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে স্ত্রীলোকের ভোটাধিকার স্বীকৃত হয় নাই।

ভারতে ভোটদান সম্পর্কিত আইনগুলির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। প্রথমতঃ, যদিও রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতির নির্বাচন-সংক্রান্ত আইন সংবিধান কর্তৃক বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে তথাপি কেন্দ্রীয় ও রাজ্য আইনসভাগুলির নির্বাচন পদ্ধতি সাধারণ আইন প্রণয়ন দ্বারা নির্ধারণ করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, নির্বাচন ব্যাপার কোনরূপ সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে পরিচালিত হইতে পারিবে না। পার্লামেন্ট বা রাজ্য আইনসভা উভয়বিধ নির্বাচনক্ষেত্রে একই নির্বাচন তালিকা প্রস্তুত হইবে এবং সকল ব্যক্তি জাতি, ধর্ম ও স্ত্রী-পুরুষ নির্বিচারে ভোটদান করিবার অধিকারী হইবে।

তৃতীয়তঃ, ভোটদান ব্যবস্থা প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার ভিত্তিতে পরিচালিত

হইবে এবং অন্য কারণে ভোটদানের অযোগ্য বিবেচিত না হইলে ২১ বা তদূর্ধ্ব বয়স্ক ভারতীয় নাগরিক মাত্রই নির্বাচনে ভোটদান করিতে পারিবে।

ভোটদান সংক্রান্ত আইনগুলি পার্লামেণ্ট সভা প্রণয়ন করিবে কিন্তু প্রয়োজন ক্ষেত্রে রাজ্যসরকারগুলি পার্লামেণ্ট প্রণীত রাজ্যসংক্রান্ত ভোটদান আইনগুলির অসম্পূর্ণতা দূর করিবার উদ্দেশ্যে পরিপূরক আইন প্রণয়ন করিতে পারিবে। উভয় আইনের মধ্যে বিরোধ ঘটিলে পার্লামেণ্ট প্রণীত আইন বলবৎ হইবে। নির্বাচন পদ্ধতি ও নির্বাচন এলাকা গঠনও স্থির করিবার জন্য পার্লামেণ্ট ১৯৫০, ১৯৫১ ও ১৯৫২ সালে যথাক্রমে দুইটি জনগণের প্রতিনিধিত্ব আইন ও ডিলিমিটেশন কমিশন আইন পাস করে। এই আইনের দ্বারা স্থির হয় যে, ভারতে একসদস্য-সমন্বিত ভৌগোলিক এলাকার ভিত্তিতে নিবাচন অনুষ্ঠিত হইবে। কেবলমাত্র রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতির নিবাচনক্ষেত্রে আনুপাতিক ভোটদান পদ্ধতি প্রযুক্ত হইবে।

ভারতে ভোটদাতার যোগ্যতা হইল :—

১। ভোটদাতার অবশ্যই ভারতীয় নাগরিক হইতে হইবে।

২। তাহার অন্ততঃ ২১ বৎসর বয়স্ক হওয়া চাই।

৩। তাহাকে কোন নির্বাচন এলাকায় অন্ততঃপক্ষে ৬ মাস কাল বাস করিতে হইবে।

৪। কোন যোগ্য বিচারালয় তাহাকে বিকৃত মস্তিষ্ক বলিয়া ঘোষণা করে নাই।

৫। নির্বাচন ব্যাপারে কোন অসাধু অথবা দুষ্ট পন্থার সহিত জড়িত ছিল না।

ভারতের মত বিরাট দেশে ঠিকমত নির্বাচন পরিচালনা করা এক দুরূহ ব্যাপার এবং এজন্য সক্রিয় ও সজাগ নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে সংবিধানে একটি নির্বাচন কমিশন নিয়োগের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্ধারিত একজন মুখ্য নির্বাচন সচিব এবং প্রয়োজনমত একাধিক নির্বাচন সচিব লইয়া এই কমিশন গঠিত হইবে এবং কমিশনের সদস্যগণের কার্যকাল ও কার্যের অন্যান্য শর্তাদি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

এই নির্বাচন কমিশন ভারতের কেন্দ্রীয়, রাজ্য, রাষ্ট্রপতির ও উপরাষ্ট্রপতির নির্বাচন পরিদর্শন ও নিয়ন্ত্রণ করিবে। নির্বাচন সম্পর্কে কোন সন্দেহ বা বিরোধের ক্ষেত্রে এই কমিশন নির্বাচন সম্পর্কিত বিশেষ বিচারালয় গঠন করিতে

পারিবে। এই কমিশনের কাজে সাহায্য করিবার জন্য রাষ্ট্রপতি কমিশনের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া আঞ্চলিক নির্বাচন কমিশনার (Regional Commissioners) পদের সৃষ্টি করিতে পারেন। নির্বাচন সম্পর্কে যাবতীয় বিরোধ নির্বাচন সম্পর্কিত আদালত কর্তৃক মীমাংসিত হইবে। এ বিষয়ে সাধারণ আদালতের কোন ক্ষমতা নাই।

নির্বাচন সংসদ (Election Commission)

ভারতে সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন পরিচালনা করিবার উদ্দেশ্যে শাসনতন্ত্রের ৩২৪ ধারা অনুসারে একটি নির্বাচন সংসদ গঠিত হইয়াছে। ভারতের নির্বাচন সংসদ একজন মুখ্য নির্বাচন সচিব এবং পার্লামেণ্ট কর্তৃক আইনের দ্বারা নির্ধারিত সংখ্যক সদস্য লইয়া গঠিত। মুখ্য সচিব রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং সংসদের অন্যান্য সদস্যগণ মুখ্য সচিবের পরামর্শ অনুসারে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন। রাজ্য আইনসভাগুলির সদস্য নির্বাচনের উদ্দেশ্যে নির্বাচন সংসদকে সাহায্য করিবার জন্য রাষ্ট্রপতি নির্বাচন সংসদের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া আঞ্চলিক নির্বাচন সংসদ গঠন করিতে পারেন। নির্বাচন সংসদের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে নির্বাচন সংসদের সদস্যগণের কার্যকালের ও চাকুরির অন্যান্য শর্ত নির্ধারিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিগণকে যে পদ্ধতিতে অপসারণ করা হয়, একমাত্র সেই পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া মুখ্য সচিবকে পদচ্যুত করা যায়। নির্বাচন সংসদের অন্যান্য সদস্যগণকে ও আঞ্চলিক সংসদের সদস্যগণকে একমাত্র মুখ্য নির্বাচন সচিবের সুপারিশ ব্যতীত অপসারণ করা যায় না।

নির্বাচন সংসদের প্রধান কার্য হইল রাষ্ট্রপতি উপরাষ্ট্রপতি, কেন্দ্রীয় আইনসভা ও রাজ্য আইনসভাগুলির নির্বাচন পরিচালনা, তদারক ও নিয়ন্ত্রণ করা। নির্বাচন সংক্রান্ত কোন ব্যাপার লইয়া বিরোধ ঘটিলে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য একমাত্র নির্বাচন সংসদই বিশেষ নির্বাচনী আদালত (Election Tribunal) গঠন করিবার ক্ষমতার অধিকারী।

ভারতে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার (Adult franchise in India)

স্বাধীনতালাভের পূর্বকাল পর্যন্ত ভারতে শতকরা মাত্র ১৪জন লোক ভোটদানের অধিকারী ছিল। ভারতবাসীর উপর বলপূর্বক আরোপিত দারিদ্র্য,

অশিক্ষা ও রাজনৈতিক চেতনার অভাবের অজুহাতে বিদেশী শাসকগোষ্ঠী তাহাদের স্বৈরাচারী শাসন স্থায়ী করিবার উদ্দেশ্যে অধিকাংশ ভারতীয়কে তাহাদের ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিযাছিল। স্বাধীনতালাভের পর ভারতীয়গণ কর্তৃক যে সংবিধান রচিত হয়, তাহার প্রস্তাবনায় সাম্যের ভিত্তিতে সার্বজনীন ভোটাধিকার নীতি গ্রহণ করিয়া ভারতে একটি প্রকৃত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের ব্যবস্থা ঘোষিত হয়। সংবিধানের প্রস্তাবনায় বলা হইয়াছে যে, ভারতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার একমাত্র উৎস হইল ভারতবাসী। সুতরাং সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গণশাসন প্রতিষ্ঠিত না হইলে প্রস্তাবনায় উল্লিখিত উচ্চ আদর্শ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে। তাই প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাকল্পে ভারতে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার প্রবর্তিত হইয়াছে। এখন প্রশ্ন হইল যে, ভারতে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাক্ষেত্রে প্রাপ্তবয়স্কের এই ভোটাধিকার কতদূর সহায়ক হইযাছে।

ভারতে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের বিরুদ্ধে গতানুগতিকভাবে বহু যুক্তি দেখান হইয়াছিল। এই যুক্তিগুলির মধ্যে মিল্-প্রদর্শিত যুক্তি সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ছিল। মিলের মত অনুসরণ করিয়া সংবিধানের কয়েকজন রচয়িতা বলিয়াছিলেন যে, যেহেতু ভারতে লিখন-পঠন-পটু শিক্ষিত লোকের সংখ্যা সমগ্র জনসংখ্যার অনুপাতে অতি স্বল্প, সেই হেতু ভারতে সার্বজনীন ভোটাধিকার প্রবর্তন করা যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ অশিক্ষিত জনসাধারণ তাহাদের বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া যোগ্য ব্যক্তিকে ভোটদান করিতে অক্ষম। সুতরাং সার্বজনীন ভোটাধিকার প্রবর্তনের ফলে অযোগ্য ব্যক্তিগণের নির্বাচনের সম্ভাবনাই অধিক।

ভোটদান ব্যাপারে সাধারণ কর্তব্যবুদ্ধি ও হিতাহিত জ্ঞান থাকা আবশ্যক, ইহা স্বীকার করিয়া লইলেও মিলের উক্তির (আগে শিক্ষা, পরে ভোটদান অধিকার—Universal teaching must precede universal enfranchisement) সমর্থন করা যায় না। সাধারণ বুদ্ধি, পরার্থপরতা ও সামাজিক চেতনা প্রভৃতি যে গুণগুলি ভোটদান ক্ষমতা প্রয়োগের পক্ষে অপরিহার্য বলিয়া পরিগণিত হয়, সেগুলি অশিক্ষিত লোকের মধ্যেও যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যায়। ভোটদানের অধিকার থাকিলে লোকে তাহাদের অন্য অধিকার সম্বন্ধে সজাগ হইয়া অন্য অধিকারগুলি দাবী করিতে সক্ষম হয়। মিলের নিজ দেশ ইংলণ্ডেও এই নীতি অনুসৃত হয় নাই। সুতরাং পূর্বে শিক্ষার বিস্তার, পরে ভোটদান ক্ষমতার সম্প্রসারণ নীতি গ্রহণ করা যায় না।

ভারতের ক্ষেত্রেও উপরি-উক্ত যুক্তিগুলি প্রযোজ্য। স্বাধীনতালাভের পর ভারতে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার ভিত্তিতে পর পর তিনটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই নির্বাচনে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত লোকে সমভাবেই যোগদান করিয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে এই নির্বাচন অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে যে অভূতপূর্ব উদ্দীপনা সৃষ্টি করিয়াছে তাহা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও দেখা যায় নাই। এ কথাও সত্য নহে যে, অশিক্ষিত লোক সর্বত্রই ভোটদান ব্যাপারে অন্ধভাবে দলবিশেষের নির্দেশে পরিচালিত হইয়াছে। সুতরাং এদিক দিয়া দেখিতে গেলে বলা যায় যে, ভারতে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার দান ব্যর্থ ত হয়ই নাই, বরঞ্চ ভারতের ন্যায় অনগ্রসর দেশে আশাতীত সাফল্য লাভ করিয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার দানের বিরুদ্ধে বলা হইয়াছিল যে, ভারতের ন্যায় জনবহুল বিরাট দেশে এই ব্যবস্থা কার্যকরী করা সম্ভব নয়।

কিন্তু সুখের বিষয় যে, পর পর তিনটি নির্বাচন এরূপ সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হইয়াছে যে, ভারত জগতের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছে। ভারতে নির্বাচন সফল হওয়ার জন্যই ভারতের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার মিশর প্রভৃতি দেশের নির্বাচন পরিচালনা করিবার উপদেষ্টা হিসাবে আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। ভারতের নির্বাচনের এই সাফল্যের দ্বারা আরও প্রমাণিত হয় যে, ভারতের ভোটদাতাগণ মিলের মতে অশিক্ষিত হইলেও সমাজচেতনা ও কর্তব্যবোধে হীন নহে।

প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার ভারতে যে শুধু গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছে তাহা নহে, এই নীতি গ্রহণের ফলে ভারতে কোন অ-গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অভ্যুদয় সম্ভব হয় নাই। এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের বহু রাষ্ট্রেই আজ হয় সামরিক শাসন প্রবর্তিত হইয়াছে, না হয় কোন দলীয় চক্রের কবলে পতিত হইয়াছে। ভারতে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার প্রবর্তন করিয়া ভারতীয় সংবিধান ভারতের গণতান্ত্রিক শাসন-কাঠামো অটুট রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ভারতে সার্বজনীন ভোটাধিকার নিষ্ফল হয় নাই। শিক্ষা সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে এই নীতির সুফল ভবিষ্যতে আরও স্পষ্ট ও সক্রিয়ভাবে কার্যকরী হইবে।

সংক্ষিপ্তসার

ভারতে ভোটদান ব্যবস্থা

নূতন শাসনতন্ত্র অনুসারে ভারতে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার অর্থাৎ জাতি-বর্ণ-ধর্ম-স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে ২১ বৎসর বয়স্ক সুস্থমস্তিষ্ক আইনানুমোদিত ব্যক্তির ভোটদান ক্ষমতা স্বীকৃত হইয়াছে। ভোটদাতার ভারতীয় নাগরিক হইতে হইবে। রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন সংক্রান্ত নিয়মগুলি শাসনতন্ত্র কর্তৃক নির্ধারিত হইলেও আইনসভাগুলির নির্বাচন আইন পার্লামেণ্ট কর্তৃক প্রণীত আইনের দ্বারা স্থির হয়। নির্বাচন বিষয় রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত একজন মুখ্যসচিব ও অন্যান্য সচিব লইয়া গঠিত একটি নির্বাচন পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত হয়।

ভারতের ন্যায় বিশালায়তন, বহু জাতি ও সম্প্রদায় কর্তৃক অধ্যুষিত অনগ্রসর দেশে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার ব্যবস্থা প্রবর্তনে অনেকে আপত্তি করেন। কিন্তু বিগত তিনটি সাধারণ নির্বাচন দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, ভারতের জনসাধারণ অশিক্ষিত হইলেও রাজনৈতিক ব্যাপারে উদাসীন নহে। নির্বাচন ব্যাপারও শৃংখলার সহিত পরিচালিত হইয়াছে। প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার প্রবর্তনের ফলে ভারতে কোন অ-গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অভ্যুদয় হইতে পারে নাই।

প্রশ্ন

1. "Three General elections under the constitution of India have proved that adult franchise in India has been a failure." Do you agree? State your reasons fully.

———

বিংশ অধ্যায়

রাষ্ট্রকৃত্যক ও রাষ্ট্রভৃত্য নিয়োগ পরিষদ

(The Services and Public Service Commission)

রাষ্ট্রকৃত্যক (The Services)

নিরপেক্ষ ও সুদক্ষ জনপালন কৃত্যক আধুনিক গণশাসন ব্যবস্থার অপরিহার্য উপাদান বলিয়া পরিগণিত হয়। শাসনব্যবস্থার উৎকর্ষ বহুল পরিমাণে জনপালন কৃত্যকের দক্ষতার উপর নির্ভর করে। সুতরাং জনপালন কৃত্যকের কর্মচারিবৃন্দের কার্যের শর্তাদি এরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয় যাহাতে উপযুক্ত ব্যক্তিগণ এই কার্যে আকৃষ্ট হন।

আধুনিক রাষ্ট্রগুলিতে শাসনকর্তৃপক্ষ দুই প্রকারের কার্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। প্রথমতঃ, তাঁহাদের শাসননীতি নির্ধারণ করিতে হয়, দ্বিতীয়তঃ, নির্ধারিত নীতি কার্যক্ষেত্রে রূপায়িত করিয়া দৈনন্দিন শাসন পরিচালনা করিতে হয়। এই দুইটি কার্যের ভার দুই শ্রেণীর শাসকের হস্তে ন্যস্ত করা হয়। শাসননীতি নির্ধারণের ভার রাজনৈতিক শাসনকর্তৃপক্ষের (Political executive) অর্থাৎ মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণের হস্তে ন্যস্ত থাকে এবং এজন্য তাঁহারা আইনসভার নিকট দায়ী থাকেন। নির্ধারিত নীতি কার্যে রূপদান করিয়া শাসনকার্য পরিচালনা করিবার জন্য আর একদল কর্মচারী থাকেন। ইঁহাদিগকে স্থায়ী শাসনকর্তৃপক্ষ বলা হয়, কারণ ইঁহাদের কার্যকাল স্থায়ী। মন্ত্রিগণ অস্থায়ী, কারণ দলের ভিত্তিতে তাঁহারা নিযুক্ত হন এবং দলের পরিবর্তনে তাঁহাদের কার্যকালের অবসান ঘটে। কিন্তু এই স্থায়ী কর্মচারিবৃন্দ ভিন্ন পদ্ধতিতে নিযুক্ত হন এবং একটি নির্ধারিত বয়স পর্যন্ত কার্যে বহাল থাকিয়া জনপালন কৃত্যকের কার্যের ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রাখেন। শাসনকার্যে যে বিশেষ দক্ষতা ও নৈপুণ্য প্রয়োজন তাহার অধিকারী হইলেন এই স্থায়ী কর্মচারিবৃন্দ। ইঁহাদের সাহায্য ব্যতীত মন্ত্রিগণ শাসনকার্য পরিচালনা করিতে পারেন না অথচ এই কর্মচারিবৃন্দের আইনসভার নিকট কোন দায়িত্ব নাই। সুতরাং শাসনব্যবস্থার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দায়ী, কিন্তু তিনি বিশেষ দক্ষতার অধিকারী নহেন। আবার নিম্নতর শাসনকর্তৃপক্ষ বিশেষ দক্ষতার অধিকারী হইলেও দায়ী নহে। এইরূপে এই দুই

শ্রেণীর শাসকের সহযোগিতায় শাসনব্যবস্থা একদিকে দক্ষ এবং অপরদিকে দায়িত্বশীল হয়।

অন্যান্য দেশে সাধারণতঃ উর্ধ্বতন শাসনকর্তৃপক্ষের পদমর্যাদা শাসনতন্ত্র কর্তৃক নির্ধারিত হয় আর স্থায়ী কর্মচারিবৃন্দের পদমর্যাদা সাধারণ আইন বা শাসন-বিভাগীয় নির্দেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ভারতে কল্যাণরাষ্ট্র গঠনে জনপালন কৃত্যকের কর্মচারিবৃন্দের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণের দায়িত্ব স্মরণ করিয়া সংবিধানের রচয়িতাগণ এই স্থায়ী কর্মচারিবৃন্দের পদমর্যাদা সংবিধান দ্বারা নির্ধারিত করিয়াছেন।

ভারতে জনপালন কৃত্যক (Public Seryices in India)

সামরিক ও বেসামরিক শাসনকার্যে সরকার কর্তৃক যে সমুদয় কর্মচারী নিযুক্ত হয়, তাহাদিগকে লইয়াই জনপালন কৃত্যক গঠিত হয়। বৃটিশ শাসনকালে ভারতে রাজকীয় কৃত্যক (Imperial Service) ছিল সর্বোচ্চ চাকুরি। এই কৃত্যকের পদগুলি সর্বভারতীয় কৃত্যক বলিয়া অভিহিত হইত। (১) ভারতীয় জনপালন কৃত্যক (Indian Civil Service), (২) ভারতীয় পুলিশ কৃত্যক (Indian Police Service) ও (৩) ভারতীয় চিকিৎসা কৃত্যক (Indian Medical Service) ছিল রাজকীয় কৃত্যকের অন্তর্ভুক্ত। এই তিনটি কৃত্যকের অধিকাংশ সদস্যই ইয়ুরোপীয় কর্মচারী ছিলেন এবং ইঁহারা বিশেষ সুযোগ-সুবিধার অধিকারী ছিলেন। স্বয়ং ভারতসচিব (Secretary of State for India) ইঁহাদিগকে নিযুক্ত করিতেন।

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতালাভের পরবর্তী কালে এই বিশিষ্ট শ্রেণীর কর্মচারিবৃন্দ অবসর গ্রহণ করিলে ভারতের জাতীয় সরকার রাজকীয় কৃত্যকের পরিবর্তে সর্বভারতীয় কৃত্যকের (All-India Services) প্রবর্তন করেন। ভারতের নূতন সংবিধানে নিম্নলিখিত পাঁচটি বিভিন্ন শ্রেণীর জনপালন কৃত্যকের উল্লেখ দেখা যায়।

১। সর্ব-ভারতীয় অথবা যুক্তরাষ্ট্রীয় কৃত্যক—All-India Service.

২। কেন্দ্রীয় জনপালন কৃত্যক—Union Civil Sevice.

৩। রাজ্য জনপালন কৃত্যক—State Civil Service.

৪। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ বে-সামরিক পদ—Civil Post Under the Union.

৫। রাজ্যসরকারের অধীনস্থ বে-সামরিক পদ—Civil Post Under the State.

উপরি-উক্ত শ্রেণীবিভাগ হইতে দেখা যায় যে, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য উভয় সরকারেরই শাসন পরিচালনা করিবার জন্য নিজস্ব কৃত্যক আছে। ইহা ছাড়া উভয় সরকারের জন্য সর্বভারতীয় কৃত্যক নামক একটি সাধারণ কৃত্যক আছে। বে-সামরিক পদ বলিতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারের অধীনস্থ সেই সকল কর্মচারীকে বুঝায় যাহাদিগকে কেন্দ্রীয় বা রাজ্যসরকারের কোন কৃত্যকভুক্ত করা হয় নাই। ভারতীয় শাসনপরিচালনা কৃত্যক (Indian Administrative Service) এবং ভারতীয় পুলিশ কৃত্যক (Indian Police Service) সর্বভারতীয় কৃত্যকের অন্তর্ভুক্ত। রাজ্যসভা ইহার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সংখ্যাধিক্যের ভোটে প্রস্তাব পাশ করিলে পার্লামেণ্ট আইন প্রণয়ন করিয়া সর্বভারতীয় কৃত্যকের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারে। ভারতীয় শুল্ক কৃত্যক, আয়কর কৃত্যক, বৈদেশিক কৃত্যক, হিসাব-পরীক্ষা কৃত্যক প্রভৃতি হইল কেন্দ্রীয় কৃত্যকের (Central or Union Service) অন্তর্ভুক্ত।

কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভৃত্য নিয়োগ পরিষদ কর্তৃক লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া এই সকল কৃত্যকে কর্মচারী নিযুক্ত হয়। সর্বভারতীয় কৃত্যকের ও প্রথম শ্রেণীর কেন্দ্রীয় কৃত্যকের কর্মচারিগণকে মুশৌরীতে অবস্থিত জাতীয় শাসন বিদ্যালয়ে চারমাস শিক্ষানবিশি করিতে হয়। পুলিশ কৃত্যকের কর্মচারিবৃন্দকে আবু পাহাড়ে অবস্থিত পুলিশ শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষা গ্রহণ করিতে হয়। রাষ্ট্রপতি অথবা রাজ্যপাল সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে এই সকল কৃত্যকের নিয়োগ ও কাযের শর্তাদি সম্পর্কে নির্দেশ দান করিতে পারেন। পার্লামেণ্ট ও রাজ্য আইনসভা এই কৃত্যকগুলির নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত আইন প্রণয়ন করিতে পারে। এই সকল কৃত্যকে নিযুক্ত কর্মচারিবৃন্দ রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপালের খুশীমত কাযে বহাল থাকেন। উপরি-উক্ত পাঁচটি বিভিন্ন কৃত্যকের কর্মচারী সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ ব্যতীত অন্য কোন নিম্নতন কর্তৃপক্ষ ইহাদিগকে কায হইতে বহিষ্কার বা পদচ্যুত করিতে পারিবেন না। কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনীত হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আত্মসমর্থনের যুক্তিসম্মত সুযোগ না দিয়া তাহাকে কর্মচ্যুত বা তাহার পদের অবনতি করা যাইবে না। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি ফৌজদারী অভিযোগে শাস্তি পায়, তাহার ক্ষেত্রে উপরি-উক্ত নিয়ম প্রযোজ্য হইবে না। অযোগ্যতা প্রমাণিত হইলে অথবা অত্যধিক

কর্তব্য অবহেলার ক্ষেত্রে কাহাকেও পদচ্যুত করা যাইতে পারে। সরকারী চাকুরিয়ার আচরণসম্পর্কিত আইনানুসারে ইহারা রাজনীতিতে যোগদান করিতে পারেন না। সরকারী কাযের গোপনীয়তা রক্ষা করা ও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিদেশ মান্য করা ইহাদের অন্যতম কর্তব্য।

কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভৃত্য নিয়োগ পরিষদ (Union Public Service Commission)

সংবিধানের ৩১৫ (১) ধারায় কেন্দ্র ও রাজ্যের জন্য রাষ্ট্রভৃত্য নিয়োগ পরিষদ প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং এই সঙ্গে যৌথ (Joint) রাষ্ট্রভৃত্য নিয়োগ পরিষদ প্রতিষ্ঠারও উল্লেখ আছে। একজন পরিষদপতি ও অন্য কতিপয় সদস্য লইয়া এই পরিষদ গঠিত হয় এবং ইঁহারা সকলেই রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। সদস্যগণের সংখ্যা, তাহাদের কাযের শর্তাদি এবং ইঁহাদের সাহায্যকারী অধস্তন কর্মচারীদের কাযের শর্তাদিও রাষ্ট্রপতি স্থির করেন। পরিষদ সদস্যসংখ্যার প্রায় অর্ধাংশের দশবৎসর কাল ভারত সরকারের অধীন কাজে নিযুক্ত থাকা চাই। পরিষদ সদস্যগণ ছয় বৎসরকাল অথবা পঁয়ষট্টি বৎসর পর্যন্ত কাযে নিযুক্ত থাকিতে পারেন। কোন সদস্য পদত্যাগ করিতে পারেন অথবা রাষ্ট্রপতির আদেশে অসদাচরণের জন্য পদচ্যুত হইতে পারেন। অবশ্য এই অসদাচরণের অভিযোগ সুপ্রিম কোর্টে প্রেরিত হইলে সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক অভিযোগ সমর্থিত হওয়া চাই। অবসর গ্রহণের পর পরিষদপতির বা অন্য কোন সদস্যের আর পুনর্নিয়োগ হয় না।

রাষ্ট্রভৃত্য নিয়োগ পরিষদের কার্য (Functions of Public Service Commission)

সংবিধানের ৩২০ নং ধারায় রাষ্ট্রভৃত্য নিয়োগ পরিষদের কায বর্ণনা করা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় পরিষদের প্রধান কায হইল কেন্দ্রীয় কৃত্যকে লোক নিযুক্ত করিবার জন্য পরীক্ষা পরিচালনা করা। কোন দুইটি বা ততোধিক রাজ্য অনুরোধ করিলে কেন্দ্রীয় নিয়োগ পরিষদ যে-কোন কৃত্যকের বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থী নিয়োগ সম্পর্কে পরিকল্পনা গঠন ও কাযকরী করিয়া রাজ্যসরকারকে সাহায্য করিতে পারে।

সরকারী চাকুরিয়াগণের নিয়োগপদ্ধতি ও নীতি, পদোন্নতি, এক চাকুরি

হইতে অন্য চাকুরিতে বদলী, শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রভৃতি সম্পর্কে যাবতীয় বিষয়ে নিয়োগ পরিষদ পরামর্শদান করিতে পারে। পার্লামেণ্ট আইন প্রণয়ন করিয়া নিয়োগ পরিষদের উপর অতিরিক্ত ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারে। নিয়োগ পরিষদের যাবতীয় খরচ স্থায়ী খরচের (Consolidated fund of India) অন্তর্ভুক্ত।

নিয়োগ পরিষদকে প্রতিবৎসর রাষ্ট্রপতির নিকট ইহার কার্যের একটি বিবরণী দাখিল করিতে হয়। এই বিবরণী পাইলেই রাষ্ট্রপতি উহা পার্লামেণ্ট সভায় উপস্থাপিত করাইবেন।

সমালোচনা (Criticism)

শিশুরাষ্ট্র ভারতকে একটি কল্যাণ রাষ্ট্রে রূপায়িত করিবার কাজে সর্বভারতীয় কৃত্যকের গুরুত্ব স্বীকৃত হইলেও এই কৃত্যকের বহু বিরুদ্ধ সমালোচনা হইয়াছে। সর্বভারতীয় কৃত্যকগুলির মধ্যে ভারতীয় শাসন পরিচালনা ও পুলিশ কৃত্যক—এই দুইটি শাসনক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। এই কৃত্যকের বহু কর্মচারী রাজ্য শাসনক্ষেত্রেও প্রধান প্রধান পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, জেলা জজ, জেলার পুলিশের অধিকর্তা, রাজ্যের মুখ্য কর্মসচিব ও ডেপুটি কর্মসচিবগণ এই সর্বভারতীয় কৃত্যকের কর্মচারী। কিন্তু ইহারা রাজ্য-সরকারের কার্যে নিযুক্ত থাকেন। রাজ্যসরকারের অধীনস্থ কর্মচারী হইলেও এমন কি যখন ইহারা রাজ্যসরকার কর্তৃক প্রদত্ত কোন নির্দেশের বিরুদ্ধে কাজ করেন তখন রাজ্যসরকার ইহাদের বিরুদ্ধে কার্যকরী কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারেন না, কারণ এই কর্মচারিবৃন্দের বেতন, পদোন্নতি ও কার্যের শর্তাদি কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হয়। সুতরাং রাজ্যসরকারগুলি যে এই সর্বভারতীয় কৃত্যক ও ইহার প্রসারের পক্ষপাতী নহেন তাহার সঙ্গত কারণ আছে।

দ্বিতীয়তঃ, রাজ্যশাসনক্ষেত্রে নিযুক্ত এই সর্বভারতীয় কৃত্যকের কর্মচারি-বৃন্দের সাহায্যে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যসরকারগুলির শাসন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন। ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। স্বায়ত্তশাসনের প্রাথমিক শর্ত হইল প্রাদেশিক শাসনক্ষেত্রে রাজ্যসরকারগুলির কেন্দ্র-নিরপেক্ষভাবে শাসন পরিচালনা করা। ভারতের রাজ্যসরকারগুলিও রাজ্যতালিকাভুক্ত বিষয়গুলির শাসনব্যাপারে যে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণমুক্ত হইবে ইহা আশা কর

স্বাভাবিক। কিন্তু রাজ্যগুলির উচ্চপদে সর্বভারতীয় কৃত্যকরা কর্মচারী নিযুক্ত থাকার ফলে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার মূল নীতি (প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন) অনেক পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে।

তৃতীয়তঃ, কল্যাণরাষ্ট্রের স্থায়িত্ব ও অগ্রগতি বহুল পরিমাণে শাসক ও শাসিতের পারস্পরিক সহযোগিতা ও সদিচ্ছাব° উপর নির্ভর করে। কিন্তু রাজ্যশাসন ক্ষেত্রে সর্বভারতীয় কৃত্যকেব কর্মচারী নিযুক্ত হওয়ার ফলে এই সহযোগিতা সৃষ্টিতে বাধা প্রদান করিয়াছে।

চতুর্থতঃ, সর্বভারতীয় ভিত্তিতে এই কৃত্যকের কর্মচারিবৃন্দ নিযুক্ত হইযা থাকেন। সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতার জন্য অনেক সময় অনেক রাজ্যের কোন প্রার্থী প্রতিযোগিতার তীব্রতার কারণ সর্বভারতীয় কৃত্যকে নিযুক্ত না হইতে পারেন। সুতরাং অনেক সময এই সর্বভারতীয় কৃত্যক সকল রাজ্যের প্রতিনিধিমূলক হয় না। এ কারণেও শাসক-শাসিতের মধ্যে সহযোগিতার অভাব দেখা যায়।

এতদ্ব্যতীত, সর্বভারতীয় কৃত্যক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আরও কতিপয় অভিযোগ আনীত হইয়াছে। রাষ্ট্রভৃত্য নিয়োগ পরিষদ ইহার বার্ষিক বিবরণীতে অভিযোগ করিয়াছেন যে, ভারত সরকার নিযোগ ব্যাপারে সব সময় পরিষদের সুপারিশ গ্রহণ করেন না এবং অনেক ক্ষেত্রে ইহার সুপারিশমত নিয়োগে অযথা বিলম্ব করেন। কমিশন আরও বলিয়াছেন যে, ভারত সরকার যেন ইহার বিনা সম্মতিতে এক বৎসরের অধিককাল পর্যন্ত কোন অস্থায়ী নিয়োগ না করেন।

নিয়োগ পদ্ধতির বিরুদ্ধেও অভিযোগ করা যাইতে পারে। যে প্রতিযোগিতা-মূলক পরীক্ষা পদ্ধতিতে নিয়োগ করা হয়, সে পদ্ধতিও ত্রুটিশূন্য নহে। লিখিত পরীক্ষার গোপনীয়তা রক্ষা করা সম্ভব হইলেও মৌলিক অংশের পরীক্ষার ক্ষেত্রে অসাধু উপায় গ্রহণ ও পক্ষপাতিত্বের যথেষ্ট সম্ভাবনা দেখা যায়।

এই ব্যবস্থার আর-একটি ত্রুটি হইল যে, অধিক বেতনে বিশেষ সুযোগ-সুবিধার অধিকারী হইবার আশায় ভারতের মেধাবী যুবকগণ এই দিকে অধিকতর আকৃষ্ট হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় যোগদান করেন। ফলে ভারতের কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান ও শিক্ষাব্যবস্থা এই সমস্ত প্রতিভাবান যুবকগণের সেবা হইতে বঞ্চিত হয়।

রাজ্যভৃত্য নিয়োগ পরিষদ (State Public Service Commission)

কেন্দ্রের ন্যায় প্রত্যেক রাজ্যে একটি করিয়া নিয়োগ পরিষদ থাকিতে পারে। পার্লামেণ্টের আইনতঃ সম্মতিক্রমে দুই বা ততোধিক রাজ্য পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে একটি সাধারণ নিয়োগ পরিষদ গঠন করিতে পারে। কেন্দ্রীয় নিয়োগ পরিষদ কোন রাজ্যপালের অনুরোধে রাষ্ট্রপতির সম্মতিক্রমে কোন রাজ্যের পক্ষে কাজ করিতে পারে। রাজ্য নিয়োগ পরিষদ রাজ্য কৃত্যকের নিয়োগগুলি নিয়ন্ত্রণ করে এবং কেন্দ্রীয় নিয়োগ পরিষদ সম্পর্কে রাষ্ট্রপতির যে যে ক্ষমতা আছে, রাজ্যপালও রাজ্য নিয়োগ পরিষদ সম্পর্কে সেই সেই ক্ষমতার অধিকারী।

তবে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে, কেন্দ্রীয় নিয়োগ পরিষদ ও রাজ্য নিয়োগ পরিষদগুলি কর্মচারী নিয়োগ ব্যাপারে চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী নহে। সরকারী কৃত্যকসমূহে নিয়োগ ব্যাপারে ইহারা সুপারিশ করেন মাত্র। কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারগুলি ইচ্ছা করিলে নিয়োগ পরিষদের সুপারিশ অগ্রাহ্য করিতে পারে। তবে সাধারণতঃ সরকার এই সুপারিশ অগ্রাহ্য করেন না। সরকারের বিভিন্ন কাম যাহাতে দক্ষতার সহিত নিরপেক্ষভাবে সম্পাদিত হয়, সেজন্য দক্ষ ও নিরপেক্ষ কর্মচারী প্রয়োজন। সরকারী কর্মচারিগণ যদি পক্ষপাত দোষে দুষ্ট হন, তাহা হইলে শাসনব্যবস্থার উপর লোকের আস্থা থাকে না। এই উদ্দেশ্যেই প্রত্যেক দেশেই স্বাধীন ও সরকার-নিরপেক্ষ একটি রাষ্ট্রভৃত্য নিয়োগ পরিষদ গঠন করা হয়। রাষ্ট্রভৃত্য নিয়োগ পরিষদের কর্তব্য হইল শুধু যোগ্যতার ভিত্তিতে রাষ্ট্র কৃত্যকসমূহে কর্মচারী নিয়োগ করা। নিয়োগ পরিষদ যদি যথাযথভাবে ইহার কর্তব্য পালন করে, তাহা হইলে ইহার কাজে সরকারের আর হস্তক্ষেপ করিবার আদৌ প্রয়োজন হয় না। নিয়োগ পরিষদের কাযে অহেতুক হস্তক্ষেপ করিলে বা ইহার সুপারিশ অগ্রাহ্য করিলে তাহা আইনসভাকে জানাইতে হয়।

সংক্ষিপ্তসার

রাষ্ট্রকৃত্যক ও রাষ্ট্রভৃত্য নিয়োগ পরিষদ

সামরিক ও বে-সামরিক শাসনকাযে সরকার কর্তৃক যে সমুদয় কর্মচারী নিযুক্ত হয়, তাহাদিগকে লইয়াই রাষ্ট্রকৃত্যক গঠিত হয়। ভারতের নূতন সংবিধানে

পাঁচটি বিভিন্ন শ্রেণীর কৃত্যকের উল্লেখ দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে সর্বভারতীয়, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য জনপালন কৃত্যক সমধিক উল্লেখযোগ্য।

এই সমস্ত কৃত্যকে কর্মচারী নিয়োগ করিবার জন্য কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভৃত্য নিয়োগ পরিষদ ও রাজ্য নিয়োগ পরিষদ আছে। ভারতীয় শাসন পরিচালনা কৃত্যক এবং ভারতীয় পুলিশ কৃত্যক সর্বভারতীয় কৃত্যকের অন্তর্ভুক্ত। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভৃত্য নিয়োগ পরিষদ বিশেষভাবে পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া এই সমস্ত কৃত্যকের জন্য প্রার্থী নির্বাচন করিয়া নিয়োগের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট সুপারিশ করে। অনুরূপভাবে রাজ্যকৃত্যকগুলিতে কর্মচারী নিয়োগের জন্য রাজ্য নিয়োগ পরিষদগুলি রাজ্যসরকারগুলিকে সুপারিশ করে।

একজন পরিষদপতি ও অন্য কতিপয় সদস্য লইয়া কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভৃত্য নিয়োগ পরিষদ গঠিত হয়। ইঁহারা সকলেই রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন এবং ইঁহাদের কাজের শর্তাদিও রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্ধারিত হয়। ইঁহারা ৬৫ বৎসর পর্যন্ত কায করিতে পারেন। কেন্দ্রীয় কৃত্যকে লোক নিযুক্ত করিবার জন্য পরীক্ষা পরিচালনা করাই পরিষদের প্রধান কায। সরকারী কাযে নিয়োগ পদ্ধতি ও নীতি, পদোন্নতি, বদলী, শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রভৃতি সম্পর্কে নিয়োগ পরিষদ রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শদান করিতে পারে। নিয়োগ পরিষদকে রাষ্ট্রপতির নিকট ইহার কায সম্পর্কে বাৎসরিক একটি বিবরণী দাখিল করিতে হয়।

কেন্দ্রের ন্যায় প্রত্যেক রাজ্য অথবা দুই বা ততোধিক রাজ্যের জন্য একটি রাজ্য নিয়োগ পরিষদ থাকে। রাজ্য নিয়োগ পরিষদ রাজ্যকৃত্যকের নিয়োগগুলি সম্পর্কে রাজ্যসরকারকে সুপারিশ করে এবং কেন্দ্রীয় নিয়োগ পরিষদ সম্পর্কে রাষ্ট্রপতির যে ক্ষমতা আছে, রাজ্যপালও রাজ্যনিয়োগ পরিষদ সম্পর্কে সেই ক্ষমতার অধিকারী।

সর্বভারতীয় কৃত্যকগুলির বিরুদ্ধে রাজ্য সরকারগুলির কিছু আপত্তি আছে। কারণ এই কৃত্যকের শাসন পরিচালনা ও পুলিশ কৃত্যকের বহু কর্মচারী রাজ্যশাসন ক্ষেত্রে মুখ্য সচিব, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, জেলা জজ, জেলা পুলিশ অধিকর্তা হিসাবে নিযুক্ত থাকেন এবং এই সর্বভারতীয় কৃত্যকের কর্মচারিবৃন্দের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যশাসন ব্যাপার নিয়ন্ত্রণ করিতে পারেন। দ্বিতীয়ত, রাজ্যশাসন ক্ষেত্রে সর্বভারতীয় কৃত্যকের কর্মচারী নিয়োগের ফলে অনেক ক্ষেত্রে শাসক-শাসিতের মধ্যে গঠনমূলক সহযোগিতার অন্তরায় ঘটিয়াছে।

তৃতীয়তঃ, প্রতিযোগিতার তীব্রতার ফলে অনেক সময় এই কৃত্যক সকল রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করিতে পারে না।

নিয়োগ পদ্ধতিও ত্রুটিহীন নহে। মৌখিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে অসাধুতা ও পক্ষপাতিত্বের সম্ভাবনা দেখা যায়। পরিশেষে বলা যায় যে, উচ্চ বেতনের লোভে দেশের মেধাবী যুবকগণ এই দিকে অধিকতর আকৃষ্ট হওয়ার ফলে কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান ও শিক্ষা ব্যবস্থায় দেশ এই সমস্ত প্রতিভাবান যুবকগণের সেবা হইতে বঞ্চিত হয়।

প্রশ্নাবলী

1. Describe the composition and functions of the Union Public Service Commission.

2. "The organisation of the services on an all-India basis to administer the diverse and growing responsibilities of a welfare state is of paramount importance." Discuss the statement.

একবিংশ অধ্যায়
ভারতে সরকারী ভাষা
(Official Language in India)

ভারতে ভাষা সমস্যা (The Language Problem in India)

স্বাধীনতালাভের পর নূতন শাসনতন্ত্রের রচয়িতাগণের যে সমুদয় সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল, ভাষা সমস্যা তন্মধ্যে অন্যতম। বিভিন্ন জাতির দ্বারা অধ্যুষিত এই বিশালায়তনের দেশে ৬৩টি অ-ভারতীয় ভাষা সমেত প্রায় ৮৪৫টি ভাষা প্রচলিত আছে। শাসনতন্ত্রের রচয়িতাগণ প্রচলিত এই ভাষাসমূহের মধ্য হইতে ১৪টি ভাষাকে প্রধান কথ্যভাষা বলিয়া স্বীকৃতিদান করেন। কারণ ভারতের জনসংখ্যার শতকরা ৯১ জন এই ১৪টি প্রধান ভাষা-ভাষী। হিন্দী ও ইহার সমগোত্রীয় ভাষাদ্বয় উর্দু ও হিন্দুস্থানী ভাষার সংখ্যা হইল শতকরা ৪৬ জন। শাসনতন্ত্রের রচয়িতাগণ ভারতে শত বৎসরাধিক প্রচলিত জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা ইংরেজীকে একেবারে বর্জন করিবার অসুবিধা সম্যক অনুধাবন করিয়া কিছুদিন পর্যন্ত ইংরেজী ভাষাকে সরকারী ভাষা হিসাবে ব্যবহার করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

সরকারী ভাষা (Official Language)

শাসনতন্ত্র প্রণেতাগণ দেবনাগরী হরফে লিখিত হিন্দীকে সরকারী ভাষা বলিয়া স্বীকৃতি দান করেন। ভারতে সংখ্যাবাচক অক্ষরগুলি ভারতে ব্যবহৃত আন্তর্জাতিক সংখ্যাবাচক অক্ষরগুলির ন্যায় 1, 2, 3, 4, ইত্যাদি হইবে।

হিন্দী সরকারী ভাষা হিসাবে ব্যবহৃত হইলেও শাসনতন্ত্র প্রবর্তনের তারিখ হইতে ১৫ বৎসর পর্যন্ত ইংরেজী ভাষা পূর্বের ন্যায় সরকারী ভাষা হিসাবে চালু থাকিবে। এই ১৫ বৎসরের মধ্যে দেবনাগরী অক্ষরে লিখিত হিন্দী ও সংখ্যা-বাচক 1, 2, 3, 4 প্রভৃতি রাষ্ট্রপতি প্রবর্তন করিতে পারিবেন।

উপরি উক্ত ব্যবস্থা সত্ত্বেও পার্লামেণ্ট আইন প্রণয়ন করিয়া ১৫ বৎসর অন্তে নির্ধারিত বিষয়সমূহের জন্য ইংরেজী ভাষার ব্যবহার প্রবর্তন করিতে পারিবে।

আঞ্চলিক ভাষাসমূহ (Regional Languages)

কোন রাজ্যের আইনসভা হিন্দী বা এক বা একাধিক ভাষা অথবা সেই রাজ্যের ভাষা নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে ব্যবহার করিতে পারিবে। কোন রাজ্যের আইনসভা বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ না করা পর্যন্ত নূতন সংবিধান বলবৎ হইবার পূর্বের মত ইংরেজী ভাষাই সেই রাজ্যের সরকারী ভাষা হিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারিবে।

সর্বভারতে প্রচলিত ভাষাই রাজ্যগুলির মধ্যে এবং কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে সরকারী ভাষা হিসাবে ব্যবহৃত হইবে। দুই বা ততোধিক রাজ্য পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে হিন্দী ভাষাকে তাহাদের যোগসূত্রের বাহন হিসাবে ব্যবহার করিতে পারে।

সংখ্যালঘুদের ভাষা (Languages of Minorities)

কোন রাজ্যে বসবাসকারী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভাষারক্ষার ব্যবস্থাও সংবিধান কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে। কোন রাজ্যে বসবাসকারী কোন সম্প্রদায় সংখ্যালঘু হইলেও যদি সমগ্র জনসংখ্যার একটি বিশিষ্ট অংশ হয় তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি তাঁহার খুশীমত এই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভাষাকে কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের জন্য সমগ্র রাজ্যের অথবা কিয়দংশের সরকারী ভাষা হিসাবে ব্যবহার করিবার বিশেষ নির্দেশ দান করিতে পারেন। রাষ্ট্রপতির নির্দেশ অনুসারে সেই রাজ্যে সংখ্যালঘু ভাষার নির্দিষ্ট এলাকায় নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে ব্যবহার বাধ্যতামূলক হইবে।

সুপ্রিম কোর্ট ও উচ্চ বিচারালয়ের ভাষা (Official Languages of the Supreme Court, High Courts, etc.)

পার্লামেণ্ট বিকল্প ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত সুপ্রীম কোর্ট ও উচ্চ বিচারালয়ের যাবতীয় কার্যাদি এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারগুলির খসড়া আইন, পাস করা আইন, আদেশ, নির্দেশ প্রভৃতি ইংরেজী ভাষায় পরিচালিত হইবে। কোন রাজ্যের রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির সম্মতিক্রমে রাজ্যের উচ্চ বিচারালয়ের কার্য উক্ত রাজ্যের সরকারী ভাষার সাহায্যে পরিচালনা করিবার ক্ষমতা প্রদান করিতে পারেন। কিন্তু উচ্চ বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত বা আদেশ ইংরেজী ভাষায়ই দিতে হইবে। যদি কোন রাজ্যের আইনসভা ইংরেজী ব্যতীত অন্য কোন ভাষা

আইন বা জরুরী আইন প্রণয়নে অথবা নির্দেশদানে ব্যবহার করে তাহা হইলে রাজ্যপাল কর্তৃক অনুমোদিত ইহার ইংরেজী অনুবাদ প্রামাণ্য দলিল বলিয়া গণ্য হইবে।

উপরি-উক্ত ব্যবস্থা পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপতির পূব-অনুমোদন লাভ না করিয়া কোন আইন বা সংশোধনী প্রস্তাব পার্লামেণ্ট সভায় পেশ করা চলিবে না। রাষ্ট্রপতি ভাষা পরিষদ ও পার্লামেণ্টারি কমিটির সুপারিশ বিবেচনা না করিয়া অবশ্যই এবিষয়ে অনুমতি দান করিতে পারিবেন না।

বিশেষ নির্দেশ (Special Directives)

সংবিধানে নিদেশ দেওয়া হইয়াছে যে, যে কোন ব্যক্তি কেন্দ্র বা রাজ্যগুলিতে ব্যবহৃত যে কোন ভাষায় কোন বিষয়ে প্রতিকার প্রার্থনা করিয়া আবেদন করিতে পারে।

সংবিধানে আরও নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, কেন্দ্রীয় সরকার হিন্দী ভাষার উৎকর্ষ সাধনে এরূপ ব্যবস্থা করিবে যাহাতে এই ভাষার মাধ্যমে ভারতের বিমিশ্র কৃষ্টির বিভিন্ন উপাদানগুলি যথাযথভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে। হিন্দী ভাষা যাহাতে এই উদ্দেশ্যে পরিপুষ্ট হয়, তজ্জন্য নিম্নলিখিত ভারতীয় ভাষাসমূহ হইতে হিন্দীর প্রকাশ-ভংগী ও গঠন-প্রকৃতি গ্রহণ করিতে হইবে:— আসামী, বাংলা, গুজরাটী, পাঞ্জাবী, তামিল, তেলেগু, উর্দু ও সংস্কৃত। শব্দসম্ভারের জন্য হিন্দী সংস্কৃতের উপর প্রাথমিকভাবে নির্ভর করিবে, তবে অন্য ভাষা হইতেও শব্দ সংগ্রহ করিবে।

ভাষা পরিষদ ও পার্লামেণ্টারি সংস্থা (The Language Commission and the Parliamentary Committee)

সংবিধান বলবৎ হওয়ার পাঁচ বৎসর পরে এবং তারপর দশ বৎসর পরে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে সুপারিশ করিবার জন্য রাষ্ট্রপতি অবশ্যই একটি ভাষা পরিষদ গঠন করিবেন। বিষয়গুলি হইল:—(১) কেন্দ্রের সরকারি কার্যপরিচালনায় হিন্দী ভাষার উত্তরোত্তর প্রসার; (২) কেন্দ্রে ইংরেজী ভাষার ব্যবহার সর্বক্ষেত্রে বা কোন কোন ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ করা, (৩) সুপ্রিম কোর্ট, উচ্চ বিচারালয় ও আইনসভা প্রভৃতির সরকারী ভাষা; (৪) কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে বা একাধিক বিষয়ে ব্যবহার্য সংখ্যাসমূহের প্রকৃতি; (৫) ইহা ছাড়া, রাষ্ট্রপতি

কেন্দ্রে সরকারী ভাষা এবং কেন্দ্রের সহিত রাজ্যসমূহের কিম্বা আন্তঃরাজ্য যোগসূত্র রক্ষার জন্য সরকারী ভাষা সম্পর্কিত যে কোন বিষয়। এই পরিষদ একজন পরিষদপতি ও কতিপয় সদস্য লইয়া গঠিত হইবে। আঞ্চলিক প্রধান ভাষাসমূহের প্রতিনিধিগণ এই পরিষদের সদস্য থাকিবেন।

লোকসভার ২০ জন ও রাজ্যসভার ১০ জন সদস্য লইয়া গঠিত একটি পার্লামেণ্টারি সংস্থা ভাষা পরিষদের সুপারিশ সম্পর্কে রাষ্ট্রপতির নিকট একটি বিবরণী পেশ করিবেন। এই সুপারিশ বিবেচনা করিয়া রাষ্ট্রপতি সমগ্রভাবে অথবা আংশিকভাবে এই সুপারিশের ভিত্তিতে নির্দেশ দান করিবেন।

১৯৫৫ সালে বি, জি, খেরের সভাপতিত্বে প্রথম ভাষা পরিষদ গঠিত হয় এবং পর বৎসর এই পরিষদ ইহার বিবরণী দাখিল করে। ১৯৫৭ সালে পার্লামেণ্টারি সংস্থা এই বিবরণী পরীক্ষা করিয়া রাষ্ট্রপতির নিকট ইহার সুপারিশ দাখিল করে।

পার্লামেণ্টারি সংস্থার সুপারিশ বলবৎ করিবার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপতি ১৯৬০ সালের ২৭শে এপ্রিল এক নির্দেশনামা প্রচার করেন। এই নির্দেশের প্রধান বিষয়বস্তু হইল বৈজ্ঞানিক, প্রশাসনিক ও আইন-বিষয়ক সাহিত্যে হিন্দী পরিভাষা সৃষ্টি করা। প্রশাসনিক ও পরিচালনা-সংক্রান্ত ব্যাপারে ইংরেজী হইতে হিন্দীতে অনুবাদ করিবার ব্যবস্থা। হিন্দী পরিভাষা সৃষ্টি করিবার জন্য ভাষা পরিষদ একটি স্থায়ী সংস্থা গঠনের সুপারিশ করিয়াছিলেন এবং এই সুপারিশের ভিত্তিতে ১৯৬১ সালে একটি স্থায়ী সংস্থা গঠিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় বিকল্প ভাষা হিসাবে হিন্দীর প্রচলন, ইংরেজী ভাষায় রচিত আইনের হিন্দী অনুবাদ, যথাসময়ে সুপ্রিম কোর্টে হিন্দী ব্যবহার এবং উচ্চ বিচারালয়গুলির সিদ্ধান্ত প্রভৃতি ও হিন্দী ভাষায় লিখন প্রভৃতি রাষ্ট্রপতির নির্দেশভুক্ত ছিল।

অন্যান্য প্রচলিত ভাষা রক্ষাকল্পে নিম্নলিখিত নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে :—

১। কোন রাজ্যের সংখ্যালঘু ভাষাভাষীদের প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষা সংখ্যালঘুর ভাষায় পরিচালিত হইবে।

২। সংখ্যালঘু ভাষা রক্ষার জন্য একজন বিশেষ কর্মচারী নিযুক্ত হইবেন এবং তিনি এ সম্পর্কে যাবতীয় তথ্যসহ রাষ্ট্রপতির নিকট বিবরণী পেশ করিবেন।

সংক্ষিপ্তসার

ভারতে সরকারী ভাষা

শাসনতন্ত্রের রচয়িতাগণ শাসনতন্ত্র চালু হইবার সময় হইতে ইংরেজী ভাষাকে সরকারী ভাষা হিসাবে ব্যবহার করিবার নির্দেশ দান করেন। তাহার পর দেবনাগরী অক্ষরে লিখিত হিন্দী ভাষা সরকারী ভাষা হিসাবে সর্বভাবে চালু হইবে। তবে পার্লামেণ্ট আইন প্রণয়ন করিয়া ১৫ বৎসর অন্তে কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে ইংরাজী ভাষা চালু রাখিতে পারিবে।

কোন রাজ্যের আইনসভা হিন্দী বা এক বা একাধিক ভাষা অথবা সেই রাজ্যে প্রচলিত ভাষা অথবা বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ না করা পর্যন্ত ইংরাজী ভাষাকেই সেই রাজ্যের সরকারী ভাষা হিসাবে ব্যবহার করিতে পারে। সংখ্যা-লঘুদের ভাষা রক্ষারও ব্যবস্থা হইয়াছে।

সুপ্রীম কোর্ট ও উচ্চ বিচারালয়গুলির যাবতীয় কার্য সাধারণতঃ ইংরাজী ভাষায় পরিচালিত হইবে। হিন্দী ভাষার উৎকর্ষ সাধনের জন্যও নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে।

হিন্দী ভাষার ক্রমসম্প্রসারণ ও ইংরাজী ভাষার ক্রমসংকোচন প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে সুপারিশ করিবার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্দিষ্ট সময় অন্তে একটি ভাষা পরিষদ গঠনের ব্যবস্থাও সংবিধান কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে এবং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভাষা পরিষদ গঠিত হইয়া ইহা সুপারিশও পেশ করে। এই সুপারিশ একটি পার্লামেণ্টারি সংস্থা পরীক্ষা করিয়া রাষ্ট্রপতির নিকট বিবরণী পেশ করে এবং রাষ্ট্রপতি এই বিবরণীর ভিত্তিতে ভাষা সম্পর্কে এক নির্দেশনামা প্রচার করেন।

প্রশ্নাবলী

1. Explain the provisions of the constitution of India regarding the Official Language of the Union.

2. Discuss the provisions of the constitution of India regarding the Official Language of the Union and indicate Parliamentary discussion on the question.

দ্বাবিংশ অধ্যায়

শাসনতন্ত্রে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা

(Special Provisions in the Constitution relating to Certain Classes)

গণতন্ত্রে সংখ্যালঘুদের স্থান (Place of Minorities in a Democracy)

প্রায় এক শতাব্দী পূর্বে মিল্ বলিয়াছিলেন, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে সার্থকভাবে রূপায়িত করিতে হইলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ যথাযথভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। গণতন্ত্রের মূলনীতি হইল—স্বাধীনতা, সাম্য ও সামাজিক ন্যায়বিচার। সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই স্বাধীনতা, সাম্য ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে দেখিতে হইবে যে কোন ব্যক্তিই যেন কোন কারণে বিশেষ সুযোগ সুবিধার অধিকারী না হইতে পারে, আবার কোন ব্যক্তিই যে কোন কারণে তাহার ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত না হয়। সাম্যের ভিত্তিতে সকল শ্রেণীর লোককেই সমান সুযোগ দান করিতে হইবে। যাহারা অনুন্নত ও পতিত তাহাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা দ্বারা তাহাদের উন্নত করা রাষ্ট্রের কর্তব্য।

ভারতের নূতন সংবিধানে এই স্বাধীনতা ও সাম্যের নীতি বিশেষভাবে স্বীকৃত হইয়াছে। নূতন সংবিধানে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নির্বাচন প্রথা বিলুপ্ত করা হইয়াছে এবং জাতি বর্ণ-ধর্ম-নির্বিশেষে ভারতের সকল স্থানের অধিবাসীকে ভারতীয় নাগরিকের মর্যাদা দান করিয়া তাহাদের সমানাধিকার নীতি গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু এস্থলে একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ভারতীয় নাগরিকগণের মধ্যে এক বিশাল অংশ এখনও পর্যন্ত অনুন্নত ও পতিত। ভারতে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা যাহাতে সামগ্রিকভাবে সাফল্যমণ্ডিত হয়, তজ্জন্য এই পতিত জনসংখ্যার উন্নয়ন একান্ত অপরিহার্য। এই উদ্দেশ্যে ভারতের সংবিধানে এই অবহেলিত ও অবদমিত শ্রেণীগুলিকে তাহাদের উন্নত ভ্রাতৃবৃন্দের সমপর্যায়ে আনিবার জন্য কতকগুলি বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে। অনুন্নত শ্রেণীগুলির উন্নয়নের জন্য এই বিশেষ ব্যবস্থাগুলি সংবিধানে স্থান না পাইলে প্রস্তাবনায় উল্লিখিত সাম্যের বাণী নিরর্থক হইত।

ভারতের সংবিধানে প্রত্যেক ব্যক্তির ধর্মাচরণের অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। পাকিস্তানের সংবিধানের ন্যায় ভারতে কোন সম্প্রদায়ের বিশেষ ধর্মাচরণের অধিকার স্বীকার করিয়া অপরাপর সম্প্রদায়ের ধর্মাচরণের অধিকার ক্ষুণ্ণ করা হয় নাই।

ভারতের সংবিধানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভাষা ও কৃষ্টি রক্ষার অধিকার বিশেষভাবে স্বীকৃত হইয়াছে। সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় কোনমতে ইহার ভাষা ও কৃষ্টি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর আরোপ করিতে পারিবে না। এই উদ্দেশ্যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বালক-বালিকাগণ প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে যাহাতে তাহাদের মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা হইয়াছে ও এ বিষয়ে রাষ্ট্রপতি রাজ্যসরকারকে নির্দেশদান করিতে পারিবেন। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভাষা সংরক্ষণ ও এ সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে বিবরণী দিবার জন্য একজন বিশেষ কর্মচারী নিযুক্ত হইবেন।

সরকার কর্তৃক পরিচালিত অথবা সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত কোন শিক্ষাকেন্দ্রে জাতি-বর্ণ ধর্ম নির্বিশেষে সকলের সমান প্রবেশাধিকার থাকিবে।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলি তাহাদের ইচ্ছামত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করিতে পারিবে এবং এই বিদ্যালয়ে তাহাদের নিজস্ব ভাষা ও লিপি ব্যবহার করিবার অধিকার থাকিবে। ভাষা ও ধর্ম নির্বিচারে রাষ্ট্র সকল শ্রেণীর বিদ্যালয়ে সমান সাহায্য প্রদান করিবে।

জাতি-বর্ণ ধর্ম-নির্বিচারে সকল ব্যক্তিই সরকারী কাজে নিযুক্ত হইবার সমান অধিকার পাইবে। জাতি বা ধর্মের ভিত্তিতে কাহাকেও বিশেষ সুবিধা দান করা হইবে না।

তপশীলী জাতি, তপশীলী সম্প্রদায় ও অন্যান্য অনুন্নত শ্রেণীর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা (Special Provision for the upliftment of Scheduled caste and Tribes and other backward classes)

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ভারতের জনসংখ্যার এক বিশাল অংশ অনুন্নত। শাসনতন্ত্রের প্রস্তাবনায় উল্লিখিত সামাজিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাকল্পে অনুন্নত সম্প্রদায়গুলির সামগ্রিক উন্নয়ন উদ্দেশ্যে কতকগুলি বিশেষ ব্যবস্থার কথা সংবিধানে উল্লিখিত হইয়াছে। অনুন্নত সম্প্রদায়গুলিকে তপশীলী জাতি ও তপশীলী সম্প্রদায়ে ভাগ করা হইয়াছে। রাষ্ট্রপতি সংশ্লিষ্ট রাজ্যের

রাজ্যপালের সহিত পরামর্শ করিয়া কোন সম্প্রদায়কে তপশীলীভুক্ত সম্প্রদায় বলিয়া ঘোষিত করিতে পারেন। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্ধারিত তপশীলীভুক্ত সম্প্রদায়ের তালিকা ১৯৫৬ সালের বিশেষ আইন দ্বারা সংশোধিত হইয়াছে।

এই অনুন্নত শ্রেণীগুলির উন্নয়নের উদ্দেশ্যে যে সকল বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে, সে ব্যবস্থাগুলি বৈষম্যমূলক বলিয়া ভারতের অন্য কোন নাগরিক সেই ব্যবস্থাগুলির বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন করিতে পারিবে না।

লোকসভায় ও রাজ্যগুলির বিধানসভায় এই শ্রেণীগুলির জন্য বিশেষ প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সরকারী পদে নিয়োগক্ষেত্রেও ইহাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

শাসনতন্ত্র চালু হইবার দশ বৎসর পরে রাষ্ট্রপতি এই অনুন্নত সম্প্রদায়গুলির উন্নয়ন সম্পর্কে বিবরণী দিবার জন্য একটি পরিষদ গঠনের ব্যবস্থা করিতে পারেন এবং এ সম্পর্কে রাজ্যসরকারগুলিকেও নির্দেশ দান করিতে পারেন। অনুন্নত শ্রেণীগুলির উন্নয়নের পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার ব্যয় বাবদ কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যসরকারগুলিকে আর্থিক সাহায্যও প্রদান করিবেন। অনেকগুলি রাজ্যে এই উদ্দেশ্যে 'কল্যাণ পরিষদ' (Welfare Department) গঠিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া, অনুন্নত শ্রেণীগুলির অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত স্বার্থ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যসরকারগুলিকে স্থায়িভাবে নির্দেশ দান করিয়াছে।

শাসনতন্ত্রের রচয়িতাগণ তপশীলী জাতি ও তপশীলী সম্প্রদায়গুলির স্বার্থ-সংরক্ষণ ও উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, তাঁহারা অনগ্রসর সম্প্রদায়ের (Backward classes) অগ্রগতির সাহায্যকল্পে আরও বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন। অনগ্রসর সম্প্রদায়ের উন্নয়নকল্পে ১৯৫৩ সালে একটি বিশেষ কমিশন নিযুক্ত হয়। এই সম্প্রদায়গুলির ভাষা, কৃষ্টি, ধর্ম, শিক্ষা প্রভৃতির সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য তাহাদের বিশেষ সুবিধা দান করা হইয়াছে। প্রত্যেক রাজ্যে এই উদ্দেশ্যে একজন মন্ত্রীর অধীনে একটি পৃথক দপ্তর খোলা হইয়াছে।

ইঙ্গ-ভারতীয়দের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা (Special Provisions for the Anglo-Indian Community)

ভারতের সামাজিক ব্যবস্থায় ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায়ের স্থান অন্যান্য সম্প্রদায়-

গুলির স্থান হইতে একটু পৃথক। ভারতের স্থায়ী বাসিন্দা হইলেও এই সম্প্রদায়ের লোকের পিতৃ-কুল ইউরোপ বংশজাত।

শাসনতন্ত্র চালু হইবার পর ২০ বৎসর পর্যন্ত এই সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষাকল্পে লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভাগুলিতে ইহাদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। লোকসভায় রাষ্ট্রপতি এই সম্প্রদায় হইতে দুইজন প্রতিনিধি মনোনয়ন করিতে পারিবেন এবং রাজ্য বিধানসভাগুলিতে রাজ্যপালগণ প্রয়োজন অনুসারে বিবেচনা করিয়া প্রতিনিধি সংখ্যা স্থির করিবেন। শুল্ক, পোষ্ট ও রেল বিভাগে নিয়োগ সম্পর্কে এই সম্প্রদায় যে বিশেষ সুবিধার অধিকারী ছিল, শাসনতন্ত্র ১০ বৎসরকাল চালু থাকিবার পরে তাহা উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে। শিক্ষাক্ষেত্রেও আর বিশেষ আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয় না। তবে তপশীলী জাতির উন্নয়নের জন্য যে বিশেষ কর্মচারী নিযুক্ত হন তিনিই ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায়েরও তত্ত্বাবধান করেন।

সংক্ষিপ্তসার

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা

ভারতের সংবিধানে স্বাধীনতা ও সাম্যের নীতি বিশেষভাবে ঘোষিত হইয়াছে। কিন্তু ভারতের জনগণের এক বিশাল অংশ এখনও পশ্চাৎপদ পতিত ও অনুন্নত। এই পতিত ও অবহেলিত সম্প্রদায়ের লোকগুলির উন্নয়নের জন্য সংবিধানে কতিপয় বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে।

ভারতের সংবিধানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভাষা, কৃষ্টি ও ধর্মরক্ষার অধিকার বিশেষভাবে স্বীকৃত হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপতি রাজ্যসরকারগুলিকে নির্দেশ দান করিতে পারিবেন। সকল ব্যক্তিই সমানভাবে সরকারী কাজে নিযুক্ত হইতে পারিবে।

তপশীলী জাতি ও তপশীলীভুক্ত সম্প্রদায়গুলির জন্য লোকসভায় ও রাজ্য-গুলির বিধানসভায় বিশেষ প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা হইয়াছে। সরকারী পদে নিয়োগ ক্ষেত্রেও ইহাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে। অনুন্নত শ্রেণীগুলির উন্নয়নের জন্য অনেক রাজ্যে 'উন্নয়ন পরিষদ' গঠিত হইয়াছে। অনগ্রসর সম্প্রদায়ের উন্নয়নকল্পে প্রত্যেক রাজ্যে একজন মন্ত্রীর অধীনে একটি

বিশেষ দপ্তর খোলা হইয়াছে। এই সম্প্রদায়গুলির ভাষা, কৃষ্টি, ধর্ম, শিক্ষা প্রভৃতির সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য তাহাদের বিশেষ সুবিধা দান করা হয়।

ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষাকল্পে আইন সভাগুলিতে আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা হইয়াছে। শাসনতন্ত্র চালু হইবার পর দশ বৎসর পর্যন্ত কয়েকটি বিশেষ সরকারী কার্যে ইহাদের বিশেষ সুবিধা দান করা হইত।

প্রশ্নাবলী

1. Give an account of the special constitutional provisions in favour of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and the Anglo-Indian Community and discuss briefly the value of such provisions.

2. By what constitutional methods are the rights of minorities safeguarded in India? Indicate the utility and implications of these methods.

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গের স্থানীয় শাসন

(An outline of Local Government in West Bengal)

স্থানীয় শাসন কাহাকে বলে (What is Local Government)

একটি দেশকে যখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করিয়া প্রত্যেক অংশ শাসন করিবার জন্য পৃথক শাসনব্যবস্থা থাকে, তখন ইহাকে স্থানীয় শাসন বলা হয়। সমগ্র ভারত কতকগুলি রাজ্যে বিভক্ত। রাজ্যগুলিকে আবার কতকগুলি বিভাগে ভাগ (Division) করা হইয়াছে। আবার বিভাগগুলি কতকগুলি জেলা (District) লইয়া গঠিত। জেলাগুলি আবার কতকগুলি মহকুমা (Sub-division) লইয়া গঠিত। মহকুমায় কতকগুলি থানা (Police Station) থাকে এবং থানার অধীনে ছোট-বড় অনেক গ্রাম (Village) থাকে। রাজ্য হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রাম পর্যন্ত প্রত্যেকটি অঞ্চলের নিজস্ব কতকগুলি সমস্যা থাকে এবং ঐ সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য প্রত্যেকটি অঞ্চলে একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানগুলির বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল।

বিভাগ ও বিভাগীয় শাসনকর্তা (Division and Divisional Commissioner)

কতকগুলি জেলা লইয়া একটি বিভাগ গঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে দুইটি বিভাগ আছে ; যথা, ১। প্রেসিডেন্সী বিভাগ ও ২। বর্ধমান বিভাগ। প্রেসিডেন্সী বিভাগ—কলিকাতা, ২৪ পরগণা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিম-দিনাজপুর, মালদহ, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও দার্জিলিং এই নয়টি জেলা লইয়া গঠিত। হাওড়া, হুগলী, বর্ধমান, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, বীরভূম ও পুরুলিয়া এই ৭টি জেলা বর্ধমান বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। রাজ্য পুনর্গঠন আইন বলবৎ হওয়ার ফলে ১৯৫৬ সালের ১লা নভেম্বর হইতে পুরুলিয়া ও পূর্ণিয়া জেলার কিয়দংশ পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় জেলার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

প্রত্যেক বিভাগে একজন বিভাগীয় কমিশনার থাকেন। ইনি ভারতীয়

শাসনবিভাগের (I. A. S.) অভিজ্ঞ কর্মচারী। তাঁহার বিভাগের অন্তর্ভুক্ত জেলাগুলির শাসনকার্যের তদারক করা ছাড়াও তিনি বিভাগীয় ভূমি-রাজস্ব ও নাবালকের সম্পত্তিরক্ষা বিষয়ের অধিকর্তা। তিনি জেলাশাসক ও রাজ্যসরকারের মধ্যে যোগসূত্র।

জেলাশাসক (The District Magistrate and Collector)

জেলাগুলিই হইল ভারতের শাসনব্যবস্থার প্রধান অঙ্গ এবং জেলার শাসকই হইলেন শাসনব্যবস্থার প্রকৃত মেরুদণ্ড। প্রত্যেক জেলায় একজন জেলাশাসক থাকেন। তিনি একদিকে জেলাশাসনের সর্বময় কর্তা, অপরদিকে জেলার রাজস্ব আদায় করিবার ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত থাকে। ইহা ছাড়া, তিনি আবার ফৌজদারী মামলার বিচারও করিয়া থাকেন। উপজাতি-অধ্যুষিত এলাকায় তাহাকে ডেপুটি কমিশনার বলা হয়। জেলাশাসক পূর্বে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের সদস্য ছিলেন। বর্তমানে তিনি ভারতীয় শাসনবিভাগীয় কৃত্যকের (I. A S.) কর্মচারী। কখনও কখনও প্রাদেশিক শাসন-বিভাগীয় কৃত্যকের অভিজ্ঞ কর্মচারীকে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পদে উন্নীত করা হয়।

জেলাশাসকের প্রধানতঃ তিন প্রকারের কাজ করিতে হয়। জেলার প্রধান শাসনকর্তা হিসাবে তাঁহাকে জেলার শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে হয়। এইজন্য তাঁহাকে পুলিশের কায নিয়ন্ত্রণ করিতে হয়। জেলাশাসনের অন্যান্য বিষয়গুলি তাঁহাকে তদারক ও পরিদর্শন করিতে হয়। কৃষি, চিকিৎসা, জেল, সেচ, বন ও জেলার শিক্ষাব্যবস্থা তাঁহাকে তদারক করিতে হয়। অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টির ফলে দুর্ভিক্ষ হইলে ইহার প্রতিকারের দায়িত্ব জেলাশাসকের উপর ন্যস্ত। তাঁহাকেই কৃষি ঋণদানের ব্যবস্থা করিতে হয়। মিউনিসিপ্যালিটি, জেলাবোর্ড ও গ্রাম পঞ্চায়েৎগুলির কার্যের উপর দৃষ্টি রাখাও তাঁহার অন্যতম দায়িত্ব। তাঁহাকেই জেলাশাসন সম্পর্কে রাজ্যসরকারকে প্রয়োজনীয় সংবাদ ও তথ্য সরবরাহ করিতে হয়। জেলার কোন অংশে কোন অশান্তি ঘটিলে তাঁহাকেই পুলিশের সাহায্যে অশান্তি দূর করিতে হয়।

দ্বিতীয়তঃ, ম্যাজিস্ট্রেট হইলেন আবার কালেক্টর অর্থাৎ জেলার ভূমি-রাজস্ব ও অন্যান্য রাজস্ব সংগ্রহের দায়িত্ব তাঁহার উপর ন্যস্ত। প্রত্যেক জেলায় যে সরকারী কোষাগার (Treasury) থাকে তাহার ভারও জেলাশাসকের উপর ন্যস্ত থাকে। সরকারী খাসমহল ও নাবালকের সম্পত্তি পরিচালনা তাঁহাকেই

করিতে হয়। ইহা ছাড়া, জেলার অধিকর্তা হিসাবে তাঁহাকে অনেক সামাজিক অনুষ্ঠানেও যোগদান করিতে হয়।

তৃতীয়তঃ, তিনি ফৌজদারী মামলার বিচার করেন এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত হইতে আনীত আপীল মামলাগুলির বিচার করিতে পারিবেন।

উপরে জেলাশাসকের কার্যের যে তালিকা দেওয়া হইল তাহা হইতে স্বভাবতঃই মনে হয় যে, অসাধারণ কর্মশক্তি না থাকিলে জেলাশাসকের কায সুষ্ঠুভাবে করা দুঃসাধ্য। এইজন্য প্রতিযোগিতামূলক লিখিত, মৌখিক ও স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত পরীক্ষা করিয়া উপযুক্ত যোগ্যতা-সম্পন্ন যুবকগণকে এই পদে নিযুক্ত করা হয়। জেলাশাসককে শুধু সু-শাসক হইলে চলিবে না, তাঁহার উপর জেলার হাজার হাজার লোকের সুখ-দুঃখ নির্ভর করে। এজন্য তাঁহার মধ্যে জনপ্রিয় নেতার গুণ থাকা চাই। শিষ্টের পালন ও দুষ্টের দমন হইল জেলা-শাসকের প্রধান কর্তব্য। এজন্য একদিকে যেরূপ তাঁহাকে কঠোর হইতে হয়, অপরদিকে সেইরূপ কোমল-স্বভাব ও সহানুভূতিসম্পন্ন হইতে হয়। জনসাধারণের সহিত মিলিয়া-মিশিয়া তাহাদের অসুবিধা দূর করিয়া সুবিধা সৃষ্টি করাই হইল জেলাশাসকের পবিত্র কর্তব্য।

ভারতে জেলাশাসকের বিভিন্ন কাজ সম্পর্কে একটি বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে। জেলাশাসক একদিকে জেলার শাসক, আবার অপরদিকে বিচারক। ক্ষমতার পৃথকীকরণ নীতি অনুযায়ী একই ব্যক্তির হস্তে শাসনক্ষমতা ও বিচার-ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকা সমীচীন নহে, কারণ জেলাশাসক পুলিসের কর্তা হিসাবে যাহাকে গ্রেপ্তার করিতে পারেন আবার বিচারক হিসাবে তাহাকে শাস্তি দিতে পারেন। একই ব্যক্তির উভয়বিধ ক্ষমতা থাকিলে অভিযুক্ত ব্যক্তি সুবিচার পাইতে পারে না এবং এই অবস্থায় ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয়। এই কারণে ম্যাজিস্ট্রেটের হাত হইতে বিচার-ক্ষমতা সরাইয়া লওয়া উচিত। নূতন শাসন-তন্ত্রের নির্দেশাত্মক নীতিতে শাসন-বিভাগ ও বিচার-বিভাগের পৃথকীকরণনীতি স্বীকৃত হইয়াছে এবং ভারতের কয়েকটি রাজ্যসরকার ইতিমধ্যে কার্যক্ষেত্রে এই নীতি বলবৎ করিতেছেন।

মহকুমা শাসন (Administration of Sub-division)

প্রত্যেক জেলা কতকগুলি মহকুমা লইয়া গঠিত। প্রত্যেক মহকুমায় একজন

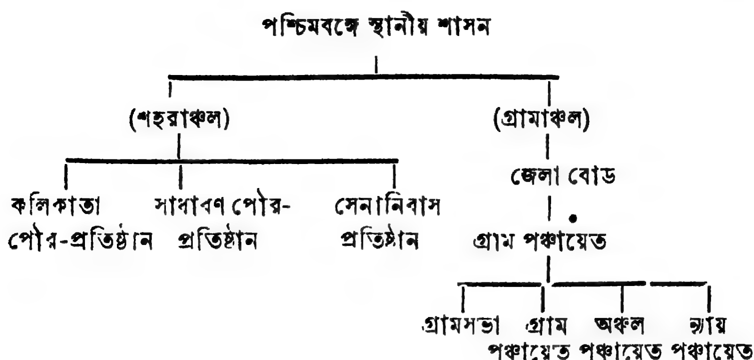
মহকুমা শাসক থাকেন। তিনি মহকুমার সর্ববিষয়ে শাসনকর্তা হইলেও জেলার ম্যাজিস্ট্রেট তাঁহার কার্যের তদারক করেন।

থানা (Police Station)

পল্লী-অঞ্চলে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার জন্য এক বা একাধিক গ্রাম লইয়া একটি থানা গঠিত হয়। থানায় পুলিশের একজন ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী (Officer-in-charge—O. C.) থাকেন। তাঁহার দুই-একজন সহকারী থাকেন। ইহা ছাড়া, কয়েকজন কনেস্টবল থাকে। গ্রামে গ্রামে চৌকিদার ও দফাদার থাকে। থানার মধ্যে কোথাও শান্তিভঙ্গ হইলে বা অপরাধ অনুষ্ঠিত হইলে চৌকিদার থানায় সংবাদ দেয়। প্রত্যেক জেলায় পুলিশের একজন পদস্থ কর্মচারী (Superintendent of Police) থাকেন। তিনি জেলার সমস্ত পুলিশের কার্য পরিদর্শন করেন।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন (Local Self-Government)

গ্রাম, নগর প্রভৃতি প্রত্যেক স্থানীয় অঞ্চলের কতকগুলি স্থানীয় সমস্যা থাকে। যদি স্থানীয় লোকের দ্বারা এই স্থানীয় সমস্যাগুলির সমাধান হয়, তাহা হইলে স্থানীয় লোকে সাধারণ-সম্পর্কিত কাজে অংশ গ্রহণ করিতে পারে। ইহাতে তাহাদের রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি পায় এবং তাহারা সহযোগিতার ভিত্তিতে তাহাদের সাধারণ-সম্পর্কিত স্বার্থগুলি রক্ষা করিবার শিক্ষা পায়। দূরে অবস্থিত কেন্দ্রীয় সরকার অপেক্ষা স্থানীয় লোকে স্থানীয় সমস্যাগুলির দ্রুত ও অপেক্ষাকৃত ভালভাবে সমাধান করিতে পারে। সুতরাং স্থানীয় শাসনব্যবস্থার সাহায্যেই গণতান্ত্রিক আদর্শ কার্যকরী করা সম্ভব হয়। এই উদ্দেশ্যে ইংরাজ শাসনকাল হইতেই ভারতীয় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের প্রবর্তন করা হয়। ১৯১৯ সালের সংস্কার আইনের সাহায্যে ভারতের শহরাঞ্চলে ও গ্রামাঞ্চলে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি শহরে বিশেষ আইনের বলে কর্পোরেশন ও অন্যান্য শহরে মিউনিসিপ্যালিটি গঠিত হয়। যেখানে সেনানিবাস থাকে সেখানে ক্যান্টনমেণ্ট বোর্ড সৃষ্টি হয়। গ্রামাঞ্চলের জন্য জেলায় জেলায় জেলা বোর্ড, মহকুমায় লোকাল বোর্ড অথবা তালুক বোর্ড এবং গ্রামে ইউনিয়ন বোর্ড বা গ্রাম পঞ্চায়েতের সৃষ্টি হয়।



পৌর-প্রতিষ্ঠান

কলিকাতা পৌর-প্রতিষ্ঠান (Calcutta Corporation)

কলিকাতা পৌর-প্রতিষ্ঠান পরলোকগত দেশনেতা সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্ত্রিত্বকালে সৃষ্টি হয়। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ইহার প্রথম মেয়র ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ইহার প্রধান কর্মসচিব ছিলেন। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দের কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন অনুসারে এই প্রতিষ্ঠানের পুরাতন গঠনতন্ত্র পরিবর্তন করিয়া নূতন গঠনতন্ত্রের সৃষ্টি হয়। ১৯৫২ ও ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে এই নূতন আইনটির কিছু পরিবর্তন করা হয়।

গঠনতন্ত্র—নূতন আইন অনুসারে ৮৬ জন সদস্য লইয়া কলিকাতা পৌর-প্রতিষ্ঠান গঠিত হইত। সাধারণ ভোটদাতৃগণ প্রত্যক্ষভাবে ৮০ জন সদস্য নির্বাচন করে এবং এই ৮০ জন সদস্য ভোট দিয়া ৫ জন অল্ডারম্যান নির্বাচন করিতেন। ইহা ছাড়া, কলিকাতা নগরোন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের (Calcutta Improvement Trust) সভাপতি পদাধিকার বলে (Ex-officio) পৌর-প্রতিষ্ঠানের একজন সদস্য হইয়া থাকেন। নূতন আইন পুনরায় সংশোধিত হওয়ার ফলে বর্তমানে কলিকাতা কর্পোরেশন ১০০টি ওয়ার্ডে বিভক্ত হইয়াছে। এই একশত ওয়ার্ড হইতে বর্তমানে ১০০ জন কাউনসিলার নির্বাচিত হন এবং ইঁহারা ভোট দিয়া পাঁচজন অল্ডারম্যান নিযুক্ত করেন। ইহা ছাড়া, কলিকাতা নগরোন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের সভাপতি পদাধিকার বলে একজন সদস্য হইয়া থাকেন। সুতরাং বর্তমানে কর্পোরেশনের সদস্য-সংখ্যা হইল (১০০ + ৫ + ১) = ১০৬।

কর্পোরেশনের সদস্যগণকে কাউনসিলার বলা হয়। কাউনসিলার ও অল্ডারম্যানগণ ৪ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন। রাজ্যসরকার ইহাদের কার্যকাল এক বৎসর বৃদ্ধি করিতে পারেন। বাৎসরিক প্রথম অধিবেশনের সময় কাউনসিলার ও অল্ডারম্যানগণ সদস্যগণের মধ্য হইতে এক বৎসরের জন্য একজন মেয়র ও একজন ডেপুটি মেয়র নির্বাচন করেন। মেয়র কর্পোরেশনের সভায় সভাপতিত্ব করেন। তাঁহার কোন বেতন না থাকিলেও তিনি যথেষ্ট সম্মান ও প্রতিপত্তির অধিকারী। তিনিই নগরের প্রথম ও প্রধান নাগরিক ((First Citizen) বলিয়া গণ্য হন। তাঁহার অনুপস্থিতিকালে ডেপুটি মেয়র কর্পোরেশনের সভার সভাপতিত্ব করেন।

প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারে কর্পোরেশনের সদস্যগণ নির্বাচিত হন।

কতকগুলি ওয়ার্ড বা পল্লী লইয়া একটি অঞ্চল গঠিত হয় এবং এই পল্লীগুলির সদস্যগণকে লইয়া আঞ্চলিক কমিটি (Borough Committee) গঠিত হয়।

কর্পোরেশনের বিভিন্ন কাজের জন্য কয়েকজন সদস্য লইয়া এক-একটি স্থায়ী কমিটি (Standing Committee) গঠিত হয়; কিন্তু কোন সদস্যই একটির অধিক কমিটির সদস্য হইতে পারেন না। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গৃহ-নির্মাণ, অর্থ প্রভৃতি নয়টি কমিটি আছে এবং এই প্রত্যেক বিভাগের কাজ স্থায়ী কমিটিতে আলাপ-আলোচনা হইবার পর কর্পোরেশনের সভায় পেশ করা হয়।

কর্পোরেশনের সভার সমস্ত সদস্য মিলিত হইয়া কাজের নীতি ও তালিকা স্থির করেন। সভায় যে সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করা হয়, তাহা স্থায়ী কর্মচারিগণ কার্যে রূপ দান করেন। এজন্য কর্পোরেশনে একজন মুখ্য কর্মসচিব (Chief Commissioner), একাধিক উপ-কর্মসচিব, মুখ্য এঞ্জিনিয়ার, মুখ্য স্বাস্থ্যাধিকার ও আরও অসংখ্য কর্মচারী আছেন। মুখ্য কর্মসচিব হইলেন কর্পোরেশনের স্থায়ী কর্মচারিগণের প্রধান। ইনি রাজ্যসরকার কর্তৃক রাষ্ট্রভৃত্য নিয়োগ পরিষদের সুপারিশক্রমে নিযুক্ত হন। অন্যান্য কর্মচারিগণ কর্পোরেশন কর্তৃক নিযুক্ত হইলেও মুখ্য এঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি উচ্চপদের নিয়োগগুলি রাজ্যসরকারের অনুমোদন-সাপেক্ষ।

পৌর-প্রতিষ্ঠানের কাজ (Functions of Corporation)

কলিকাতা কর্পোরেশনের বহুবিধ কাজ করিতে হয়। কাজগুলিকে মোটামুটি চারি ভাগে ভাগ করা যায়; জনস্বাস্থ্য, জননিরাপত্তা, জন-সুবিধা

এবং জন-শিক্ষা (প্রাথমিক)। এই উদ্দেশ্যে কর্পোরেশন শহরের রাস্তাঘাট, পার্ক প্রভৃতি নির্মাণ করে। রাস্তাগুলির নামকরণ করা, পরিষ্কার করা, জল দেওয়া ও রাত্রিকালে আলো দেওয়া এবং শহরে পরিস্রুত ও অপরিস্রুত জল সরবরাহ করা কর্পোরেশনের কাজ। কলের জল ছাড়াও এজন্য কর্পোরেশন শহরের মধ্যে বহু নলকূপ খনন করিয়াছে। কর্পোরেশন শহরে বাড়ী-ঘর-দুয়ার নির্মাণ-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে। ইহার অনুমতি ব্যতীত কেহ গৃহাদি নির্মাণ করিতে পারে না। জন-নিরাপত্তা রক্ষার জন্য কর্পোরেশন জীর্ণ বাড়ী-ঘর-দুয়ার ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারে। জনস্বাস্থ্য রক্ষাকল্পে হাসপাতাল, চিকিৎসালয়, প্রভৃতি স্থাপন করে এবং এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে অর্থ সাহায্য করে। কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ হ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে টিকা দিবার ব্যবস্থা করে এবং শহরের ময়লা ও আবর্জনা পরিষ্কারের ব্যবস্থা করে। কর্পোরেশন বাজার প্রতিষ্ঠা করে এবং পশুহত্যা-শালা স্থাপন করে। হিন্দুদের জন্য শ্মশান এবং মুসলমান ও খ্রীষ্টানগণের গোরস্থান স্থাপন ও সংরক্ষণও কর্পোরেশনের কাজ। কলিকাতা কর্পোরেশনের আর একটি কাজ হইল শহর এলাকায় অগ্নিনির্বাপণের ব্যবস্থা করা। এই উদ্দেশ্যে কর্পোরেশন অগ্নিনির্বাপক-বাহিনী (Fire Brigade) গঠন করিয়াছে। কলিকাতা কর্পোরেশনের আর একটি কৃতিত্ব হইল যে, ইহা শহর এলাকায় বহু অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া ইহাদের সাহায্যে বিশেষ করিয়া দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষার বিস্তার করিতেছে। শহরের বহু গ্রন্থাগারকে কর্পোরেশন অর্থ সাহায্য করে। শহরের লোকের জন্ম ও মৃত্যুর হিসাব রাখে। কর্পোরেশনের নিজস্ব একটি প্রদর্শনী আছে। দেশীয় শিল্পগুলিকে উৎসাহ দিবার উদ্দেশ্যেই নিচক দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্য এই প্রদর্শনীতে রাখা হয়।

পৌর-প্রতিষ্ঠানের আয়ের উৎস (Sources of Income)

উপরে কর্পোরেশনের কাজের যে দীর্ঘ তালিকা দেওয়া হইল তাহা হইতে সহজেই অনুমান করা যায় যে, এই নানাবিধ কাযের জন্য বহু অর্থ ব্যয় হয়। ব্যয়-সংকুলান করিবার জন্য কর্পোরেশন নিম্নলিখিত উৎসগুলি হইতে অর্থ সংগ্রহ করে।

১। বাড়ী ও জমির মূল্যের উপর কর (Rate), ২। ব্যবসায় ও বাণিজ্যের উপর কর, ৩। গরু, কুকুর প্রভৃতি পশুর উপর ও শকটাদি যান-

বাহনের উপর কর, ৪। রাজ্যসরকার কর্তৃক আদায়ীকৃত মোটর গাড়ীর উপর ধার্য করের একটি অংশ, ৫। কর্পোরেশনের নিজস্ব বাজার ও অন্যান্য সম্পত্তি হইতে আয়, ৬। রাজ্যসরকার কর্তৃক অর্থসাহায্য, ৭। রাজ্যসরকারের অনুমতি লইয়া ঋণগ্রহণ।

কলিকাতা কর্পোরেশনের বাৎসরিক আয় আড়াই কোটি টাকারও অধিক। এই বিপুল আয় জনস্বাস্থ্য, জন-নিরাপত্তা, জন-সুবিধা ও প্রাথমিক শিক্ষামূলক কার্যে ব্যয় হয়। ইদানীং কর্পোরেশনের কার্যে নানাবিধ দুর্নীতি ও অযোগ্যতা দেখা যায়। এইজন্য কয়েক বৎসর পূর্বে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই প্রতিষ্ঠানকে বাতিল করিয়া ইহার পরিচালনা-ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। নাগরিকগণ যতদিন পর্যন্ত তাঁহাদের পৌর অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত না হইবেন ততদিন পর্যন্ত পৌর-প্রতিষ্ঠানের কাজ দক্ষতার সহিত পরিচালিত হইতে পারিবে না।

সাধারণ পৌর-প্রতিষ্ঠান (Municipalities)

কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ ব্যতীত অন্যান্য প্রত্যেক জেলা, মহকুমা বা অনেক সময়ে বর্ধিষ্ণু গ্রামেও সাধারণ পৌর-প্রতিষ্ঠান থাকে। কোন পৌর-প্রতিষ্ঠানের সদস্য-সংখ্যা ৯এর কম বা ৩০এর অধিক হইতে পারিবে না। শহরের করদাতাগণ প্রত্যক্ষ নির্বাচন-পদ্ধতিতে এই সদস্যগণকে (Commissioners) নির্বাচিত করেন। পৌর-প্রতিষ্ঠানের কার্যকাল ৪ বৎসর, কিন্তু সরকার ইচ্ছা করিলে ইহা একবৎসর বাড়াইতে পারেন। সদস্যগণ একজন সভাপতি (Chairman) ও এক বা একাধিক সহ-সভাপতি (Vice-Chairman) নির্বাচন করেন। কর্পোরেশনের ন্যায় সাধারণ পৌর-প্রতিষ্ঠানেও একজন প্রধান কর্মসচিব, স্বাস্থ্যাধিকার ও এঞ্জিনিয়ার থাকেন। পৌর-প্রতিষ্ঠান ইচ্ছা করিলে বিশেষ কাজের জন্য স্থায়ী কমিটিও নিযুক্ত করিতে পারে। যে-সমস্ত পৌর-প্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক আয় একলক্ষ টাকার অধিক তাহারা একজন প্রধান কর্মকর্তা (Chief Executive Officer) নিয়োগ করিতে পারে।

সাধারণ পৌর-প্রতিষ্ঠানের কার্য (Functions)

কর্পোরেশনের ন্যায় এই প্রতিষ্ঠানগুলিরও জনস্বাস্থ্য, জন-নিরাপত্তা, জন-সুবিধা ও শিক্ষাবিষয়ক কার্য সম্পাদন করিতে হয়। রাস্তাঘাট-নির্মাণ ও রক্ষণা-

রক্ষণ, জল ও আলো সরবরাহ, ময়লা জল ও আবর্জনা দূর করা, চিকিৎসালয় ও প্রসূতি-আগার স্থাপন করা, অগ্নিনির্বাপণ, সংক্রামক ব্যাধিনিরোধ, প্রাথমিক শিক্ষাদান, জন্ম-মৃত্যুর হিসাব রাখা প্রভৃতি সাধারণ পৌর-প্রতিষ্ঠানের কার্য।

আয় (Income)

পৌর প্রতিষ্ঠানের আয়ের উৎস হইল :

১। জল ও আলো সরবরাহ ও ময়লা নিষ্কাশনের জন্য বাড়ী ও জমির উপর ধার্য কর, ২। ঘোড়ার গাড়ী, গরুর গাড়ী, রিক্সা, ঠেলাগাড়ী প্রভৃতি যানবাহনের উপর ধার্য কর, ৩। ব্যবসায়-বাণিজ্যে লিপ্ত ব্যক্তিগণের উপর কর, ৪। খেয়া পারাপার ও সেতু পারাপার হইবার সময় লোকজন ও যানবাহনের উপর ধার্য কর, ৫। বাজার ও অন্যান্য সম্পত্তি হইতে আয়, ৬। সরকারী-অর্থসাহায্য ও ৭। সরকারের অনুমতি লইয়া ঋণগ্রহণ।

ভারতের কয়েকটি রাজ্য শহরে আনীত দ্রব্য ও শহর হইতে রপ্তানীকৃত দ্রব্যের উপর কর (Octroi duty) ধার্য করিয়া থাকে। পশ্চিমবঙ্গের কোন পৌর-প্রতিষ্ঠান এই কর ধার্য করে নাই।

সেনানিবাস প্রতিষ্ঠান (Cantonment Board)

যেখানে সৈন্যগণ বাস করে সেখানে সেনানিবাস প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানগুলি সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন। কেন্দ্রীয় সরকারের দেশরক্ষাবিভাগের কয়েকজন সদস্য লইয়া এই প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। প্রতিষ্ঠানের সভাপতি সরকার কর্তৃক মনোনীত হন।

গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান (Rural Self-Government)

শহরাঞ্চলের ন্যায় পল্লী অঞ্চলেও কতকগুলি স্থানীয় সমস্যা দেখা যায়। ভারতে অধিকাংশ লোকই গ্রামে বাস করে। সুতরাং গ্রামগুলির স্থানীয় সমস্যাগুলির সুষ্ঠু সমাধান না হইলে শুধু শহরের উন্নতি করিয়া সমগ্র দেশের উন্নতিসাধন করা সম্ভব নয়। এই উদ্দেশ্যে গ্রামাঞ্চলেও তিন শ্রেণীর স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে। প্রত্যেক জেলায় একটি করিয়া জেলা বোর্ড ও প্রত্যেক মহকুমায় বা তালুকে একটি করিয়া স্থানীয় বোর্ড বা তালুক বোর্ড এবং এক বা একাধিক গ্রাম লইয়া একটি ইউনিয়ন বোর্ড বা গ্রাম

পঞ্চায়েত গঠিত হইয়াছে। বাংলাদেশ ও বোম্বাই রাজ্যে লোকাল বোর্ড তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে, আবার আসামে জেলা বোর্ডের স্থানে লোকাল বোর্ড কাজ করে।

জেলা বোর্ড (District Board)

অন্ততঃপক্ষে ৯ জন নির্বাচিত সদস্য লইয়া জেলা বোর্ড গঠিত হয়। জেলা বোর্ডে কতজন সদস্য থাকিবে তাহা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হয়। যেখানে স্থানীয় বোর্ড আছে সেখানে স্থানীয় বোর্ডের সদস্যগণ জেলা বোর্ডের সদস্যগণকে নির্বাচন করেন এবং স্থানীয় বোর্ড না থাকিলে ইউনিয়ন বোর্ডের ভোটদাতাগণ কর্তৃক জেলা বোর্ডের সদস্যগণ নির্বাচিত হইয়া থাকেন। সদস্যগণের কার্যকাল ৪ বৎসর। বোর্ডের সদস্যগণ নিজেদের মধ্য হইতে একজন সভাপতি ও সহ-সভাপতি নির্বাচন করেন। বোর্ডের দৈনন্দিন কার্যের জন্য একজন কর্মসচিব, এঞ্জিনিয়ার ও স্বাস্থ্যাধিকার থাকেন।

কার্য (Functions)

জেলা বোর্ড জেলার শহর ব্যতীত মফঃস্বল অঞ্চলের বহুবিধ কায করিয়া থাকে। জনস্বাস্থ্য, জন-নিরাপত্তা, জন-সুবিধা ও শিক্ষা-সংক্রান্ত বিষয়গুলির তত্ত্বাবধান করাই হইল ইহার প্রধান কর্তব্য। যাতায়াত ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের সুবিধার জন্য বড় বড় রাস্তাঘাট, সেতু, খেয়া-পারাপার প্রভৃতির ব্যবস্থা করা, হাসপাতাল, চিকিৎসালয় ও প্রসূতি-আগার স্থাপন করা, পুষ্করিণী, কূপ ও নলকূপ খনন করিয়া জল সরবরাহ করা, ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি রোগ নিবারণ করা, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিকে সাহায্য দান করা, পশুরোগ নিবারণ করা, হাট-বাজার, ডাকবাংলো ও খোঁয়াড় স্থাপন করা প্রভৃতি হইল ইহার কায।

জেলা বোর্ডের আয় (Income of the District Board)

উপরি-উক্ত বিভিন্ন ধরণের কাজ করিবার জন্য বোর্ড নিম্নলিখিত উৎসগুলি হইতে অর্থ সংগ্রহ করে: ১। ভূমি-রাজস্বের সহিত আদায়ীকৃত টাকার এক পয়সা হারে অতিরিক্ত কর (সেস—cess)। ২। হাট বাজার, খেয়া-পারাপার

ও গবাদিপশু আটক রাখিবার খোঁয়াড় হইতে আয়। ২। রাজ্যসরকার কর্তৃক অর্থ-সাহায্য ও ৪। রাজ্যসরকারের অনুমতি লইয়া ঋণগ্রহণ।

স্থানীয় বোর্ড (Local Board)

স্থানীয় বোর্ডগুলি কমপক্ষে ৬ জন সদস্য লইয়া গঠিত হয় এবং বোর্ডের সদস্য-সংখ্যার ⅔ অংশ নির্বাচিত হন এবং ⅓ মনোনীত হন। সদস্য-সংখ্যা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হয়। সদস্যগণ একজন সভাপতি ও একজন সহ-সভাপতি নির্বাচন করে। স্থানীয় বোর্ডগুলির নিজস্ব কোন কাজও নাই বা আয়ের কোন উৎসও নাই। সাধারণতঃ জেলা বোর্ডগুলির নির্দেশমত ইহারা কাজ করে এবং জেলা বোর্ডের সব কাজই স্থানীয় বোর্ডগুলি কর্তৃক নিষ্পন্ন হয়।

ইউনিয়ন বোর্ড (Union Board)

প্রত্যেক গ্রাম বা কয়েকটি গ্রাম লইয়া একটি ইউনিয়ন বোর্ড গঠিত হয়। বোর্ডের সদস্য-সংখ্যা ৬-এর কম ও ৯-এর বেশী হইতে পারে না। বোর্ডের সদস্যগণ ৪ বৎসর কালের জন্য নির্বাচিত হন। গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দাগণের মধ্যে যাঁহারা ৬ আনা হারে চৌকিদারী ট্যাক্স দেন অথবা ৮ আনা সেস দেন এরূপ ২১ বৎসর বয়স্ক লোক ভোটদাতা হইতে পারেন। উত্তরপ্রদেশ, বোম্বাই প্রভৃতি কয়েকটি রাজ্যে ইউনিয়ন বোর্ডের পরিবর্তে গ্রাম পঞ্চায়েৎ কাজ করে। বোর্ডের সদস্যগণ নিজেদের মধ্য হইতে একজন সভাপতি (President) নির্বাচন করেন। সভাপতিই হইলেন বোর্ডের প্রধান কর্মকর্তা।

কার্য (Functions)

ইউনিয়ন বোর্ড গ্রামের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, সুবিধা ও প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে নানাবিধ কাজ করিয়া থাকে। গ্রামের রাস্তাঘাট ও পুল নির্মাণ করা, পুষ্করিণী, কূপ ও নলকূপ খনন করিয়া জল সরবরাহ করা, টিকা দেওয়া ও ছোট ছোট চিকিৎসালয় স্থাপন করা, নালা-নদমা পরিষ্কার রাখা ইহার কাজ। প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের জন্য ইহা অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করে বা অর্থ সাহায্য করে। গবাদি পশু আটক রাখিবার খোঁয়াড় রাখে, ছোটখাট ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলার বিচারকার্যও অনেক সময় এই বোর্ডগুলি করে।

ইহা ছাড়া, ইহার আর একটি প্রধান কাজ হইল চৌকিদার ও দফাদার সাহায্যে গ্রামের শান্তি রক্ষা করা।

আয় (Income)

ইহার আয়ের প্রধান উৎস হইল ইউনিয়ন রেট বা চৌকিদারী ট্যাক্স। দ্বিতীয়তঃ, লাইসেন্স ফি, জরিমানা ও খেয়াঘাট ও খোঁয়াড় হইতে আয় আদায় হয়। তৃতীয়তঃ, সরকার ও জেলা বোর্ডের নিকট হইতেও ইহা কিছু কিছু অর্থ সাহায্য পাইয়া থাকে।

ইহার ব্যয়ের প্রায় অর্ধেক গ্রামের শান্তিরক্ষার জন্য চৌকিদার ও দফাদারের বেতন বাবদ দিতে হয়। সরকার-নিযুক্ত সার্কেল অফিসার ইউনিয়ন বোর্ডের কার্য পরিদর্শন ও তদারক করেন।

গ্রাম পঞ্চায়েত (Village Panchayat)

১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গ-রাজ্য আইনসভা একটি আইন পাস করিয়া নূতন এক ধরণের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন-প্রতিষ্ঠান গঠন করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ১৯৫৭ সালে এই আইন কার্যকরী হইয়া ইউনিয়ন বোর্ডের পরিবর্তে চার শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়, যথা,—১। গ্রাম সভা, ২। গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ৩। অঞ্চল পঞ্চায়েৎ ও ৪। ন্যায় পঞ্চায়েৎ।

১। **গ্রাম সভা (Gram Sabha)**—এক বা একাধিক গ্রাম লইয়া একটি গ্রাম সভা গঠিত হইবে। রাজ্যের বিধানসভার সদস্য নির্বাচনকারী সকল ভোটদাতাই এই গ্রাম সভার সদস্য হইতে পারেন এবং এই সভার বৎসরে অন্ততঃ দুইবার অধিবেশন বসিবে। এই সভার প্রধান কাজ হইল বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা করা এবং গ্রাম পঞ্চায়েৎ কর্তৃক প্রদত্ত বিবরণী বিবেচনা করা। এ সভায় সভাপতিত্ব করিবেন গ্রাম পঞ্চায়েতের অধ্যক্ষ এবং অধ্যক্ষের অনুপস্থিতিতে উপাধ্যক্ষ সভাপতিত্ব করিবেন।

২। **গ্রাম পঞ্চায়েত (Gram Panchayat)**—গ্রাম পঞ্চায়েৎ হইল গ্রাম সভা কর্তৃক নির্বাচিত ৯ হইতে ১৫ জন সদস্য-সমন্বিত অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র সংস্থা। রাজ্য সরকার গ্রাম পঞ্চায়েতের অনধিক এক-তৃতীয়াংশ সদস্য মনোনীত করিতে পারেন। পঞ্চায়েতের কার্যকাল চার বৎসর এবং ইহার একটি করিয়া মাসিক অধিবেশন হইতে হইবে। পঞ্চায়েত ইহার অধ্যক্ষ এবং উপাধ্যক্ষ নির্বাচন

করিবে। গ্রাম সভার কার্যকরী সংস্থা হইল এই গ্রাম পঞ্চায়েত। ইহাই রাস্তাঘাট, পুল, নর্দমা প্রভৃতি নির্মাণ, সংস্কার ও সংরক্ষণ করে। স্বাস্থ্যরক্ষা, জল সরবরাহ ও প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করে।

৩। **অঞ্চল পঞ্চায়েত (Anchal Panchayat)**—কতকগুলি গ্রাম লইয়া রাজ্য সরকার একটি অঞ্চল পঞ্চায়েত গঠন করিতে পারেন। গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যগণ গ্রাম সভার সদস্যগণের মধ্য হইতে চার বৎসরের জন্য অঞ্চল পঞ্চায়েতের সদস্যগণকে নির্বাচিত করিতে পারেন। প্রতি ২৫০ জন গ্রাম সভার সদস্যগণের জন্য একজন অঞ্চল পঞ্চায়েত সদস্য নির্বাচিত হইবে। অঞ্চল পঞ্চায়েত সভায় সভাপতিত্ব করিবার জন্য অঞ্চল পঞ্চায়েত একজন প্রধান ও একজন উপ-প্রধান নির্বাচিত করিতে পারিবে। রাজ্যপাল কর্তৃক নিযুক্ত কর্মসচিব (Secretary) অঞ্চল পঞ্চায়েতের প্রধান কর্মকর্তারূপে কাজ করিবেন। এই পঞ্চায়েত চৌকিদার ও দফাদারের সাহায্যে ইহার এলাকার শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিবে। পঞ্চায়েত স্থানীয় কর ও ফি বসাইতে পারে এবং ন্যায় পঞ্চায়েতের কাজের তত্ত্বাবধান করিবে।

৪। **ন্যায় পঞ্চায়েত (Nyaya Panchayat)**—গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যগণের মধ্য হইতে অঞ্চল পঞ্চায়েত কর্তৃক নির্বাচিত ৫ জন সদস্য লইয়া ন্যায় পঞ্চায়েত গঠিত হয়। ন্যায় পঞ্চায়েত ছোট-খাট ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলার বিচার করে। ন্যায় পঞ্চায়েতের কার্যকাল চার বৎসর এবং অঞ্চল পঞ্চায়েতের কর্মসচিবের সাহায্যে ইহার কার্য পরিচালিত হয়।

পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা (The Panchayat System in West Bengal)

গণতন্ত্র হইল জনগণের শাসন। সুতরাং যত অধিক সংখ্যক লোক শাসন-ব্যবস্থার সহিত যুক্ত হয় গণতন্ত্র হয় তত ব্যাপক। অধিক সংখ্যক লোককে শাসনব্যবস্থার সহিত যুক্ত করিবার প্রধান উপায় হইল স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠানের প্রবর্তন। স্থানীয় সমস্যাগুলির সমাধান স্থানীয় লোকদ্বারা হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কারণ দূরে অবস্থিত কেন্দ্রীয় সরকার অপেক্ষা স্থানীয় জনসাধারণ স্থানীয় সমস্যা সম্পর্কে অধিকতর সজাগ এবং স্থানীয় সমস্যাগুলির সহিত তাহাদের স্বার্থ একান্ত-ভাবে জড়িত। এতদ্ব্যতীত স্থানীয় লোকদ্বারা স্থানীয় সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা হইলে স্থানীয় লোকের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা জাগে এবং সাধারণের কাজে তাহাদের উৎসাহ বৃদ্ধি পায়।

উপরি-উক্ত উদ্দেশ্যগুলি সাধনের জন্য পশ্চিমবঙ্গেও স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠান প্রবর্তিত আছে। কর্পোরেশন, মিউনিসিপালিটি, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, ইউনিয়ন বোর্ড ব্যতীতও গ্রামাঞ্চলের জন্য এক নূতন শাসন প্রতিষ্ঠান প্রবর্তন করা হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে গ্রাম পঞ্চায়েত বলা হয়। আশা করা গিয়াছিল যে, এই প্রতিষ্ঠানগুলি গ্রামীণ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানাভাবে উন্নতিসাধন করিতে পারিবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বলবন্ত মেহতা কমিশনের রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানগুলি ইহাদের উদ্দেশ্য সাধনে বিফলকাম হইয়াছে। এই বিফলতার কারণগুলি হইল—১। সৎকাজের অনুপ্রেরণা ও অভিজ্ঞ নেতৃত্বের অভাব, ২। অর্থের অনটন, ৩। বিচার-বিভাগীয় জ্ঞান, নিরপেক্ষতা ও স্বাধীনতার অভাব, ৪। দলগত প্রতিযোগিতা, ৫। সাম্প্রদায়িক মনোভাব এবং ৬। অপেক্ষাকৃত দরিদ্র শ্রেণীর দ্বারা পরিচালনা।

পঞ্চায়েত ব্যবস্থা গ্রামাঞ্চলে প্রবর্তিত হইয়াছে। কিন্তু এই ব্যবস্থার মূল নীতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই ব্যবস্থাকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য যে পরিমাণ প্রাথমিক অনুপ্রেরণা, বুদ্ধিমত্তা ও ত্যাগ স্বীকারের প্রয়োজন, তাহা গ্রামাঞ্চলের জনসাধারণের মধ্যে বিরল। শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ সাধারণতঃ গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া শহরে বাস করেন। তাঁহারা গ্রামীণ স্বার্থের প্রতি উদাসীন। যাহারা গ্রামে বাস করেন, তাঁহারা দৈনন্দিন জীবনের নানা সমস্যা ও কুসংস্কারে এত আচ্ছন্ন যে, তাহাদের পক্ষে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার কর্তব্য সম্পাদন করা সম্ভব নহে। সুতরাং অযোগ্য লোক দ্বারা পরিচালিত হওয়ার জন্য এই প্রতিষ্ঠানগুলি বহুক্ষেত্রে ব্যর্থ হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, ইহাদের নিজস্ব যে আয়ের উৎস আছে, তাহা পর্যাপ্ত নহে। সরকারী সাহায্যও পর্যাপ্ত নহে। সুতরাং ইহাদের পক্ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিকল্পনাগুলি রূপায়ণ করা সম্ভব হইলেও হাসপাতাল, বিদ্যালয় প্রভৃতি ব্যয়-বহুল পরিকল্পনা কার্যকরী করা সম্ভব নহে। গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে কিছু কিছু বিচার-ক্ষমতাও দেওয়া হইয়াছে। ন্যায় পঞ্চায়েত দ্বারা এই বিচার-কার্য পরিচালিত হয়। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, বিচারকার্যও সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয় না। যে আইনের জ্ঞান, স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা থাকিলে বিচারকার্য দক্ষতার সহিত নিষ্পন্ন হয়, ন্যায় পঞ্চায়েতের সদস্যগণের মধ্যে এই গুণগুলির একান্ত অভাব দেখা যায়। দলীয় প্রতিযোগিতা গ্রাম পঞ্চায়েত ব্যবস্থার অসাফল্যের আর একটি প্রধান কারণ। সহযোগিতার মনোভাব না থাকিলে কোন সাধারণের কাজ সুষ্ঠুভাবে করা যায় না। গ্রামীণ জীবন আজ

দলাদলির ফলে বিষাক্ত। একদল অন্যদল কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাবের ভাল মন্দ বিবেচনা না করিয়া শুধু দলগত স্বার্থের ভিত্তিতে প্রতিরোধ করে। ফলে, ভাল কাজও বাধাপ্রাপ্ত হয়। জাতিভেদ সাম্প্রদায়িক মনোভাবের জন্মদাতা এবং এই সাম্প্রদায়িক মনোভাব অনেক গঠনমূলক কাজের অন্তরায় ঘটায়। পরিশেষে বলা যায় যে, গ্রাম পঞ্চায়েত ব্যবস্থা পরিচালনার ভার যে শ্রেণীর উপর ন্যস্ত হইয়াছে, সে শ্রেণী অর্থনৈতিক দিক দিয়া অপেক্ষাকৃত দুর্বল। গ্রাম্য চাষী, কারিগর অথবা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ই এই গ্রাম পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মেরুদণ্ড। অর্থনৈতিক দুর্গতির জন্য এই সম্প্রদায় যথাযথভাবে ইহাদের কর্তব্য সম্পাদনে অক্ষম। শিক্ষার ব্যাপক প্রসার সাহায্যে গ্রামীণ জীবনের অজ্ঞতা ও কুসংস্কার দূর করা এবং সরকার কর্তৃক উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ সাহায্য দ্বারা স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠানগুলির উন্নয়ন করা সম্ভব।

অন্যান্য আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠান (Other Self-governing Institutions)

শহরাঞ্চল ও গ্রামাঞ্চল প্রতিষ্ঠানগুলি ব্যতীত অন্য আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠান বিশেষ ধরণের কাজ করিবার জন্য গঠিত হইয়াছে।

কলিকাতা নগরোন্নয়ন প্রতিষ্ঠান (Calcutta Improvement Trust)

একজন সভাপতি ও ১০ জন সদস্য লইয়া এই প্রতিষ্ঠান গঠিত। সভাপতি ও অন্য ৪ জন সদস্য সরকার কর্তৃক মনোনীত হন। কলিকাতা পৌর-প্রতিষ্ঠান ৪ জন সদস্য মনোনীত করে এবং অপর দুইজন বিভিন্ন বণিকসভা কর্তৃক মনোনীত হন।

বড় বড় শহরগুলিতে বিশেষ করিয়া কলিকাতার মত বড় শহরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে গৃহসমস্যা একটি প্রধান সমস্যারূপে দেখা দিয়াছে। শহরে অভিজাত অঞ্চল ছাড়াও যে অসংখ্য বস্তি-অঞ্চল আছে তাহার অবস্থা অতি শোচনীয়। নগরোন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্য হইল বস্তি অঞ্চলগুলি পরিষ্কার করিয়া আলো ও হাওয়ার ব্যবস্থা করা। এই উদ্দেশ্যে কলিকাতা নগরোন্নয়ন প্রতিষ্ঠান যথেষ্ট কাজ করিতেছে। এই প্রতিষ্ঠান অনেক বস্তি বিলোপ করিয়া নূতন সুরম্য অট্টালিকা নির্মাণ করিয়াছে। প্রচুর মুক্ত বায়ু ও আলোর জন্য বড় বড় রাস্তা করিয়াছে। কলিকাতার উত্তর, পূর্ব ও বিশেষ করিয়া দক্ষিণ অঞ্চলে ইহা বহু অব্যবহার্য জমির উন্নতি সাধন করিয়া ব্যবহারযোগ্য করিয়াছে।

ইহাতে শহরবাসীর স্বাস্থ্যের উন্নতি ও সৌন্দর্য বোধ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ঢাকুরিয়া লেক খনন এই প্রতিষ্ঠানের এক বিরাট কৃতিত্ব।

কলিকাতা ছাড়া বোম্বাই, কানপুর প্রভৃতি স্থানেও এইরূপ প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি হইয়াছে। কলিকাতার পশ্চিম উপকণ্ঠে হাওড়া শহরের উন্নতির জন্য এইরূপ একটি প্রতিষ্ঠান গঠনের ব্যবস্থা হইয়াছে।

কলিকাতা বন্দর-রক্ষক প্রতিষ্ঠান (Calcutta Port Trust)

কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর বন্দরগুলির রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রসারের জন্য বন্দর-রক্ষক প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে। ২৪ জন সদস্য লইয়া এই প্রতিষ্ঠান গঠিত। কলিকাতা কর্পোরেশন ও হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি একজন করিয়া সদস্য নির্বাচিত করে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১ জন সদস্য মনোনীত করে এবং বিভিন্ন বণিকসভা কর্তৃক ১১ জন নির্বাচিত হয়। অবশিষ্ট সদস্যগণ কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হয়।

বন্দর-রক্ষা ও বন্দরের উন্নতি করাই হইল এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান কাজ। এই উদ্দেশ্যে জেটি, ডক ও পোতাশ্রয় নির্মাণ করা ও মেরামত করা ইহার কর্তব্য। যে সমস্ত জাহাজ বন্দরে আসে তাহাদের পথ নির্দেশ করিবার ব্যবস্থা করিতে হয়। গুদামঘর ও পণ্যাগার নির্মাণ ও ইহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হয়। জলপথে জাহাজ ও ষ্টীমারগুলি যাহাতে নিরাপদে যাতায়াত করিতে পারে, সেজন্য ইহার এলাকাস্থিত জলপথ পরিষ্কার রাখিতে হয়।

এই প্রতিষ্ঠানের আয়ের প্রধান উৎস হইল জাহাজগুলির উপর বন্দরে আগম ও নিগম শুল্ক। ইহা ছাড়া, পণ্যাগার ও গুদামঘরের ভাড়া হইতেও অর্থ সংগৃহীত হয়।

পশ্চিমবঙ্গে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার ত্রুটি (Shortcomings of the Local Self-governing Institutions in West Bengal)

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের অর্থ হইল গ্রাম বা শহর, জেলা বা মহকুমার স্থানীয় সমস্যাগুলির স্থানীয় লোক বা তাহাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের দ্বারা সমাধান। এই ব্যবস্থার সাহায্যে একদিকে যেরূপ গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রসার ঘটে অর্থাৎ অধিক সংখ্যক লোককে শাসনব্যবস্থার সহিত সংশ্লিষ্ট রাখা সম্ভব হয়, অপরদিকে তদ্রূপ নাগরিকগণের রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি করিয়া সাধারণ স্বার্থের

উন্নয়নকল্পে তাহাদের উদ্বুদ্ধ করা সম্ভব হয়। স্থানীয় লোকই স্থানীয় সমস্যাগুলি সম্পর্কে অধিকতর অবহিত। সুতরাং স্থানীয় সমস্যাগুলির সুষ্ঠু ও স্থায়ী সমাধান স্থানীয় লোকের দ্বারা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ভারতে বৃটিশ শাসনকাল হইতেই নানাজাতীয় ও নানা শ্রেণীর স্থানীয় প্রতিষ্ঠান কাজ করিতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হইল যে, বৃটিশ শাসনকালের কথার উল্লেখ না করিয়াও স্বাধীনতালাভের পরবর্তী কালেও এই প্রতিষ্ঠানগুলির দ্বারা যে দেশের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে তাহা বলা যায় না। একমাত্র কলিকাতা পৌর-প্রতিষ্ঠানের কাজের দৃষ্টান্তে এই সত্য উপলব্ধি করা যায় যে, কি নাগরিক জীবনে—কি গ্রামীণ জীবনে আমাদের স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানগুলির অধিকাংশই বিফলকাম হইয়াছে। ইংরেজ শাসনকালে অত্যধিক সরকারী নিয়ন্ত্রণের ফলে এই প্রতিষ্ঠানগুলি স্বাধীনভাবে কাজ করিতে পারিত না। কিন্তু স্বাধীনতালাভের পর বিদেশী নিয়ন্ত্রণমুক্ত হইয়াও এই প্রতিষ্ঠানগুলি আশানুরূপভাবে ইহাদের কর্তব্য সম্পাদন করিতে পারিতেছে না। ইহার কারণ হইল স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যাপারে লোকের অজ্ঞতা, অজ্ঞতা-প্রসূত অযোগ্যতা, অসাধুতা, নাগরিক চেতনার অভাব, দলীয় সংকীর্ণ স্বার্থবুদ্ধি ও অর্থের অনটন। এই ত্রুটিগুলি দূর করিতে হইলে চাই সু-শিক্ষার প্রসার। শিক্ষাব্যবস্থাকে এরূপভাবে পুনর্গঠিত করা প্রয়োজন যাহাতে শিক্ষার্থিগণ শুধুমাত্র পুঁথিগত বিদ্যার অধিকারী না হইয়া কার্যক্ষেত্রে কর্মক্ষমতার অধিকারী হইতে পারেন। শিক্ষাক্ষেত্রে সমাজসেবামূলক শিক্ষার প্রবর্তন দ্বারা ছাত্র-ছাত্রাগণের মধ্যে সমাজচেতনা উদ্বুদ্ধ করা হইবে শিক্ষার উদ্দেশ্য। রাজনৈতিক দলগুলিকেও ক্ষুদ্র দলাদলির ঊর্ধ্বে থাকিয়া সামাজিক স্বার্থের উন্নয়নে সমবেতভাবে কাজ করিতে হইবে। অর্থের ব্যবস্থা অবশ্য সরকারকেই করিতে হইবে।

সংক্ষিপ্তসার

স্থানীয় শাসন

একটি দেশ ছোট ছোট এলাকায় বিভক্ত হইয়া যখন প্রত্যেকটি এলাকার স্থানীয় শাসনের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা হয়, তখন এই স্বতন্ত্র শাসনব্যবস্থাকে স্থানীয় শাসন বলা হয়।

বিভাগ ও বিভাগীয় শাসন

একটি রাজ্যকে কতকগুলি বিভাগে ভাগ করা হয়। প্রত্যেক বিভাগে একজন কমিশনার থাকে।

জেলা শাসক

কতকগুলি জেলা লইয়া বিভাগ গঠিত। জেলাগুলিই হইল শাসনব্যবস্থার প্রাথমিক উপাদান। জেলায় একজন ম্যাজিস্ট্রেট-কালেক্টর থাকেন। তিনি সাধারণতঃ ভারতীয় শাসন পরিচালনা কৃত্যকের কর্মচারী। তিনি জেলার সর্বময় কর্তা। তাঁহার বিচার ক্ষমতাও আছে।

মহকুমা-শাসক

জেলাগুলি কতকগুলি মহকুমা লইয়া গঠিত হয়। প্রত্যেক মহকুমায় একজন মহকুমা-শাসক থাকেন। মহকুমার অধীনে কতকগুলি থানা থাকে।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন

স্থানীয় সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে স্থানীয় লোকের প্রতিনিধি দ্বারা গঠিত শাসনব্যবস্থাকে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বলা হয়।

কলিকাতা পৌর-প্রতিষ্ঠান

বর্তমানে ১০৬ জন সদস্য লইয়া এই প্রতিষ্ঠান গঠিত। সদস্যগণের মধ্যে ৫ জন অলডারম্যান থাকেন। সকল সদস্য মিলিয়া এক বৎসরের জন্য একজন মেয়র ও একজন ডেপুটি মেয়র নির্বাচন করেন। সদস্যগণ ৪ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন।

জনস্বাস্থ্য, জন-নিরাপত্তা, জন-সুবিধা ও প্রাথমিক শিক্ষা হইল পৌর-প্রতিষ্ঠানের প্রধান কাজ। এই কাজের জন্য যে ব্যয় হয় তাহা বাড়ী ও জমির মূল্যের উপর কর, ব্যবসায়-বাণিজ্যের উপর কর, সরকারী সাহায্য ইত্যাদি উপায়ে সংগৃহীত হয়।

সাধারণ পৌর-প্রতিষ্ঠান

অন্যান্য শহরে ৯ হইতে ৩০ যে-কোন সংখ্যক নির্বাচিত সদস্য লইয়া

এই প্রতিষ্ঠানগুলি গঠিত হয়। সদস্যগণ একজন সভাপতি ও একজন সহ-সভাপতি নির্বাচন করেন। ইহাদের আয় ও ব্যয় কর্পোরেশনের আয়-ব্যয়ের অনুরূপ।

জেলা বোর্ড

গ্রামাঞ্চলে জেলা বোর্ড, ইউনিয়ন বোর্ড প্রভৃতি থাকে। কমপক্ষে ৯ জন নির্বাচিত সদস্য লইয়া জেলা বোর্ড গঠিত হয়। একজন নির্বাচিত সভাপতি, সহ-সভাপতি ও কয়েকজন স্থায়ী কর্মচারী থাকে। জেলার মধ্যে পানীয় জল সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা করা, রোগনিবারণ করা, রাস্তাঘাট ও হাটবাজার প্রভৃতি তৈয়ারী করা হইল ইহার কায। সেস ও সরকারী সাহায্য হইল ইহার প্রধান আয়।

স্থানীয় বোর্ড

মহকুমায় বা তালুকে এই বোর্ড গঠিত হয়। কমপক্ষে ৮ জন সদস্য থাকে। ইহার নিজস্ব কোন আয়-ব্যয় নাই। জেলা বোর্ডের প্রতিনিধি হিসাবে জেলা বোর্ডের নির্দেশমত ইহা কাজ করে।

ইউনিয়ন বোর্ড ও গ্রাম পঞ্চায়েত

৬ হইতে ৯ জন সদস্য লইয়া প্রতি গ্রামের বা কয়েকটি গ্রামের জন্য একটি বোর্ড গঠিত হয়। এই বোর্ড গ্রামের শান্তিরক্ষা এবং স্বাস্থ্য, প্রাথমিক শিক্ষা, জলসরবরাহ প্রভৃতি কার্যের ব্যবস্থা করে। শান্তিরক্ষার জন্য বোর্ড চৌকিদার রাখে। চৌকিদারী ট্যাক্স হইল ইহার প্রধান আয়। অনেক জায়গায় বোর্ডের পরিবর্তে গ্রাম পঞ্চায়েত আছে। ১৯৫৬ সালের নূতন আইন অনুসারে পশ্চিমবঙ্গে নূতন ধরণের পঞ্চায়েত ব্যবস্থা গঠন করা হইয়াছে।

প্রশ্নাবলী

1. "The state shall take steps to organise Village Panchayat ... ." How is this Directive principles of state policy being implemented in West Bengal?

2. Give an outline of the system of village Self-Government in West Bengal and point out their utility.

3. Give an account of the system of Local government existing in the Municipalities in West Bengal emphasising the principal heads of revenue and expenditure.

4. Give an account of the system of Local Government in the rural areas of West Bengal.

5. Explain briefly the Constitution and functions of the Municipal Corporation of Calcutta.

6. Give an account of the Municipal administration in West Bengal (Outside of Calcutta). (North Bengal Hons. 1966)

7. Give a brief outline of the panchayat system in West Bengal and indicate basic objectives. Have you any criticism to offer ? State your arguments fully.

চতুর্বিংশ অধ্যায়

ভারতের শাসনতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত বিবিধ বিষয়বস্তু

(Miscellaneous Provisions of the Constitution)

বিবিধ বিষয়—শাসনকার্য পরিচালনা করিবার নীতি ও নিয়মগুলি ব্যতীতও অন্যান্য বহু বিষয় ভারতের শাসনতন্ত্রে স্থান পাইয়াছে।

প্রথমতঃ, সরকারী ভাষা (Official Language) সম্পর্কে শাসনতন্ত্রে নির্দিষ্ট নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। শাসনতন্ত্রের ৩৪৩ ধারায় বলা হইয়াছে যে, দেবনাগরী অক্ষরে লিখিত হিন্দী ভারতের সরকারী ভাষা হিসাবে ব্যবহৃত হইবে। তবে শাসনতন্ত্র চালু হইবার সময় হইতে ১৫ বৎসর পর্যন্ত পূর্বের মত ইংরেজী ভাষায় সরকারী কাজ পরিচালিত হইবে। এই ১৫ বৎসরের মধ্যে রাষ্ট্রপতি ইংরেজীর সহিত হিন্দী ভাষা ব্যবহারেরও নির্দেশ দান করিতে পারেন। ১০ বৎসর অতিবাহিত হইবার পর সরকারী ভাষা হিসাবে হিন্দী ও ইংরেজী ব্যবহার সম্পর্কে মতামত দিবার জন্য একটি কমিশন গঠনের ব্যবস্থা করিবেন। তদনুসারে ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ২১ জন সদস্য-সমন্বিত সরকারী ভাষা সম্পর্কিত একটি কমিশন গঠিত হয়। এই কমিটির সুপারিশ অনুসারে ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তী কাল হইতে হিন্দীপ্রধান সরকারী ভাষা হিসাবে ব্যবহৃত হইবে এবং তৎসঙ্গে ইংরেজী দ্বিতীয় সরকারী ভাষা হিসাবে ব্যবহার করা চলিবে।

দ্বিতীয়তঃ, শাসনতন্ত্রের অন্যান্য বিষয়বস্তুর মধ্যে একটি অর্থ কমিশনের (Finance Commission) উল্লেখ আছে। শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হইবার দুই বৎসরের মধ্যে এবং পরে প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তে রাষ্ট্রপতি প্রয়োজন মনে করিলে একটি অর্থ কমিশন গঠন করিতে পারেন। যে সমস্ত কর কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকারগুলির মধ্যে ভাগ হইবে, সেই সমস্ত কর-লব্ধ অর্থ কি অনুপাতে উভয় সরকারের মধ্যে বণ্টিত হইবে এবং কি নীতি অনুসারে সঞ্চিত তহবিল হইতে রাজ্যসরকারগুলিকে সাহায্যদান করা হইবে, অর্থ কমিশন কর্তৃক তাহা স্থিরীকৃত হইবে।

তৃতীয়তঃ, শাসনতন্ত্রে একটি নির্বাচন কমিশন* (Election Commission) গঠনের ব্যবস্থা আছে। এই কমিশন একজন নির্বাচন

অধিকর্তা ও কয়েকজন সদস্য লইয়া গঠিত হইবে। কমিশনের সদস্যসংখ্যা ও তাঁহাদের নিয়োগ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক স্থিরীকৃত হইবে। কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্ট ও রাজ্যসভাগুলির নির্বাচন পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ, ভোটার তালিকা প্রণয়ন, নির্বাচন-সংক্রান্ত বিরোধ ক্ষেত্রে বিচারালয় গঠন করা প্রভৃতি নির্বাচন সংক্রান্ত সমুদয় কাজের ভার এই কমিশনের হস্তে ন্যস্ত থাকিবে।

চতুর্থতঃ, অনগ্রসর জাতিসমূহের অবস্থা অনুসন্ধানকারী একটি কমিশন (Commission for Investigation of conditions of Backward Classes) গঠিত হইবে। এই কমিশনের সদস্যগণও রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন। সামাজিক কারণে ও শিক্ষার অভাবহেতু যে সমস্ত সম্প্রদায় পশ্চাদ্‌পদ, তাহাদের অগ্রগতির পথের বাধা দূর করিয়া সরকারী সাহায্য দ্বারা কিভাবে এই সমস্ত সম্প্রদায়কে উন্নত করা সম্ভব সে সম্পর্কে কমিশন কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকারগুলিকে পরামর্শ দান করিবে।

পঞ্চমতঃ, তপশীলী এলাকা ও তপশীলী সম্প্রদায় শাসন (Administration of Scheduled Areas and Scheduled Tribes) সম্পর্কেও শাসনতন্ত্রে উল্লেখ আছে। তপশীলী এলাকাযুক্ত প্রত্যেক রাজ্যে এমন কি তপশীলী সম্প্রদায় অধ্যুষিত রাজ্যে রাষ্ট্রপতি ২০ জন সদস্য-সমন্বিত একটি উপজাতি-সম্পর্কিত পরামর্শ সভা গঠন করিবেন। এই সভা সংশ্লিষ্ট রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত উপজাতিসমূহের কল্যাণ ও অগ্রগতি সম্পর্কে রাজ্যপালকে পরামর্শ দান করিবে।

ষষ্ঠতঃ, কেন্দ্রে ও প্রত্যেক রাজ্যে একটি করিয়া আকস্মিক ব্যয় তহবিল ও সঞ্চিত তহবিল (Contingency Fund and Consolidated Fund) সৃষ্টি করিবার নির্দেশ শাসনতন্ত্রে উল্লেখ করা হইয়াছে। অদৃষ্টপূর্ব ব্যয় সংকুলান করিবার উদ্দেশ্যে পার্লামেণ্ট সভা এবং রাজ্য আইনসভাগুলি কেন্দ্রে ও প্রত্যেক রাজ্যে এইরূপ আকস্মিক ব্যয় তহবিল গঠন করিতে পারিবে। অনুরূপভাবে সংবিধানে উল্লিখিত নির্ধারিত ব্যয়-সংকুলানের উদ্দেশ্যে নির্ধারিত রাজস্ব লইয়া গঠিত একটি করিয়া সঞ্চিত তহবিল কেন্দ্রে ও প্রত্যেক রাজ্যে গঠিত হইবে।

ইহা ছাড়া, সর্বভারতের জন্য একজন মহা-ব্যবহারিক ও একজন প্রধান হিসাব পরীক্ষক নিয়োগের বিষয়ও শাসনতন্ত্রে স্থান পাইয়াছে।

সংক্ষিপ্তসার

ভারতের শাসনতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত বিবিধ বিষয়বস্তু

নিছক শাসনতান্ত্রিক আইন ব্যতীত অন্য অনেক বিষয় ভারতের শাসনতন্ত্রে স্থান পাইয়াছে। প্রথমতঃ, শাসনতন্ত্র কর্তৃক ভাষা সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, যে সমস্ত কর কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারগুলির মধ্যে ভাগ হইবে, সেই করগুলি হইতে প্রাপ্ত আয় কি অনুপাতে উভয় সরকারের মধ্যে বন্টিত হইবে তাহা নির্ধারণ করিবার জন্য একটি অর্থ কমিশন গঠনের ব্যবস্থা হইয়াছে। তৃতীয়তঃ, কেন্দ্র ও রাজ্য আইনসভাগুলির নির্বাচন পরিচালনা ও নির্বাচন সংক্রান্ত যাবতীয় কাজের ভার একটি নির্বাচন কমিশনের উপর ন্যস্ত থাকিবে। চতুর্থতঃ, অনগ্রসর জাতিসমূহের অবস্থা অনুসন্ধানকারী একটি কমিশন গঠনের কথাও শাসনতন্ত্রে বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে। পঞ্চমতঃ, তপশীলী এলাকা ও তপশীলীসম্প্রদায় শাসন সম্পর্কেও শাসনতন্ত্রে উল্লেখ আছে। সপ্তমতঃ, কেন্দ্রে ও প্রত্যেক রাজ্যে একটি করিয়া আকস্মিক ব্যয় তহবিল ও সঞ্চিত তহবিল গঠন করিবার নির্দেশ শাসনতন্ত্রে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত সরভারতের জন্য একজন মহা-ব্যবহারিক ও একজন প্রধান হিসাব পরীক্ষক নিয়োগের বিষয়ও শাসনতন্ত্রে স্থান পাইয়াছে।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

ভারতের শাসনতন্ত্র সম্পর্কে কয়েকটি অভিমত

(Some observations on the Indian Constitution)

অভিমত—ভারতের নূতন সংবিধান সম্পর্কে বহু দেশী ও বিদেশী অভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ সমালোচনা করিয়াছেন। নিম্নে প্রধান প্রধান সমালোচনাগুলির সারমর্ম দেওয়া হইল।

প্রথমতঃ, বলা হইয়াছে যে, সংবিধানে লিখিত আছে যে, ভারতে শাসন ক্ষমতার উৎস হইল ভারতীয় জনগণ (We, the people of India)। কিন্তু কার্যতঃ দেখা যায় যে, এই শাসনতন্ত্র গঠনে প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় জনগণের প্রতিনিধিদের কোন হাত ছিল না। যে গণপরিষদ্ কর্তৃক এই শাসনতন্ত্র রচিত হইয়াছিল, সেই গণপরিষদের সদস্যগণ ভারতের সমগ্র জনসাধারণের শতকরা মাত্র চৌদ্দজন ভোটদাতার ভোটে নির্বাচিত প্রাদেশিক আইন-পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত হইয়াছিলেন। সুতরাং এইরূপ সংকীর্ণ ভোটদান ক্ষমতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত কোন সংসদকেই জনসাধারণের প্রতিনিধিমূলক সংসদ বলা যায় না। সংকীর্ণ ভোটদান ভিত্তির উপর গঠিত গণ-পরিষদ কর্তৃক রচিত শাসনতন্ত্র পরবর্তী কালে সার্বজনীন ভোটাধিকার ভিত্তিতে গঠিত আইনসভা কর্তৃক সংশোধিত বা পুনর্বিবেচিত হওয়া উচিত ছিল।

দ্বিতীয়তঃ, গণপরিষদ কর্তৃক রচিত সংবিধানের নামকরণ হইল 'ভারতের সংবিধান'। কিন্তু সংবিধানের সমালোচকগণ বলেন যে, এই সংবিধানে অতীত বা মধ্যযুগীয় ভারতের কোন বৈশিষ্ট্যই নাই। ইহা সম্পূর্ণরূপেই অ-ভারতীয় আদর্শে রচিত হইয়াছে। অন্যান্য দেশের শাসনতন্ত্রের বিশেষ করিয়া ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ভারত শাসন আইনের প্রভাব এই নূতন শাসনতন্ত্রের উপর এতই সুস্পষ্ট যে, ইহাকে ভারতের শাসনতন্ত্র বলিতে দ্বিধা বোধ হয়। মৌলিকতা-বর্জিত এই শাসনতন্ত্র সম্পূর্ণভাবে বিদেশী আদর্শে রচিত হইয়াছে।

তৃতীয়তঃ, এই শাসনতন্ত্রের বিষয়বস্তু বিভিন্ন উৎস হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। সেই কারণে এই শাসনতন্ত্রে যে কোন মৌলিকতা নাই শুধু তাহাই নহে, পরন্তু একই কারণে এই শাসনতন্ত্র অনাবশ্যক রূপে দীর্ঘ, জটিল,

অসংগতিপূর্ণ ও স্থানে স্থানে দুর্বোধ্য হইয়াছে। শাসনতন্ত্রের এই অসংগতি ও জটিলতার ফলে শাসনতন্ত্র-সম্পর্কিত বিরোধের ক্ষেত্র প্রসারিত হইয়াছে।

চতুর্থতঃ, শাসনতন্ত্রের রচয়িতাগণের একটি প্রধান কৃতিত্ব হইল, শাসনতন্ত্রে ভারতের জনগণের জন্য কয়েকটি মৌলিক অধিকার যোজনা করা। কিন্তু এই অধিকারগুলি এরূপ সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে বাঁধবদ্ধ করা হইয়াছে এবং এই অধিকারগুলি হরণ করিবার এরূপ ব্যাপক ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে, নাগরিকগণ এই অধিকারগুলি ভোগ করিবার সুযোগ খুব কমই পাইবে। উচ্চ আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও শাসনতন্ত্রে নির্দেশাত্মক নীতিগুলির সংযোজনাও ততোধিকভাবে নিরর্থক হইয়াছে।

পঞ্চমতঃ, নূতন শাসনতন্ত্র সম্পর্কে একটি প্রধান অভিযোগ হইল যে, যদিও এই শাসনতন্ত্র ভারতে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রচলন করিয়াছে তথাপি এই যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার অন্তরালে এই শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রীভাবের আতিশয্য কাহারও দৃষ্টি অতিক্রম করে না। নূতন শাসনতন্ত্র নানাভাবে রাজ্য-সরকারগুলির ক্ষমতা সংকুচিত করিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে এরূপ ব্যাপক ক্ষমতা ন্যস্ত করিয়াছে যে, রাজ্যসরকারগুলির যুক্তরাষ্ট্র-সুলভ স্বাধীন সত্তা অতি-মাত্রায় ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। এই কারণে ভারত শাসনব্যবস্থাকে এককেন্দ্রীয়-প্রবণতা-যুক্ত যুক্তরাষ্ট্র না বলিয়া যুক্তরাষ্ট্রীয়-প্রবণতাযুক্ত এককেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা (Not a Federal Government with a Unitary bias but a Unitary Government with a Federal bias) বলা অধিকতর সমীচীন। কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে ভারতে গণতন্ত্রের প্রসার বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে।

ষষ্ঠতঃ, ভারতের নূতন সংবিধান ভারতের রাষ্ট্রপতির হস্তে যে ব্যাপক ক্ষমতা ন্যস্ত করিয়াছে, সেই ক্ষমতার বলে রাষ্ট্রপতির পক্ষে জার্মান রাষ্ট্রপতি হিটলারের ন্যায় স্বৈরাচারী শাসনকর্তায় পরিণত হওয়ার বিশেষ কোন শাসন-তান্ত্রিক বাধা নাই বলিয়া অনেক সমালোচক মত প্রকাশ করিয়াছেন। অপর-পক্ষে রাষ্ট্রপতি নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্র-প্রধানরূপে অবস্থান করিলেও রাষ্ট্রপতির হস্তে ন্যস্ত ব্যাপক ক্ষমতা মন্ত্রিপরিষদসহ প্রধানমন্ত্রীর দ্বারা পরিচালিত হইবে। সে ক্ষেত্রেও স্বৈরাচারের সম্ভাবনা বর্তমান। সুতরাং এদিক দিয়া ভারতের শাসন-তন্ত্রকে বিশেষ ত্রুটিপূর্ণ বলা যাইতে পারে।

কোন দেশের শাসনতন্ত্রই ত্রুটিহীন নহে। শাসনতন্ত্র হইল একটি স্বাধীন জাতির রাজনৈতিক আশা, আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শের প্রতীক এবং এই আদর্শই

জাতীয় জীবনের অগ্রগতির সহায়ক বিবেচিত হয়। ভারতের শাসনতন্ত্রে বহু উচ্চ আদর্শ স্থান পাইয়াছে। কিন্তু শাসনতান্ত্রিক বিধানের দ্বারা আবার সেই উচ্চ আদর্শে উপনীত হইবার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করা হইয়াছে। এই অন্তরায়গুলি দূর করিবার জন্য শাসনতন্ত্রের সংশোধন প্রয়োজন—এ কথা অস্বীকার করা যায় না। তবে এ সম্পর্কে বলা যায় যে, ভারত বহুদিন পর্যন্ত পরাধীন ছিল। ভারতের জনসাধারণও গণতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। সুতরাং ভারতের শাসনতন্ত্রে যে ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি দেখা যায়, তাহা স্বাভাবিক। গণতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতির সহিত ভারতীয় জনগণ যতই পরিচিত হইবে, শাসনতন্ত্রের ত্রুটিগুলি ততই দূর হইবে। ভারতের বর্তমান শাসনতন্ত্র ভারতীয়গণ কর্তৃক রচিত হইয়াছে—এ কথা স্মরণ রাখা উচিত।

সংক্ষিপ্তসার

ভারতের শাসনতন্ত্র সম্পর্কে কয়েকটি অভিমত

প্রথমতঃ, শাসনতন্ত্রের প্রস্তাবনায় উল্লিখিত হইলেও প্রকৃতপক্ষে ভারতের জনগণের শাসনতন্ত্র রচনায় কোন হাত ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, ভারতের সংবিধান বলিয়া নামকরণ হইলেও এই শাসনতন্ত্রে ভারতের দেশীয় কোন বৈশিষ্ট্যই নাই। বিদেশী প্রভাবেই এই শাসনতন্ত্র রচিত। তৃতীয়তঃ, উপরি-উক্ত কারণে, এই শাসনতন্ত্রের নিজস্ব কোন মৌলিকতা নাই। চতুর্থতঃ, মৌলিক অধিকার শাসনতন্ত্রে স্থান পাইলেও এই অধিকার ভোগের ক্ষেত্র সংকুচিত করা হইয়াছে। নির্দেশাত্মক নীতিগুলির সংযোজনাও নিরর্থক হইয়াছে, কারণ এগুলি সরকারের পক্ষে বাধ্যতামূলক নহে। পঞ্চমতঃ, যুক্তরাষ্ট্রীয় ভিত্তিতে গঠিত হইলেও এই শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীভাবের আতিশয্য কাহারও দৃষ্টি অতিক্রম করে না। ষষ্ঠতঃ, এই শাসনতন্ত্র রাষ্ট্রপতির হস্তে যে ব্যাপক ক্ষমতা ন্যস্ত করিয়াছে তাহার বলে রাষ্ট্রপতি স্বয়ং অথবা প্রধানমন্ত্রী স্বৈরাচারী হইতে পারেন এবং ইহার কোন শাসনতান্ত্রিক বাধা নাই।

পরিশিষ্ট

প্রশ্ন ও উত্তরের ইংগিত

1. Discuss the main features of the present constitution of India.

উত্তরের ইঙ্গিত—(১) নূতন শাসনতন্ত্র কর্তৃক ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে। একসঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের অবস্থিতি, ক্ষমতার বিভাগ, যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় প্রভৃতি যুক্তরাষ্ট্রসুলভ সকল বৈশিষ্ট্যই এই শাসন ব্যবস্থায় আছে। তবে এই শাসন-ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা অধিক। ২। ভারতের শাসনতন্ত্র বিস্তারিতভাবে লিখিত ও অনমনীয়। ৩। ভারতের শাসনতন্ত্র ভারতে মন্ত্রিসংসদ-পরিচালিত শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়াছে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী একজন শাসনতান্ত্রিক রাষ্ট্রপতি থাকিলেও কার্যতঃ এই শাসনক্ষমতা একজন প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে দায়িত্বশীল মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক পরিচালিত হয়। ৪। সবভারতে এক নাগরিকত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ৫। নাগরিকগণের মৌলিক অধিকার ব্যতীতও এই শাসনতন্ত্রে রাষ্ট্র পরিচালনার কতকগুলি নির্দেশাত্মক নীতির উল্লেখ আছে। ৬। নূতন শাসনতন্ত্র কর্তৃক ভারত একটি সার্বভৌম গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। ভারত একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। (৯—১৫ পৃষ্ঠা)

2. Elucidate the significance of the Preamble to the New Constitution of India.

উঃ ইঃ—প্রস্তাবনার অর্থ হইল ভূমিকা। প্রত্যেক শাসনতন্ত্রের সুরুতেই একটি প্রস্তাবনা থাকে এবং এই প্রস্তাবনার সাহায্যে শাসনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের অনুরূপভাবে ভারতের শাসনতন্ত্রেও একটি প্রস্তাবনা যোগ করা হইয়াছে। প্রস্তাবনায় তিনটি উদ্দেশ্য প্রচারিত হইয়াছে : ১। ভারত সরকারের ক্ষমতার একমাত্র উৎস হইল ভারতীয় জনগণ। ২। প্রস্তাবনা অনুসারে ভারতের জনগণ সরকারের নিকট হইতে কতকগুলি কর্তব্য সম্পাদনের দাবী রাখে। ৩। এই প্রস্তাবনার ভিত্তিতে সুপ্রিম কোর্ট ও ভারতের হাইকোর্টগুলি শাসনতন্ত্রের বিভিন্ন ধারার ব্যাখ্যা ও ভাষ্য করিতে

সক্ষম হইবে। প্রস্তাবনায় ভারতকে একটি সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র (Sovereign Democratic Republic) নামে অভিহিত করা হইয়াছে। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকল নাগরিকের জন্য সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী ভাব সৃষ্টি করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রস্তাবনায় ভারতীয় জনগণের পক্ষে কতকগুলি আদর্শের উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এই উচ্চ আদর্শগুলিকে রূপদান করা কতদূর সম্ভব তাহাতে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেন। ইহা ছাড়া আরও বলা হয় যে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই স্বাধীনতা ও সাম্যের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত না হইলে প্রস্তাবনায় উল্লিখিত আদর্শের বাণী নিরর্থক হইবে। কিন্তু এস্থলে একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বহুদিন পরে ভারত স্বাধীনতা অর্জন করিয়া স্ব মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সুতরাং স্বাধীন ভারত যদি কর্মক্ষেত্রে একটি উচ্চ আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত না হয়, তাহা হইলে তাহার জাতীয় জীবনের মান কোনদিনই উন্নীত হইবে না। এদিক দিয়া দেখিতে গেলে প্রস্তাবনায় উল্লিখিত উচ্চ আদর্শগুলিকে একেবারে নিরর্থক বলা সমীচীন নহে। অপরপক্ষে সংবিধানে উল্লিখিত উচ্চ আদর্শগুলিকে যে কার্যে রূপদান করিবার প্রচেষ্টা হইতেছে না একথাও বলা চলে না। অস্পৃশ্যতা দূর করিয়া সকলের জন্য সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা, জমিদারী প্রথার বিলোপ, প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার প্রবর্তন, উত্তরাধিকার, সম্পদ, ব্যয় ও সাধারণ দান প্রভৃতির উপর কর ধার্য এবং পর পর তিনটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাহায্যে জাতীয় জীবনের মান উন্নয়নের প্রচেষ্টা প্রস্তাবনায় উল্লিখিত উচ্চ আদর্শগুলিকে কার্যে পরিণত করিবার প্রচেষ্টার নিদর্শন বলা যাইতে পারে।

(৩৩—৩৫ পৃষ্ঠা)

3. The Preamble to the Constitution of India states that "India shall be a Sovereign Democratic Republic." Explain this.

উঃ ইঃ—ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনায় ভারতকে একটি 'সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। এখন প্রশ্ন হইল যে, নবগঠিত ভারতকে কি সার্বভৌম ক্ষমতাবিশিষ্ট একটি রাষ্ট্র বলা যাইতে পারে? দ্বিতীয়তঃ, ভারতের শাসনতন্ত্র কি প্রকৃত গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে গঠিত? তৃতীয়তঃ, ভারতকে কি প্রকৃতপক্ষে একটি প্রজাতন্ত্র বলা যাইতে পারে?

ভারত সাধারণতন্ত্রভুক্ত রাষ্ট্রগুলির সদস্য হিসাবে বৃটিশ রাজা বা রাণীর নেতৃত্ব

স্বীকার করিয়াছে এবং এজন্য অনেকে ভারতকে সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন রাষ্ট্র বলিতে আপত্তি করেন। কিন্তু ইহার উত্তরে বলা যায় যে, ভারত সাধারণতন্ত্র-ভুক্ত রাষ্ট্রগুলির সদস্য হিসাবে বৃটিশ রাজা বা রাণীর নেতৃত্ব স্বীকার করিলেও, রাজা বা রাণীর আনুগত্য স্বীকার করে নাই। ভারত সম্পর্কে বৃটিশ রাজের আদৌ কোন ক্ষমতা নাই—এমন কি ভারতের কোন আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে রাজা বা রাণীর নাম উচ্চারিত হয় না। ভারত সাধারণতন্ত্রগোষ্ঠীর রাষ্ট্রগুলি বিশেষ করিয়া গ্রেটবৃটেন হইতে কতকগুলি সুবিধা পাইবার উদ্দেশ্যে সাধারণতন্ত্রভুক্ত রাষ্ট্রগুলির সদস্য রহিয়াছে। স্বেচ্ছায় ভারত এই সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছে ও নিজ ইচ্ছামত এই সদস্যপদ পরিত্যাগ করিতে পারে। সুতরাং সাধারণতন্ত্রভুক্ত হওয়ার ফলে ভারত রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব বা মর্যাদাহানি হয় নাই। ভারত পূর্ণ সার্বভৌমবিশিষ্ট রাষ্ট্র।

দ্বিতীয়তঃ, ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে যে গণপরিষদ শাসনতন্ত্র রচনা করে, সে গণপরিষদ সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গঠিত হয় নাই ইহা সত্য। কিন্তু ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে যে পার্লামেণ্ট সভা গঠিত হয়, সে সভা কর্তৃক আদি শাসনতন্ত্র অনুমোদিত হয়। সুতরাং ভারতের শাসনতন্ত্রের সার্বজনীন ভিত্তি (Democratic basis) অস্বীকার করা যায় না। ভারতের শাসনক্ষমতার প্রকৃত উৎস হইল 'আমরা ভারতবাসী' ("We, the people of India")।

তৃতীয়তঃ, রাজার পরিবর্তে একজন নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি হইলেন ভারত-শাসনের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি। সুতরাং ভারতকে একটি প্রজাতন্ত্র (Republic) বলা হইয়াছে। (৩৪—৩৫ পৃষ্ঠা)

4. Discuss the directive Principles of State policy under the Constitution of India.

উঃ ইঃ—মৌলিক অধিকার ব্যতীত ভারতের শাসনতন্ত্রে রাষ্ট্র পরিচালনার কতকগুলি মূলনীতি সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। এইগুলি স্বাধীন আয়ারের শাসনতন্ত্র হইতে গৃহীত হইয়াছে। এই নীতিগুলি সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, শাসনকর্তৃপক্ষ আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে ও শাসনব্যাপারে এই নীতিগুলি দ্বারা পরিচালিত হইবে।

শাসনতন্ত্রে বিধিবদ্ধ এই নীতিগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম-ভাগে উল্লিখিত নীতি অনুযায়ী রাষ্ট্রের আদর্শ বিশেষ করিয়া অর্থনৈতিক

আদর্শের ইংগিত দেওয়া হইয়াছে। এই আদর্শ হইল ভারতে একটি জনকল্যাণকর সমাজব্যবস্থা গঠন করা ও সেই উদ্দেশ্যে দেশের সমগ্র সম্পদের ন্যায্য বণ্টন-ব্যবস্থার সাহায্যে আঃবৈষম্য দূর করিয়া সকল শ্রেণীর সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলসাধন করা।

দ্বিতীয়ভাগে উল্লিখিত আদর্শ হইল, সমস্ত নাগরিকের উপযুক্ত ব্যবস্থা, শ্রমিক শ্রেণীর নিরাপত্তা রক্ষা, সমান কাজের জন্য সকলকে সমান পারিশ্রমিক দেওয়া, সকল নাগরিকেরই কর্ম ও শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

তৃতীয়ভাগে উল্লিখিত আদর্শ হইল, অনুন্নত সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক ও শিক্ষা-বিষয়ক উন্নতি, চাষের উন্নতি, মাতৃমঙ্গল প্রতিষ্ঠা, পশুপালন, গ্রামপঞ্চায়েত গঠন, বিনা যুদ্ধে বিভিন্ন দেশের মধ্যে সালিশীর সাহায্যে শান্তিস্থাপন, শাসনবিভাগ হইতে বিচারবিভাগের পৃথকীকরণ ও জাতীয় গুরুত্বসম্পন্ন ঐতিহাসিক স্থান ও বস্তু রক্ষা করা।

মৌলিক অধিকার ও নির্দেশাত্মক নীতিগুলির মধ্যে পার্থক্য হইল এই যে, মৌলিক অধিকারগুলি ক্ষুণ্ণ হইলে আদালত সাহায্যে প্রতিবিধান পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু নির্দেশাত্মক নীতিগুলি ক্ষুণ্ণ হইলে ইহার কোন প্রতিবিধান নাই।

এখন প্রশ্ন হইল যে, তাহা হইলে এই নীতিগুলির কি কোন মূল্য বা তাৎপর্য নাই? ইহার উত্তরে বলা যায় যে, প্রস্তাবনায় উল্লিখিত উচ্চ আদর্শগুলির পুনরাবৃত্তি করা হইয়াছে মাত্র। এই নীতিগুলি হইল শিশুরাষ্ট্র ভারতের আদর্শ এবং একটি আদর্শ ছাড়া কোন নবগঠিত রাষ্ট্রের উন্নতি সম্ভব নয়। এই আদর্শগুলি শাসনকার্যে এবং আইন প্রণয়ন ব্যাপারে বলবৎ হইলে দেশের যে সর্বাঙ্গীণ উন্নতি হইবে, ইহাতে সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না। প্রকৃত গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাকল্পে ভারতের সংবিধানে এই নীতিগুলি স্থান পাইয়াছে। নীতিগুলি এখনও পর্যন্ত শাসনক্ষেত্রের সর্বত্র প্রযুক্ত না হইলেও বলা যাইতে পারে যে, অনেক বিষয়ে শাসনকর্তৃপক্ষ এই নীতি কার্যক্ষেত্রে বলবৎ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। সুতরাং নীতিগুলি একেবারে নিরর্থক হয় নাই।

(৫৫—৫৯ পৃষ্ঠা)

5. State some of the more important Fundamental Rights of an Indian citizen. How are these Fundamental Rights protected in the Indian Constitution?

উঃ ইঃ—মানুষের এমন কতকগুলি প্রাথমিক অধিকার আছে, যেগুলি ব্যক্তিত্ব বিকাশের অপরিহার্য অবস্থা বলিয়া সর্বদেশে স্বীকৃত হয়। এই অধিকারগুলিকে বিশেষ গুরুত্ব দিবার উদ্দেশ্যে অন্যান্য অধিকার হইতে পৃথক করিয়া শাসনতন্ত্রে স্থান দেওয়া হয়। এইজন্য এই অধিকারগুলিকে মৌলিক অধিকার (Fundamental Rights) বলা হয়। জীবনের অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার, সম্পত্তির অধিকার প্রভৃতি এই মৌলিক অধিকার পর্যায়ভুক্ত।

স্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্রে ভারতের নাগরিকগণের এইরূপ সাতটি মৌলিক অধিকার স্থান পাইয়াছে। এই অধিকারগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত চারিটি অধিকার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে হয়।

১। সাম্যের অধিকার—Right to Equality

জাতি, ধর্ম, সম্প্রদায়, স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে রাষ্ট্র সকল নাগরিকের প্রতি সমান ব্যবহার করিবে। রাষ্ট্র জাতি বা ধর্মের ভিত্তিতে নাগরিকগণের মধ্যে বৈষম্যমূলক ব্যবহার করিবে না। আইনের চক্ষে সকল নাগরিকই সমান এবং কার্যের উপযুক্ত বিবেচিত হইলে সব নাগরিকেরই সরকারী কাজে নিযুক্ত হইবার সমান অধিকার থাকিবে। যে-কোন আকারে অস্পৃশ্যতা নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। কেবলমাত্র সামরিক ও শিক্ষা-সংক্রান্ত উপাধি ব্যতীত অন্য কোনরূপ উপাধি প্রদান করা হইবে না। তবে ভারত সরকার বর্তমানে 'ভারত রত্ন', 'পদ্ম বিভূষণ', 'পদ্মশ্রী' প্রভৃতি উপাধি বিতরণ করিতেছেন। সমাজব্যবস্থায় সাম্য প্রতিষ্ঠিত না হইলে প্রকৃত গণতন্ত্র সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে না। প্রকৃত সাম্য প্রতিষ্ঠাকল্পে উপাধিপ্রদান-প্রথা রহিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

২। স্বাধীনতার অধিকার—Right to Freedom.

ভারতের সকল নাগরিকেরই বাক্-স্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকিবে। ইহা ছাড়া, সকল নাগরিকই নিরস্ত্রভাবে শান্তিপূর্ণ সমাবেশ, সংঘ প্রভৃতি গঠন করিতে পারিবে। ভারতের যে কোন অংশে স্বাধীনভাবে ভ্রমণ, বসবাস, সম্পত্তি ক্রয়বিক্রয়, যে-কোন বৃত্তি গ্রহণ বা ব্যবসায় করিবার স্বাধীনতা প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে। সরকার যদি কোন ব্যক্তিকে আটক করে তাহা হইলে তাহাকে যথাসম্ভব শীঘ্র আটক করিবার কারণ জানাইতে হইবে এবং ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাহাকে কোন ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট উপস্থিত করিতে হইবে। বন্দী ব্যক্তি যদি মনে করে যে, তাহাকে অন্যায়ভাবে আটক করা

হইয়াছে তাহা হইলে তাহাকে আদালতে উপস্থিত করিবার জন্য হেবিয়াস্ কর্পাস্ রিট্ (Habeas Corpus Writ) জারি করিবার জন্য আবেদন করিতে পারিবে। এই অবস্থায় আদালত যদি আটক ব্যক্তির নির্দোষিতাসম্পর্কে বিশ্বাসী হয়, তাহা হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তির মুক্তির আদেশ দিতে পারে।

৩। ধর্মাচরণের অধিকার—Right to Freedom of Religion.

নূতন শাসনতন্ত্র অনুসারে ভারতকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। এইজন্য সকল নাগরিকেরই ধর্মাচরণের স্বাধীনতা থাকিবে। রাষ্ট্রের শান্তিশৃংখলা বা জনস্বার্থ ও সাধারণ নীতিজ্ঞানের বিরোধী না হইলে প্রত্যেক ব্যক্তি স্বাধীনভাবে তাহার ধর্মাচরণ করিতে পারিবে। সরকারের সহিত সম্পর্কিত কোন বিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষা ব্যাপারে কাহাকেও যোগদান করিতে বাধ্য করা যাইবে না।

৪। সম্পত্তিরক্ষার অধিকার—Right to Property.

আইনের অনুমোদন ব্যতীত বা ক্ষতিপূরণ প্রদান না করিয়া কাহারও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা চলিবে না বা জনসাধারণের স্বার্থে কোন সম্পত্তি, শিল্প-ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গ্রহণ করা চলিবে না। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে এই অধিকার-সম্পর্কে কিছু পরিবর্তন করা হইয়াছে। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের সংশোধনী আইনের বলে জনস্বার্থের উন্নতিকল্পে রাষ্ট্রের উপর ব্যক্তিগত সম্পত্তি, শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান দখল বা পরিচালনা করিবার ব্যাপক ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে।

ইহা ছাড়াও সংবিধানে শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার, শিক্ষা ও সংস্কৃতিগত অধিকার ও শাসনতান্ত্রিক উপায়ে প্রতিকারের অধিকার বলিয়া আরও তিনটি অধিকার স্থান পাইয়াছে।

সংবিধানে উল্লিখিত অধিকারগুলি যদি কোনপ্রকারে ব্যাহত হয়, তাহা হইলে যে-কোন নাগরিক এই মৌলিক অধিকারগুলি রক্ষার জন্য সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করিতে পারে এবং এই বিচারালয় এ সম্পর্কে যথোপযুক্ত নির্দেশ দিতে পারিবে।

এস্থলে একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হইলে সেই ঘোষণাকাল বলবৎ থাকাকালে রাষ্ট্রপতি নাগরিকগণের সুপ্রিম কোর্টে মৌলিক অধিকার রক্ষার আবেদন স্থগিত রাখিবার আদেশ দিতে পারেন। সুতরাং জরুরী অবস্থার ঘোষণাকালে শাসনকর্তৃপক্ষ এই মৌলিক অধিকারগুলি হরণ করিতে পারে। এই ব্যবস্থার দ্বারা বুঝা যায় যে, ভারতের

শাসনতন্ত্র একহস্তে যে মৌলিক অধিকারগুলি নাগরিকগণকে দিয়াছে, অপর হস্ত দিয়া নাগরিকগণকে সে অধিকারগুলি হইতে বঞ্চিত করিতে পারে।

(৪১—৪৬, ৪৯-৫০ পৃষ্ঠা)

6. "The Indian Constitution is federal in form but unitary in substance" Discuss.

উঃ ইঃ—নূতন শাসনতন্ত্র অনুসারে ভারতে একটি যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল একসঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার ও ১৬টি রাজ্য সরকারের অবস্থিতি এবং অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতার ভাগ ও বণ্টন হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, একটি লিখিত শাসনতন্ত্র দ্বারা ক্ষমতা বিভক্ত হইয়াছে। অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রের ন্যায় ভারতের শাসনতন্ত্র শুধু লিখিত নয়, সাধারণভাবে বলিতে গেলে এই শাসনতন্ত্র অনমনীয়ও বটে। তৃতীয়তঃ, অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় ভারতেও একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় (Supreme Court) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। চতুর্থতঃ, এই শাসনতন্ত্রে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে কিছু পরিমাণে রাজস্ব বণ্টনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি ভারতের শাসনব্যবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়।

কিন্তু ভারতের শাসনতন্ত্রের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার অন্তরালে এই শাসনতন্ত্রে এককেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার একাধিক নিদর্শন রহিয়াছে। প্রথমতঃ, ভারতে একই শাসনতন্ত্র দ্বারা কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির গঠন, প্রকৃতি ও কার্যক্ষেত্র স্থির হইয়াছে। রাজ্য সরকারগুলির নিজস্ব কোন পৃথক শাসনতন্ত্র গঠন বা পরিবর্তনের ক্ষমতা নাই। দ্বিতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য—রাজ্যগুলির মধ্যে রাজনৈতিক সমতা—এই শাসনতন্ত্রে কার্যকরী করা হয় নাই। তৃতীয়তঃ, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতাবণ্টন নীতি এরূপভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে যে, কেন্দ্রীয় সরকারের উপর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির শাসনভার অর্পিত হইয়া কেন্দ্রীয় সরকারের একাধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। চতুর্থতঃ, ভারতের শাসনতন্ত্রে একটি যুগ্ম বিষয়ের তালিকা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে ও ক্ষমতাবণ্টন ব্যাপারে অবশিষ্ট ক্ষমতাসমূহ কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। এই উভয় ব্যবস্থার দ্বারা রাজ্য সরকারগুলির যুক্তরাষ্ট্রসুলভ স্বাধীন সত্তা ক্ষুণ্ণ করা হইয়াছে।" পঞ্চমতঃ, সমগ্র ভারতের জন্য একদফা নাগরিকত্ব, একটি মাত্র আপীল আদালত ও

একটিমাত্র নির্বাচন সংসদ প্রতিষ্ঠা দ্বারা এই শাসনতন্ত্রের এককেন্দ্রীয় ভাব সূচিত হয়। ষষ্ঠতঃ, রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জরুরী অবস্থা ঘোষণাকালে এই যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থাকে এককেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থায় পরিবর্তিত করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক রাজ্য সরকারগুলির শাসনকার্য পরিচালিত হইতে পারে। অন্য কোন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। সুতরাং ভারতের শাসনব্যবস্থাকে এককেন্দ্রীয় প্রবণতাযুক্ত যুক্তরাষ্ট্র না বলিয়া যুক্তরাষ্ট্রীয়-প্রবণতাযুক্ত এককেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা বলা অধিকতর যুক্তিযুক্ত। (২০৭—২১০ পৃষ্ঠা)

7. State the relation between the Centre and the States of the Indian Union on legislative and executive matters.

উঃ ইঃ—আইন-প্রণয়ন-সম্পর্কে প্রত্যেক যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির কর্মক্ষেত্র পৃথক করিয়া দেওয়া হয় এবং শাসনতন্ত্র কর্তৃক নির্ধারিত কেন্দ্রীয় তালিকাভুক্ত বিষয়গুলির উপর কেন্দ্রীয় সরকার আইন প্রণয়ন ও শাসন পরিচালনা করে। অপরদিকে রাজ্যতালিকাভুক্ত বিষয়গুলির উপর রাজ্য সরকারগুলি কর্তৃত্ব করে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির কর্মক্ষেত্র পৃথক হইলেও সরকারী কাজের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য উভয় সরকারের মধ্যে যাহাতে সহযোগিতা থাকে তাহারও ব্যবস্থা করা হয়।

যদিও আইন প্রণয়ন বিষয়ে রাজ্য সরকারগুলির কর্মক্ষেত্র শাসনতন্ত্র কর্তৃক পৃথক করা হইয়াছে তথাপি নিম্নলিখিত তিনটি ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় আইনসভা রাজ্যতালিকাভুক্ত বিষয় সম্বন্ধে আইন প্রণয়ন করিতে পারিবে। প্রথমতঃ, যদি দুই বা ততোধিক রাজ্যের আইনসভা কেন্দ্রীয় আইনসভাকে কোন বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে অনুরোধ করে তবে কেন্দ্রীয় আইনসভা ঐ বিষয়টি রাজ্য-তালিকাভুক্ত হইলেও ঐ বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্ট সভার উচ্চ পরিষদ অর্থাৎ রাজ্যসভা দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটে যদি এই মর্মে প্রস্তাব গ্রহণ করে যে, কোন রাজ্য-তালিকাভুক্ত বিষয় সম্বন্ধে জাতীয় কল্যাণের জন্য কেন্দ্রীয় আইনসভার আইন প্রণয় করা উচিত তাহা হইলে ঐ বিষয়টি সম্পর্কে পার্লামেণ্ট আইন প্রণয়ন করিতে পারে। তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জরুরী অবস্থা ঘোষণাকালে কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্ট সভা যে-কোন বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে পারে এবং কোন রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থার সৃষ্টি হইলে পার্লামেণ্ট রাজ্য আইনসভার স্থান অধিকার করিতে পারে।

যুগ্ম বিষয়গুলির উপর উভয় সরকারই কেন্দ্রীয় ও রাজ্য—আইন, প্রণয়ন

করিতে পারে। কিন্তু যুগ্মতালিকাভুক্ত কোন বিষয়ে রাজ্য আইনসভা দ্বারা প্রণীত কোন আইনের সহিত যদি পার্লামেণ্ট প্রণীত কোন আইনের বিরোধ হয়, তাহা হইলে পার্লামেণ্ট প্রণীত আইনই বলবৎ হইবে।

শাসনসম্পর্ক—শাসন পরিচালনা সম্পর্কে উভয় সরকারই নিজ নিজ এলাকায় স্বাধীন থাকিবে। কিন্তু সংবিধানে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, রাজ্য সরকারগুলির শাসনক্ষমতা এরূপভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে যাহাতে কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনক্ষমতা ব্যাহত না হয়। দ্বিতীয়তঃ, কেন্দ্রীয় শাসনকর্তৃপক্ষ প্রয়োজনক্ষেত্রে রাজ্য সরকারগুলিকে নির্দেশ দান করিতে পারিবে এবং কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশ অনুসারে রাজ্য সরকারকে শাসনকার্য পরিচালনা করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ, সামরিক অথবা জাতীয় স্বার্থসম্পর্কিত কারণে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হইলে যানবাহন চলাচল ব্যবস্থা নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে প্রয়োজনক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারগুলিকে নির্দেশ দান করিতে পারিবে এবং এই নির্দেশ অনুসারে রাজ্য সরকারগুলির কাজ করিতে হইবে। যদি কোন রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রদত্ত কোন নির্দেশ উপেক্ষা করে, তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি এই উপেক্ষাকে শাসনতন্ত্রে অচলাবস্থার উদ্ভব মনে করিতে পারেন এবং সেজন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন।

কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত রাজ্য সরকারগুলির সম্পর্ক বিচার করিয়া রাজ্য সরকারগুলিকে কেন্দ্রীয় সরকারের অধস্তন প্রতিনিধি মাত্র বলিতে পারা না গেলেও এ কথা সত্য যে, কেন্দ্রীয় সরকার নানাভাবে রাজ্য সরকারগুলির উপর তাহার কর্তৃত্ব বিস্তার করিতে পারে। (১৯৪—১৯৮ পৃষ্ঠা)

8. Explain clearly the constitutional relationship between the Council of States (Rajya Sabha) and the House of People (Loka Sabha).

উঃ ইঃ—রাষ্ট্রপতি, রাজ্যসভা ও লোকসভা লইয়া কেন্দ্রীয় আইনসভা গঠিত। ক্ষমতার দিক দিয়া দেখিতে গেলে রাজ্যসভা অপেক্ষা লোকসভার ক্ষমতা অধিক।

১। সাধারণ আইন-প্রণয়ন-ব্যাপারে উভয় কক্ষই সমক্ষমতার অধিকারী। আইনের প্রস্তাব যে-কোন কক্ষে উত্থাপন করা যায় এবং একটি কক্ষ কর্তৃক গৃহীত হইলে অপর কক্ষে উপস্থিত করা হয়। উভয় কক্ষের মধ্যে মতান্তর ঘটিলে

এবং ছয় মাসের মধ্যে মীমাংসা না হইলে রাষ্ট্রপতি উভয় কক্ষের যুগ্ম অধিবেশন আহ্বান করিয়া সংখ্যাধিক্যের ভোটে প্রস্তাবটি পাস করাইতে পারেন। লোক-সভার সদস্যসংখ্যা রাজ্যসভার সদস্যসংখ্যার দ্বিগুণ। সুতরাং যুগ্ম অধিবেশনে লোকসভার মত সাধারণতঃ প্রাধান্য লাভ করে।

২। দ্বিতীয়তঃ, আয়ব্যয়-সম্পর্কিত ব্যাপার একমাত্র লোকসভাই নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কারণ, ব্যয়ের দাবির প্রস্তাব রাজ্য-সভা কেবলমাত্র আলোচনা করিতে পারে, কিন্তু ভোট দিতে পারে না। রাজস্ব বিল লোকসভায় প্রথম পেশ করিতে হয় এবং এই সভা কর্তৃক অনুমোদিত হইলে রাজ্যসভায় প্রেরিত হয়। রাজ্যসভা যদি কোন পরিবর্তনের প্রস্তাব করে তবে লোকসভা তাহা গ্রহণ বা বর্জন করিতে পারে; লোকসভা কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাব রাজ্যসভায় প্রেরিত হইবার ১৪ দিন পর পর্যন্ত যদি রাজ্য-সভার সুপারিশসহ অথবা বিনা সুপারিশে লোকসভায় প্রেরিত না হয়, তবে উক্ত প্রস্তাব লোকসভার মতানুযায়ী আইনে পরিণত হইবে।

৩। ভারতের মন্ত্রিপরিষদও লোকসভার নিকট দায়ী। রাজ্যসভা অনাস্থা প্রস্তাব পাস করিয়াও মন্ত্রিপরিষদকে অপসারিত করিতে পারে না।

৪। তবে একটিমাত্র ক্ষেত্রে রাজ্যসভার বিশেষ একটি ক্ষমতা আছে। রাজ্যপরিসদ যদি দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটে এই মর্মে প্রস্তাব গ্রহণ করে যে, জাতীয় স্বার্থরক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় আইনপরিষদের রাজ্য তালিকাভুক্ত কোন বিষয়সম্পর্কে আইন প্রণয়ন করা যুক্তিযুক্ত তাহা হইলে কেন্দ্রীয় আইনপরিষদ এ বিষয় সম্পর্কে আইন প্রণয়ন করিতে পারে। (১১৮—১২০ পৃষ্ঠা)

9. Describe the position and powers of the President of the Indian Union. How is he elected?

উঃ ইঃ—নির্বাচন—রাষ্ট্রপতি সাধারণতঃ ৫ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন এবং পুনর্নির্বাচিত হইতে পারেন। রাষ্ট্রপতি-পদপ্রার্থীকে ৩৫ বৎসর বয়স্ক ভারতীয় নাগরিক হইতে হইবে। ভারতীয় পার্লামেণ্ট সভার উভয় কক্ষের সদস্যগণ ও রাজ্যসমূহের নিম্ন পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণ কর্তৃক একক হস্তান্তর-যোগ্য গোপন ভোট দ্বারা রাষ্ট্রপতির নির্বাচন হয়।

পদমর্যাদা—রাষ্ট্রপতি হইলেন ভারতের সর্বপ্রধান ও সর্বসম্মানিত নাগরিক। তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের সর্বশ্রেষ্ঠ অধিনায়ক ও তাঁহার নামেই কেন্দ্রীয় সরকারের কার্য পরিচালিত হয়। কিন্তু ভারতে রাষ্ট্রপতি শাসনক্ষমতার উচ্চতম কর্তৃপক্ষ

হইলেও কার্যতঃ তাঁহাকে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে পরিচালিত মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ অনুসারে শাসনক্ষমতা প্রয়োগ করিতে হয়। রাষ্ট্র-পরিচালনার দায়িত্ব কার্যতঃ মন্ত্রিপরিষদসহ প্রধানমন্ত্রীর উপর ন্যস্ত হইয়াছে।

ক্ষমতা—শাসনতন্ত্র কর্তৃক রাষ্ট্রপতির উপর প্রদত্ত ক্ষমতাসমূহকে সাধারণতঃ পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়, যথা,

১। শাসন-পরিচালনার ক্ষমতা (Executive Powers);

২। আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা (Legislative Powers);

৩। অর্থ-সংক্রান্ত ক্ষমতা (Financial Powers);

৪। বিচার-বিষয়ক ক্ষমতা (Judicial Powers);

৫। জরুরী ক্ষমতা (Emergency Powers);

(ক) জরুরী অবস্থার ঘোষণা, (খ) রাজ্যগুলির শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থার ঘোষণা, (গ) অর্থ-সংক্রান্ত জরুরী অবস্থার ঘোষণা। (৬২ —৬৭ পৃষ্ঠা)

10. State the composition and functions of the Supreme Court of India.

উঃ ইঃ—গঠন—একজন প্রধান বিচারপতি ও অনধিক সাত জন বিচারপতি লইয়া এই আদালত গঠিত হয়। বর্তমানে প্রধান বিচারপতি ব্যতীত আরও ১৩ জন বিচারপতি লইয়া এই আদালত গঠিত হইয়াছে। রাষ্ট্রপতি ইঁহাদিগকে নিযুক্ত করেন এবং বিচারপতিগণ পঁয়ষট্টি বৎসর বয়স পর্যন্ত কাজ করিতে পারেন।

ক্ষমতা—১। আদিম—কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের মধ্যে অথবা দুই বা ততোধিক রাজ্য সরকারের মধ্যে শাসনতান্ত্রিক বিষয়সম্পর্কে বিরোধের মীমাংসা করা।

২। আপীল—বিভিন্ন রাজ্যের উচ্চ আদালতের দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার রায়ের বিরুদ্ধে কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে আপীল শোনা।

৩। পরামর্শ—রাষ্ট্রপতির অনুরোধক্রমে শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যা সম্পর্কে মতামত দেওয়া।

৪। মৌলিক অধিকার—নাগরিকগণের শাসনতন্ত্রে উল্লিখিত মৌলিক অধিকার রক্ষা করা। (১৩৪ —১৩৭ পৃষ্ঠা)

11. How does the Union Legislature exercises its control over the Union Executive ?

উঃ ইঃ—নূতন শাসনতন্ত্র অনুসারে ভারতে দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে। দায়িত্বশীল সরকারের তাৎপর্য হইল যে, যাঁহারা শাসনকার্য পরিচালনা করেন তাহারা আইনসভার নিকট তাঁহাদের শাসন-পরিচালনা নীতি ও কার্যক্রমের জন্য দায়ী থাকেন। ভারত সরকারের কার্য নিম্নলিখিত উপায়ে আইনসভা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয় :—

১। আইনসভার সদস্যগণ অধিবেশনের সময় বিভিন্ন বিষয়ে মন্ত্রীদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারেন এবং মন্ত্রিগণের প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়।

২। সদস্যগণ কোন মন্ত্রীর অন্যায় কাজের প্রতিবাদস্বরূপ অধিবেশনের সময় 'মুলতুবী প্রস্তাব' (Adjournment motion) আনয়ন করিয়া বিষয়টির তৎক্ষণাৎ আলোচনা করিয়া ভোট লইবার দাবী করিতে পারেন।

৩। মন্ত্রিসভার বা কোন মন্ত্রীর কাজ অপছন্দ হইলে ভারতের আইনসভার নিম্ন পরিষদের অর্থাৎ লোকসভার যে-কোন সদস্য মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থাসূচক প্রস্তাব পেশ করিতে পারেন। এই প্রস্তাব পাস হইলে মন্ত্রিগণের পদত্যাগ করিতে হয়।

৪। সরকার কর্তৃক উত্থাপিত আয়-ব্যয়ের প্রস্তাব অনুমোদন না করিয়াও লোকসভা মন্ত্রিপরিষদের কার্য নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। (৮৫—৮৮ পৃষ্ঠা)

12 Describe the organisation and powers of the Union Legislature in India.

উঃ ইঃ –গঠন—ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভা পার্লামেন্ট, রাষ্ট্রপতি, রাজ্যসভা ও লোকসভা লইয়া গঠিত। রাজ্যসভা অনধিক ২৫০ সদস্য লইয়া গঠিত হয়। রাজ্যসভার বর্তমান সদস্যসংখ্যা ২৩৮ জন। রাজ্যসভার ২৩৮ জন সদস্যের মধ্যে ২১৮ জন বিভিন্ন রাজ্যের নিম্নকক্ষের সদস্যগণ কর্তৃক একক-হস্তান্তরযোগ্য ভোটে সমানানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতিতে পরোক্ষে নির্বাচিত হইয়া থাকেন। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হইতে ৮ জন নির্বাচিত হন। অবশিষ্ট ১২ জন সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক বা সমাজসেবক বা বিশেষ বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে রাষ্ট্রপতি মনোনীত করেন। রাজ্যসভা স্থায়ী পরিষদ। তবে প্রত্যেক দুই বৎসর অন্তর এই সভার এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের অবসর গ্রহণ করিতে হয়। উপ-রাষ্ট্রপতি এই সভার সভাপতিত্ব করেন।

নিম্নপরিষদ লোকসভা অনধিক ৫১০ জন সদস্য লইয়া গঠিত। রাজ্যগুলির ভোটদাতাগণ প্রত্যক্ষভাবে প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার ভিত্তিতে জনসংখ্যার

অনুপাতে ৪৮১ জন সদস্য নির্বাচন করেন। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির প্রতিনিধি সংখ্যা হইল ১৬, রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত ১৩। সবসমেত লোকসভার সদস্য-সংখ্যা হইল ৫১০। এই সদস্যগণের মধ্যে জম্মু ও কাশ্মীর, আন্দামান, লাক্ষাদ্বীপ, ইঙ্গ-ভারতীয় ও আসামের উপজাতির সদস্যগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত হন। নিম্নপরিষদের কার্যকাল সাধারণতঃ ৫ বৎসর। তবে জরুরী অবস্থায় এই কার্যকাল পার্লামেণ্ট এক বৎসর বৃদ্ধি করিতে পারে। রাষ্ট্রপতি ৫ বৎসরের পূর্বে এই সভা ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন। কার্য পরিচালনার জন্য লোকসভা একজন স্পীকার নির্বাচন করে।

ক্ষমতা—কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্ট সভা অন্য রাষ্ট্রনিরপেক্ষ স্বাধীন সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হইলেও এই সভার ক্ষমতা শাসনতন্ত্র-নির্ধারিত গণ্ডির মধ্যে প্রযুক্ত হয়। মৌলিক অধিকার-বিরোধী কোন আইন প্রণয়ন করিবার বা শাসনতন্ত্র নির্ধারিত রাজ্য সরকারগুলির আইন প্রণয়ন ক্ষমতার উপর এই সভার কোন ক্ষমতা নাই। এই সভা যুক্তরাষ্ট্রীয় তালিকাভুক্ত ও যুগ্মতালিকাভুক্ত বিষয়গুলির উপর আইন প্রণয়ন করিতে পারে। উভয় কক্ষের সম্মতিতে আইনের প্রস্তাব গৃহীত হইলে রাষ্ট্রপতির সম্মতিতে আইন পাস হয়। উভয় পরিষদ কর্তৃক গৃহীত আইন রাষ্ট্রপতি প্রথমবার অনুমোদন না করিলেও দ্বিতীয়বার রাষ্ট্রপতির নিকট উক্ত আইন উপস্থাপিত হইলে তাহাকে সম্মতি দিতেই হইবে। অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাবও এইরূপে পাস হয়। তবে এ বিষয়ে নিম্নপরিষদের ক্ষমতা অধিক। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জরুরী অবস্থা ঘোষণা পার্লামেণ্টের অনুমোদনসাপেক্ষ। জরুরী অবস্থা ঘোষণাকালে অথবা রাজ্যসভা কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইলে পার্লামেণ্ট সভা রাজ্যতালিকাভুক্ত বিষয়ের উপর আইন প্রণয়ন করিতে পারে। পার্লামেণ্ট সভার নির্বাচিত সদস্যগণ রাষ্ট্রপতির নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিতে পারেন। পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষের সদস্যগণ উপ-রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচন করেন। শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধাচরণের জন্য পার্লামেণ্টের যে-কোন সভা রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করিতে পারে এবং উক্ত কক্ষের বিশেষ সংখ্যাধিক্য ভোটে রাষ্ট্রপতিকে পদচ্যুত করা যায়। পার্লামেণ্ট উভয় কক্ষের ২/৩ সংখ্যক ভোটে গৃহীত প্রস্তাব আনয়ন করিয়া সুপ্রিম কোর্ট ও উচ্চ বিচারালয়ের বিচারপতিগণকে অবধারিত অসদাচরণ বা অযোগ্যতার জন্য অপসারণ করিতে পারে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা লোকসভার নিকট দায়ী। শাসনতন্ত্র সংশোধন করিবার ক্ষমতাও পার্লামেণ্টের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। সুতরাং দেখা যায় যে, ভারতের পার্লামেণ্ট সভা ইহার

বিস্তৃত ক্ষমতা পরিচালনা দ্বারা একদিকে যেমন ভারতের জনমত সজাগ রাখে, অপরপক্ষে তদ্রূপ শাসনকর্তৃপক্ষকে নিয়ন্ত্রিত করে। (১১৬—১১৮ পৃষ্ঠা)

13. Discuss the position and powers of the Governor of a state in the Indian Union.

উঃ ইং:—পদমর্যাদা—পাঁচ বৎসরের জন্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত একজন রাজ্যপাল প্রত্যেক রাজ্যে আছেন। তিনিই রাজ্যের প্রধান শাসনকর্তা এবং তাঁহার নামেই রাজ্যের শাসনকার্য পরিচালিত হয়। রাষ্ট্রপতির ন্যায় রাজ্যপালও মন্ত্রিসভার পরামর্শানুসারে নিয়মতান্ত্রিক শাসক হিসাবে কাজ করেন। রাজ্যপাল যদি কোন সময়ে মনে করেন যে, রাজ্যের শাসনব্যবস্থা শাসনতান্ত্রিক আইনানুসারে পরিচালনা করা সম্ভব নয়, তবে তিনি এই মর্মে রাষ্ট্রপতিকে বিবরণ পেশ করিতে পারেন। রাষ্ট্রপতি ইচ্ছা করিলে রাজ্যপাল কর্তৃক প্রেরিত বিবরণীর ভিত্তিতে একটি ঘোষণা করিয়া রাজ্যের শাসনভার স্বয়ং গ্রহণ করিতে পারেন। এরূপ ঘোষণার পর সাধারণতঃ কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ অনুসারে রাজ্যপাল রাজ্যটির শাসনকার্য পরিচালনা করেন। একমাত্র আসামের রাজ্যপালের উপজাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলি সম্পর্কে দুইটি বিশেষ ক্ষমতা আছে, যাহা তিনি মন্ত্রিসভার পরামর্শ গ্রহণ না করিয়া নিজের ইচ্ছায় প্রয়োগ করিতে পারেন।

ক্ষমতা—১। শাসনবিভাগীয় ক্ষমতা,
২। আইনবিষয়ক ক্ষমতা;
৩। অর্থবিষয়ক ক্ষমতা,
৪। বিচারবিষয়ক ক্ষমতা। (১৪৪—১৫০ পৃষ্ঠা)

14. What are the powers and functions of the Legislature in West Bengal?

উঃ ইং:—পশ্চিমবঙ্গের আইনসভা দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট। রাজ্যপাল, বিধান পরিষদ ও বিধানসভা লইয়া এই আইনসভা গঠিত।

কার্য :—

১। রাজ্যতালিকাভুক্ত ও যুগ্ম তালিকাভুক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে আইন প্রণয়ন করা ও পুরাতন আইন সংশোধন করা।

২। রাজ্যের বাৎসরিক আয়-ব্যয় মঞ্জুর করা। যে-কোন কর ধার্যের প্রস্তাব ও সরকারী অর্থব্যয় আইনসভার অনুমোদনসাপেক্ষ।

৩। প্রশ্নোত্তর, সমালোচনা ও পরিশেষে অনাস্থাসূচক প্রস্তাব দ্বারা আইনসভা মন্ত্রিসভার কায নিয়ন্ত্রণ করা।

৪। আইনসভা ইহার আলাপ-আলোচনার দ্বারা দেশে জনমত সৃষ্টিতে সাহায্য করে। (১৫৯—১৬০ পৃষ্ঠা)

15. Describe the organisation of the Judiciary in India.

উঃ ইঃ—১। সুপ্রিম কোর্ট—সর্বভারতীয় সর্বোচ্চ বিচারালয়। ইহার আদিম, আপীল, পরামর্শ ও মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত ক্ষমতা আছে। ইহা একাধারে সর্বভারতীয় ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলা সম্পর্কে উচ্চতম আদালত ও যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত একজন প্রধান বিচারপতি ও ১৩ জন বিচারপতি লইয়া এই আদালত গঠিত।

২। উচ্চ আদালত—প্রত্যেক রাজ্যে এইরূপ একটি আদালত আছে। একজন প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারপতি লইয়া উচ্চ আদালত গঠিত হয়। কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ ব্যতীত অন্যান্য রাজ্যের উচ্চ আদালতগুলি নিম্ন আদালত হইতে আনীত ফৌজদারী ও দেওয়ানী উভয়বিধ মামলার আপীল শুনে। কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজের উচ্চ আদালতগুলির আদিম ও আপীল উভয়বিধ ক্ষমতা আছে।

উচ্চ আদালতের নিম্নে প্রত্যেক রাজ্যে দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার জন্য দুই শ্রেণীর আদালত আছে, যথা,

দেওয়ানী	ফৌজদারী
৩। জেলাজজের আদালত সাবজজের "	৩। সেসন্‌স্ জজের আদালত সহকারী সেসন্‌স্ জজের আদালত
৪। মুনসেফ "	৪। ম্যাজিষ্ট্রেটের (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর) ও অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালত
৫। পঞ্চায়েত	৫। পঞ্চায়েত আদালত

জেলা ও সেসন্‌স্ জজেরও আদিম ও আপীল ক্ষমতা আছে। মুনসেফের আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে জেলাজজের আদালতে ও সাধারণ ম্যাজিষ্ট্রেটের রায়ের বিরুদ্ধে সেসন্‌স্ জজের আদালতে আপীল করা যায়। কলিকাতা প্রভৃতি প্রেসিডেন্সি শহরে দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার জন্য নগর আদালত

(City Court), প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালত ও ছোট আদালত আছে। গুরুতর ফৌজদারী মামলার বিচার জুরীর সাহায্যে পরিচালিত হয়।

(১৩৪—১৩৭, ১৭২—১৭৬, ১৮১ পৃষ্ঠা)

16. What are the functions of Municipalities in India? What are the principal sources of revenue?

উঃ ইঃ—প্রত্যেক শহরে একটি করিয়া পৌর-প্রতিষ্ঠান থাকে। করদাতাদের ভোটে চার বৎসরের জন্য নির্বাচিত রাজ্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত নির্দিষ্ট সংখ্যক সদস্য লইয়া পৌর-প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। সদস্যগণ দ্বারা নির্বাচিত একজন চেয়ারম্যান হইলেন পৌর-প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্মকর্তা।

কাজ—পৌর-প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান গ্রামাঞ্চলে বা শহরাঞ্চলে কাজ করে, তাহাদের কাজ প্রধানতঃ চার ভাগে ভাগ করা যায়। যথা,—

১। জনস্বাস্থ্য রক্ষামূলক কাজ;

২। জননিরাপত্তা রক্ষামূলক কাজ;

৩। জনসুবিধা সৃষ্টিমূলক কাজ;

৪। জনশিক্ষা (প্রাথমিক) বিস্তারমূলক কাজ।

আয়—জমি ও বাড়ীর উপর ধার্য কর, জল, আলো ও ময়লা নিষ্কাশন ব্যবস্থার জন্য কর, যানবাহনের উপর কর, হাট, বাজার, সেতু, পশুচারণের উপর শুল্ক, বিভিন্ন পেশাদার, যথা, উকিল, ডাক্তার, ব্যবসায়ী প্রভৃতির উপর কর, রাজ্য সরকারের নিকট হইতে সময় সময় প্রাপ্ত সাহায্য, ঋণ গ্রহণ প্রভৃতি।

(২৬২—২৬৩ পৃষ্ঠা)

17. Describe the constitution and functions of the District Boards in India.

উঃ ইঃ—গঠন—এক আসাম ব্যতীত ভারতের সর্বত্র প্রত্যেক জেলায় একটি করিয়া জেলাবোর্ড আছে। রাজ্য সরকার নির্ধারিত কমপক্ষে নয় জন চার বৎসরের জন্য নির্বাচিত সদস্য লইয়া বোর্ড গঠিত হয়। বোর্ডের সদস্যগণ একজন চেয়ারম্যান ও এক বা দুই জন ভাইস-চেয়ারম্যান নির্বাচিত করে।

কাজ—১৭ নং প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য। স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানগুলির কাজগুলি উদাহরণসহ লিখ, যেমন পানীয় জল সরবরাহ করা। গ্রামাঞ্চলে এই কাজ

পুকুর, কূপ বা নলকূপ খনন করিয়া করা হয়, কিন্তু বড় বড় শহরে কলের জল সরবরাহ করা হয়।

(২৬৪—২৬৫ পৃষ্ঠা।)

18. Discuss the position and functions of the Magistrate and Collector of an Indian District.

উঃ ইঃ—ভারতের প্রত্যেক রাজ্য কতকগুলি জেলায় বিভক্ত এবং এই জেলাগুলিই হইল শাসনব্যবস্থার প্রধান অঙ্গ। আর জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট হইলেন এই শাসনব্যবস্থার মেরুদণ্ড। উপজাতি-অধ্যুষিত এলাকায় ম্যাজিষ্ট্রেট ডেপুটি কমিশনার নামে পরিচিত।

বৃটিশ শাসনকালে ম্যাজিষ্ট্রেট আই. সি. এস. কর্মচারী ছিলেন। স্বাধীনতা-লাভের পর তিনি আই. এ. এস.-এর কর্মচারী। প্রতিযোগিতামূলক লিখিত, মৌখিক ও স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত পরীক্ষা করিয়া উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন যুবকগণকে এই পদে নিযুক্ত করা হয়।

ম্যাজিষ্ট্রেট একদিকে জেলা-শাসনের সর্বময় কর্তা, অপরদিকে জেলার রাজস্ব আদায় করিবার ভারও তাঁহার উপর ন্যস্ত। ইহা ছাড়া, তিনি আবার ফৌজদারী মামলার বিচারও করিয়া থাকেন। পুলিশ সাহায্যে জেলায় শান্তিরক্ষা করা, কৃষি, শিক্ষা, সেচ, বন, কৃষিঋণ-দান, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির কাজ তাঁহাকে পরিদর্শন ও প্রয়োজনক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ করিতে হয়।

জেলা-শাসকের উপর হাজার হাজার লোকের সুখদুঃখ নির্ভর করে। সুতরাং তাঁহাকে শুধু সু-শাসক হইলে চলে না। তাঁহার মধ্যে জনপ্রিয় নেতার গুণ থাকা চাই। শিষ্টের পালন ও দুষ্টের দমনই হইল জেলা-শাসকের অন্যতম প্রধান কর্তব্য।

জেলা-শাসক একদিকে শাসনকর্তা ও অপরদিকে বিচারক। শাসন ও বিচার এই দুইটি ক্ষমতা একই হস্তে কেন্দ্রীভূত হইলে ব্যক্তিস্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইতে পারে। এই কারণে জেলা-শাসককে বিচারক্ষমতার ভারমুক্ত করা কাম্য।

(২৬৬—২৬৭ পৃষ্ঠা)।

19. What are Money Bills in respect of the Indian Union under the Constitution? Describe fully the procedure laid down in the constitution for the passing of Money Bills by the Union Parliament.

উঃ ইঃ—ভারতে অর্থবিষয়ক বিল বলিতে নিম্নলিখিত পর্যায়ের প্রস্তাবগুলিকে বুঝায়, যাহাদের বিষয়বস্তু হইল :

১। করধার্য বা কর বিলোপ, বা মকুব বা কর পরিবর্তন বা নিয়ন্ত্রণ।

২। সরকার কর্তৃক ঋণগ্রহণ নিয়ন্ত্রণ।

৩। সঞ্চিত তহবিলে বা আকস্মিক ব্যয়নির্বাহ তহবিলে টাকা জমা দেওয়া অথবা উক্ত তহবিল হইতে টাকা উঠান।

৪। সঞ্চিত তহবিল হইতে অর্থ ব্যয়।

৫। কোন ব্যযবরাদ্দকে সঞ্চিত তহবিলের উপর ধার্য ব্যয় বলিয়া ঘোষণা করা অথবা এইরূপ ধার্য ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করা।

৬। সঞ্চিত তহবিল খাতে অর্থ গ্রহণ করা।

৭। পূর্ব-বর্ণিত পাঁচদফা সংশ্লিষ্ট যে-কোন ব্যাপার। কোন বিল অর্থ-সংক্রান্ত কিনা এ সম্পর্কে লোকসভার স্পীকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া পরিগণিত হয়।

সংবিধানের নির্দেশ অনুসারে রাষ্ট্রপতি প্রত্যেক আর্থিক বৎসরের একটি আনুমানিক আয-ব্যয়ের হিসাব পার্লামেন্টের উভয় কক্ষে উপস্থিত করেন। অর্থমন্ত্রী লোকসভায় এই বাজেট পেশ করিয়া বক্তৃতা প্রদান করেন। বাজেটে ব্যযের হিসাব দুইভাগে দেখান হয়। প্রথমভাগ হইল কেন্দ্রীয় সঞ্চিত তহবিলের উপর ধার্য ব্যয় এবং এই ব্যয় পার্লামেন্টের বাৎসরিক অনুমোদনসাপেক্ষ না হইলেও এই ব্যয় সম্পর্কে উভয় পরিষদে আলোচনা হইতে পারে। দ্বিতীয় ভাগ হইল কেন্দ্রীয় সঞ্চিত তহবিলের উপর ধার্য অন্যান্য ব্যয় এবং এই ব্যযগুলি লোকসভার বাৎসরিক অনুমোদনসাপেক্ষ। পার্লামেন্টে উভয় শ্রেণীর ব্যয় সম্পর্কে আলোচনা চলিবার পর দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যয়গুলি মঞ্জুরীর জন্য দাবী করা হয় এবং এসম্পর্কে ভোটগ্রহণ করা হয়। একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এই আলোচনা ও ভোটগ্রহণ শেষ করিতে হয়। লোকসভা ব্যয-বরাদ্দগুলিকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারে, হ্রাস করিতে পারে কিন্তু ব্যয় বৃদ্ধির প্রস্তাব বা নূতন ব্যয়ের প্রস্তাব করিতে পারে না।

লোকসভা কর্তৃক ব্যয়-বরাদ্দগুলি পাস হইলে একটি বিনিয়োগ আইন পাস করিয়া সঞ্চিত তহবিল হইতে ব্যয়-নির্বাহের জন্য অর্থ উঠাইবার ক্ষমতা দেওয়া হয়। বাজেট পাস সময়সাপেক্ষ। এইজন্য বাজেট পাস না হওয়া পর্যন্ত লোকসভা সরকারকে অর্থব্যয়ের অনুমতি প্রদান করে।

ব্যয়ের সহিত আয়েরও হিসাব হয়। করধার্য বা সংগ্রহের জন্য সরকার রাজস্ব বিল পার্লামেণ্টে পেশ করেন। রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ব্যতীত কর বৃদ্ধি বা নূতন কর স্থাপনের কোন প্রস্তাব উপস্থিত করা যায় না। (১২৪—১২৬ পৃষ্ঠা)

20. Explain the provisions of the Constitution of India regarding the official language of the Union.

উঃ ইঃ—শাসনতন্ত্রের রচয়িতাগণ দেবনাগরী অক্ষরে লিখিত হিন্দীকে সরকারী ভাষা বলিয়া স্বীকৃতি দান করেন। হিন্দী সরকারী ভাষার মর্যাদা পাইলেও ১৫ বৎসর পর্যন্ত ইংরেজী সরকারী ভাষা হিসাবে চালু থাকিবে। ১৫ বৎসর অন্তে পার্লামেণ্ট আইন প্রণয়ন করিয়া কোন কোন বিষয়ে ইংরেজী ভাষার ব্যবহার প্রবর্তন করিতে পারিবে।

কোন রাজ্যের আইনসভা বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ না করা পর্যন্ত ইংরেজী ভাষাই সেই রাজ্যের সরকারী ভাষা হিসাবে ব্যবহৃত হইবে। সর্বভারতে প্রচলিত ভাষাই রাজ্যগুলির মধ্যে এবং কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে সরকারী ভাষা হিসাবে ব্যবহৃত হইবে। দুই বা ততোধিক রাজ্য পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে হিন্দী ভাষাকে তাহাদের যোগসূত্রের বাহন হিসাবে ব্যবহার করিতে পারে। পার্লামেণ্ট বিকল্প ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্ট ও উচ্চ বিচারালয়ের যাবতীয় কার্যাদি এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির আইনের প্রস্তাব, আদেশ, নির্দেশ প্রভৃতি ইংরেজী ভাষায় পরিচালিত হইবে। সংবিধানে বিশেষ নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, যে-কোন ব্যক্তি কেন্দ্র বা রাজ্যগুলিতে ব্যবহৃত যে কোন ভাষায় কোন বিষয়ে প্রতিকার প্রার্থনা করিয়া আবেদন করিতে পারে।

(২৭৫—২৪৮ পৃষ্ঠা)

———

পরিশিষ্ট (১)

পুনর্গঠিত গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন (Re-constituted Village Self-Government)

বলবন্ত রায় মেহতা রিপোর্টের ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গ স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির আমূল সংস্কার সাধনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। এই পরিকল্পনা অনুসারে ১৯৬৩ সালে পশ্চিমবঙ্গ আইন সভা কর্তৃক একটি নূতন আইন প্রণয়ন করা হয়। এই আইনের বলে চারি পর্যায়ের স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান গঠনের ব্যবস্থা করা হয়। এই প্রতিষ্ঠানগুলির সর্বোপরি আছে জিলা পরিষদ এবং জিলা পরিষদের নিম্নে যথাক্রমে আঞ্চলিক পরিষদ, অঞ্চল পঞ্চায়েত এবং সর্বনিম্নে গ্রাম পঞ্চায়েত আছে। পশ্চিমবঙ্গে এই নব-পরিকল্পিত প্রতিষ্ঠানগুলি ধীরে ধীরে জিলা বোর্ড ও ইউনিয়ন বোর্ডগুলির স্থান অধিকার করিতেছে।

ভারতের শাসনতন্ত্রে উল্লিখিত প্রস্তাবনা ও নির্দেশাত্মক নীতিগুলিকে সফল করিবার উদ্দেশ্যেই মুখ্যতঃ এই নূতন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইয়াছে। বিকেন্দ্রীকরণই (Decentralisation) হইল গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার মূল নীতি। শাসন ব্যবস্থা এবং দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন এই বিকেন্দ্রীকরণ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত না হইলে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র (Democratic Socialism) সার্থক হইতে পারে না। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির সংস্কারের ব্যবস্থা হইয়াছে। বৃটিশ শাসকগণ কর্তৃক গঠিত স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলিকে স্বাধীন ভারতের আশা আকাংখার মূর্ত প্রতীক রূপে পুনর্জীবিত করিয়া বিকেন্দ্রীকরণ পদ্ধতির মাধ্যমে জনসাধারণকে পরিকল্পনা ও উন্নয়নমূলক কার্যাদির সহিত সংযুক্ত করাই হইল এই সংস্কার ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য। এই ব্যবস্থার দ্বারা জনসাধারণকে স্থানীয় সাধারণ-সম্পর্কিত ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করিবার সুযোগ দান করিয়া কল্যাণ-রাষ্ট্র গঠনের ভিত্তি সুদৃঢ় করা হইয়াছে।

জিলা পরিষদ (Zilla Parishad)

সংগঠন (Composition)—পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিজ্ঞপ্তি দ্বারা নির্দিষ্ট তারিখ হইতে প্রত্যেক জেলায় একটি জিলা পরিষদ গঠন করিতে

পারেন। জিলা পরিষদের সদস্যগণ সাতটি বিভিন্ন শ্রেণী হইতে নিযুক্ত হইয়া থাকেন। প্রথমতঃ, জিলার অন্তর্গত আঞ্চলিক পরিষদের সভাপতিগণ পদাধিকার বলে (Ex-officio) জিলা পরিষদের সদস্য হইবেন। দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেক মহকুমা হইতে অধ্যক্ষগণ কর্তৃক নির্বাচিত দুইজন অধ্যক্ষ সদস্য। তৃতীয়তঃ, ঐ জিলা হইতে নির্বাচিত লোক সভা ও রাজ্যের বিধান সভার নির্বাচিত সদস্যগণ। চতুর্থতঃ, ঐ জিলার বাসিন্দা রাজ্যসভা ও রাজ্যের বিধান পরিষদের সদস্যগণ। পঞ্চমতঃ, রাজ্যসরকার কর্তৃক নিযুক্ত উক্ত জিলার মিউনিসিপালিটির একজন চেয়ারম্যান। ষষ্ঠতঃ, জিলা স্কুল বোর্ডের সভাপতি পদাধিকারবলে একজন সদস্য নিযুক্ত হইবেন। সপ্তমতঃ, রাজ্যসরকার কর্তৃক নিযুক্ত দুইজন মহিলা-সদস্য। এস্থলে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মন্ত্রিগণ জিলার অধিবাসী হইলেও জিলাপরিষদের সদস্য হইতে পারেন না। দুইজন মহিলা সদস্য যদি অন্য ভাবে নিযুক্ত হন তাহা হইলে রাজ্য সরকার আর অতিরিক্ত মহিলা-সদস্য নিযুক্ত করেন না। ইহা ছাড়া, জেলার অন্তর্গত মহকুমা সমূহের মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটগণ ও জেলা পঞ্চায়েত কর্মচারী জিলা পরিষদের সদস্য থাকেন।

জিলা পরিষদের সদস্যগণ কর্তৃক চারিবৎসরের জন্য একজন সভাপতি ও একজন সহ-সভাপতি নির্বাচিত হইবেন। সভাপতি ও সহ-সভাপতি প্রথম, দ্বিতীয় ও সপ্তম শ্রেণী হইতে নির্বাচিত হইবেন। সভাপতি ও সহ-সভাপতি জিলা পরিষদের সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইলেও রাজ্যসরকার বিশেষ বিশেষ কারণে ইঁহাদিগকে ভারমুক্ত করিতে পারেন। জিলা পরিষদের কার্য পরিচালনার জন্য স্থায়ী কর্মচারী নিযুক্ত হয়। জিলা পরিষদের প্রধান কর্মকর্তা হইলেন রাজ্যসরকার কর্তৃক নিযুক্ত একজন কার্যসম্পাদক (An Executive Officer)। ইহা ব্যতীত জিলা পরিষদের একজন কর্মসচিব ও অন্যান্য কর্মচারী থাকেন। ইঁহারা সকলেই জিলা পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত হন। জিলা পরিষদের কার্য কতকগুলি স্থায়ী সংস্থার (Standing Committees) দ্বারা সম্পাদিত হয়। সেচ, শিল্প, জনস্বাস্থ্য, রাজস্ব প্রভৃতি সংস্থাগুলি হইল প্রধান।

কার্য—(Functions)

জেলা বোর্ডগুলির কার্য অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ কাযের ভার জিলা পরিষদগুলির হস্তে ন্যস্ত করা হইয়াছে। এই পরিষদগুলি নানা বিষয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ ও রূপায়ণ করিবার অধিকারী। আবার রাজ্যসরকারও এই পরিষদ-

গুলির উপর উন্নয়নমূলক কার্যেরও পরিকল্পনার দায়িত্ব অর্পণ করিতে পারে এবং এরূপ ক্ষেত্রে রাজ্যসরকার কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব পালন করা বাধ্যতামূলক। ইহা ছাড়া, জিলার উন্নয়ন সম্পর্কে অনেক সময় রাজ্যসরকারকে জিলা পরিষদের পরামর্শ দান করিতে হয়।

জিলার অন্তর্গত বিদ্যালয় ও পাঠাগারসমূহে অর্থ সাহায্য, বৃত্তিগত ও কারিগরি শিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে বৃত্তি প্রদান এই পরিষদের কার্য। ইহা ছাড়া, হাটবাজার সংরক্ষণ, আঞ্চলিক পরিষদগুলিকে অর্থ সাহায্য এবং ইহাদের আয়-ব্যয়ের হিসাব মঞ্জুর ও পরীক্ষা করা জিলা পরিষদের কার্যের অন্তর্ভুক্ত। কৃষি, সমবায়, সেচ, কুটির-শিল্প ও জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন সম্পর্কে জিলা পরিষদ স্বয়ং পরিকল্পনা গ্রহণ ও কার্যকর করিতে পারে।

আয়—(Sources of Income)

জিলা পরিষদের সুদীর্ঘ কার্যতালিকা হইতে ইহার ব্যয়ের পরিমাণ সহজে অনুমান করা যায। এই ব্যয়নির্বাহের জন্য পরিষদের করধার্য ও কর আদায় করিবার ক্ষমতা আছে। জিলা পরিষদ নিম্নলিখিত উপায়ে কর আদায় করে। ১। যানবাহন ও জন্তুজানোয়ারের উপর কর, ২। যানবাহন বা নৌকা রেজেষ্ট্রী বাবদ ফি, ৩। খেয়াপারাপারের উপর শুল্ক, ৪। জলসরবরাহ ও রাস্তায় আলো সরবরাহের উপর কর, ৫। কেন্দ্রীয় বা রাজ্যসরকার কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ সাহায্য বা ঋণ ও ৬। রাজ্যসরকারের অনুমতি লইয়া ঋণ গ্রহণ।

আঞ্চলিক পরিষদ (Anchalik Parishad)

১৯৬৩ সালের আইন অনুসারে প্রত্যেকটি জিলাকে রাজ্যসরকার কতকগুলি ব্লকে (Block) ভাগ করিবেন। ব্লকগুলি নির্দিষ্ট কতিপয় অঞ্চল লইয়া গঠিত হইবে। প্রত্যেক ব্লকে একটি করিয়া আঞ্চলিক পরিষদ থাকিবে।

সংগঠন (Composition)—আঞ্চলিক পরিষদগুলি জিলা পরিষদগুলির অনুরূপভাবেই গঠিত হইবে। আঞ্চলিক পরিষদগুলি প্রায় আট শ্রেণীর সদস্য লইয়া গঠিত হইবে। (১) অঞ্চল পঞ্চায়েতের প্রধানগণ এবং ব্লকের অধীনস্থ ইউনিয়ন বোর্ডগুলির সভাপতিগণ পদাধিকার বলে আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য হইবেন। (২) ব্লকের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চল পঞ্চায়েতগুলির অধ্যক্ষগণ কর্তৃক নির্বাচিত একজন অধ্যক্ষ, (৩) ব্লকের অন্তর্ভুক্ত এলাকা হইতে নির্বাচিত লোকসভা বা রাজ্যের বিধান সভার সদস্যগণ, (৪) ব্লকের বাসিন্দা রাজ্যসভা বা রাজ্য বিধান

পরিষদের সদস্যগণ, (৫) দুইজন মহিলা, (৬) অনুন্নত শ্রেণীর দুইজন প্রতিনিধি, (৭) সমাজ সেবক বা গ্রামীণ উন্নয়নকার্যে অগ্রণী দুইজন ব্যক্তি, (৮) ব্লক উন্নয়ন কর্মচারীও (Block Development officer) পদাধিকার বলে সদস্যরূপে আঞ্চলিক পরিষদের সহিত যুক্ত থাকেন।

জিলা পরিষদের মতই আঞ্চলিক পরিষদেরও একজন সভাপতি ও একজন সহ-সভাপতি নির্বাচিত হইবেন। উভয়ের কার্যকাল চারি বৎসর। দৈনন্দিন কার্য পরিচালনার জন্য একজন মুখ্য কার্য-সম্পাদক থাকেন। সাধারণতঃ ব্লক উন্নয়ন কর্মচারীই এই পদ পূরণ করেন। ইহা ছাড়া, অন্য স্থায়ী কর্মচারী নিযুক্ত হয়।

কার্য (Functions)—আঞ্চলিক পরিষদগুলি জিলা পরিষদগুলির অনুরূপ ক্ষমতার অধিকারী। ব্লক এলাকার কৃষি, কুটির-শিল্প, সমবায়, ঋণদান ব্যবস্থা, জনস্বাস্থ্য, জল সরবরাহ, প্রাথমিক শিক্ষা প্রভৃতি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলির উন্নয়ন উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ ও রূপায়ণ ইহাদের প্রধান কার্য। ব্লকের অন্তর্গত বিদ্যালয়, পাঠাগার, প্রসূতি-আগার, প্রভৃতি জনহিতকর প্রতিষ্ঠানগুলিতে ইহারা অর্থ সাহায্য করিতে পারে। আঞ্চলিক পরিষদ ব্লকের এলাকাভুক্ত অঞ্চল পঞ্চায়েতগুলির কার্যের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করিতে পারে। ইহা ছাড়া, রাজ্য সরকার কর্তৃক কোন কার্যের ভার ইহাদের উপর ন্যস্ত হইলে সে কার্যগুলি সম্পাদন করিতে হয়।

আয় (Sources of Income)

আঞ্চলিক পরিষদগুলি নিম্নলিখিত উৎসগুলি হইতে আয় করিয়া ইহাদের ব্যয় নির্বাহ করে। (১) যানবাহন ও জন্তুজানোয়ারের উপর ধার্য শুল্ক, (২) যান-বাহন রেজেষ্ট্রী করিবার বাবদ ফি, (৩) হাট-বাজার হইতে প্রাপ্ত ফি, (৪) খেয়া পারাপার হইতে ফি, (৫) জল সরবরাহ করিবার জন্য কর, (৬) রাস্তাঘাটে আলো দিবার জন্য কর, (৭) কেন্দ্রীয় বা রাজ্যসরকার কর্তৃক অর্থ সাহায্য বা ঋণ প্রদান, (৮) জিলা পরিষদ হইতে প্রাপ্ত অর্থ সাহায্য, ও (৯) রাজ্যসরকারের অনুমতি লইয়া ঋণ গ্রহণ।

সরকারের সহিত সম্পর্ক (Relation with the Government)

নব-গঠিত স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির সংগঠন ও কার্যকলাপ পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, শেষ পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানগুলি একান্তরূপে

রাজ্যসরকারের উপর নির্ভরশীল। রাজ্যসরকার প্রথম হইতে শেষ অবধি ইহাদের নিয়ন্ত্রণ করেন। সরকারী বিজ্ঞপ্তি দ্বারা এই প্রতিষ্ঠানগুলি গঠিত হয় এবং উভয় পরিষদেই সরকারী দলের সদস্য ও সরকারী কর্মচারী থাকেন। এই সকল সরকার-সমর্থক সদস্যগণের মাধ্যমে পরিষদগুলির কার্যে সরকার অনুসৃত নীতি বলবৎ করা হয়। স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান বলিয়া পরিচিত হইলেও ইহাদের প্রস্তাব রাজ্যসরকার বাতিল করিয়া দিতে পারে। রাজ্যসরকার যদি মনে করেন যে, কোন জিলা বা আঞ্চলিক পরিষদ ইহার ক্ষমতার অপব্যবহার করিতেছে অথবা কর্তব্য সম্পাদনে অক্ষম বা অবহেলা করিতেছে তাহা হইলে দুই বৎসরের জন্য পরিষদকে বাতিল করিয়া ইহার পরিচালনা ভার একজন পরিচালকের (Administrator) হস্তে ন্যস্ত করিতে পারেন।

নূতন ব্যবস্থার ত্রুটি (Defects of the New System)

ভারতে প্রকৃত গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রসারের উদ্দেশ্যে গ্রামীণ স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করা হয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ পদ্ধতির মাধ্যমে জনসাধারণকে স্থানীয় সমস্যাসমূহের সমাধানের সহিত সংযুক্ত করিবার উদ্দেশ্যেই এই নূতন ব্যবস্থা প্রবর্তিত করা হয়। দুঃখের বিষয়, যে পদ্ধতিতে জিলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদগুলি গঠিত হইবে তাহাতে জনসাধারণের অংশ গ্রহণ করিবার কোন সুযোগ নাই বলিলেও চলে। জনসাধারণকে স্থানীয় সমস্যাগুলির সমাধানের সহিত যুক্ত করিতে হইলে তাহাদিগকে প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষমতা দেওয়া উচিত। প্রতিনিধি নির্বাচন করিবার ক্ষমতা না থাকিলে জনসাধারণ এই প্রতিষ্ঠানগুলির কাজে উৎসাহী হইয়া সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে পারে না। এই ব্যবস্থার অবর্তমানে জিলা পরিষদও আঞ্চলিক পরিষদের সদস্যগণের সহিত জনসাধারণের কোন যোগসূত্র নাই ফলে, পরিষদের সদস্যগণ তাঁহাদের কাযের জন্য রাজ্যসরকারের নিকট দায়ী হইলেও জনসাধারণের নিকট প্রত্যক্ষভাবে দায়ী নহেন। ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে কার্যক্রম সীমাবদ্ধ থাকিলেও পূর্বতন জিলা বোর্ড ও ইউনিয়ন বোর্ডগুলি কিছু পরিমাণে সরকার নিরপেক্ষ ছিল। কিন্তু বর্তমান ব্যবস্থায় সরকারী হস্তক্ষেপ ও সরকারী নিয়ন্ত্রণ এরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, এই নব-পরিকল্পিত প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রকৃত স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান বলিতে দ্বিধা বোধ হয়।

বর্ণানুক্রমিক সূচী